রামাদান ম্যানুয়েল

(পাঠ্য, পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন)

ওয়ামী বুক সিরিজ-৪৪

ওয়ার্ল্ড এসেম্বলী অব মুসলিম ইয়ুথ (ওয়ামী)
বাংলাদেশ অফিস

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

রামাদান ম্যানুয়েল

ওয়ামী বুক সিরিজ:৪৪

World Assembly of Muslim Youth (WAMY)
Bangladesh Office

www.pathagar.com

রমজান ম্যানুয়েল	**Ramadan**
প্রথম প্রকাশ	**1st Edition**
জুলাই ২০১১ ইং	July'2011
প্রকাশক	**Published by:**
দাওয়াহ এন্ড এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট ওয়ার্ল্ড এসেম্বলী অব মুসলিম ইয়ুথ (ওয়ামী) বাংলাদেশ অফিস বাড়ী-১৭, রোড-০৫, সেক্টর-০৭, উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা	World Assembly of Muslim Youth (WAMY) Bangladesh Office House # 17, Road # 05, Sector # 07, Uttara Model Town, Dhaka Phone: 8919123, Fax: 8919124

স্বত্ব ওয়ামী কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত	**Copy Right:** All right preserved by the

শুভেচ্ছা মূল্য ১০০ টাকা মাত্র	**Price:** 100 Taka only

www.pathagar.com

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

ভূমিকা

কেন এই ম্যানুয়েল?

প্রতি বছরই মাস পরিক্রমায় আমাদের কাছে আসে রহমত,বরকত ও মাগফিরাতের মাস রামাদান। কুরআন নাযিলের মাস রমদান, কুরআন বিজয়েরও মাস রমদান। কিন্তু সঠিক পরিকল্পনা, উপযুক্ত তত্ত্বাবধান এবং পরিকল্পিত প্রচেষ্টার অভাবে রামাদানের পরিপূর্ণ ফায়দা হাসিল করা থেকে বঞ্চিত হই।

ওয়ামী বাংলাদেশ অফিস রামাদানের সময় গুলোর পূর্ণ সদ্ব্যবহার ও তার সুফল অর্জনের লক্ষ্যে ওয়ামী পরিবারের সদস্যদের ব্যবহারের জন্য বর্তমান ম্যানুয়েলটি তৈরী করেছে। প্রথমে ম্যানুয়েলটি মনযোগ দিয়ে পাঠ করুন, অনুধাবন করুন। তারপর পরিকল্পনা অংশ পূরণ করুন। তারপর আন্তরিকতার সাথে ম্যানুয়েলে বর্ণিত কাজগুলো নিয়মিত আদায় করুন। নিদিষ্ট সময়ের (২৫শে রমদান) মাঝে এই ম্যানুয়েলের সবগুলো কাজ করে প্রতিবেদনের অংশটি পূরণ করে ওয়ামী বাংলাদেশ অফিসে প্রেরন করুন। এই ম্যানুয়েলের উদ্দেশ্য এর ব্যবহারকারীদের সচেতন করা, তাদের মাঝে প্রতিযোগিতার মনোভাব জন্ম দেয়া এবং আলাহর ভয়ে ভীত জবাবদীহিতা সম্পন্ন সৎ মানুষ তৈরী করা। আলাহ্ আমাদের এই প্রয়াস কবুল করুন।

আসুন পরিকল্পনা নিই

একটি সঠিক পরিকল্পনা যে কোন কাজ বাস্তবায়নে অর্ধেক সমাধানের ভূমিকা পালন করে। সে দিকটি বিবেচনায় এনে মহান আল্লার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষে নিজকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে আসুন রমাদানের প্রতিটি সময়কে যথাযথ ভাবে কাজে লাগাই এই ম্যানুয়েলের প্রতিটি কলাম পরিপূর্ন ভাবে অনুসরণ করি। নিজেকে আল্লার নেক বান্দাহ হিসাবে গড়ে তুলি। আল্লাহ্ আমাদের এই প্রয়াস কবুল করুন।

ডাঃ মুহাম্মদ রেদওয়ানুর রহমান
ডিরেক্টর
ওয়ার্ল্ড এ্যাসেম্বলী অব মুসলিম ইয়ুথ (ওয়ামী)
বাংলাদেশ অফিস,ঢাকা

www.pathagar.com

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

প্রকাশকের কথা

রামাদান মাস আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার জন্যে বাৎসরিক প্রশিক্ষনের (সার্ভিসিংয়ের) মাস। এই প্রশিক্ষণ আল্লাহর ও তার রাসূলের প্রতিটি নির্দেশর প্রতি আত্নসমর্পণের। প্রত্যেক প্রশিক্ষণেরই বিভিন্ন ইভেন্ট থাকে। মাসব্যাপী এ প্রশিক্ষণও অনেকগুলো ইভেন্টে সাজানো। যেমন (১) সুবহে সাদেক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত একটানা না খেয়ে থাকা। (২) সময়মত ইফতার করা ও অপরকে করানোর চেষ্টা করা। (৩) সালাতুত-তারাবী ও বেশী বেশী নফল সালাত আদায়করা। (৪) শেষ রাতে সাহারী খাওয়া। (৫) ইতিকাফের মাধ্যমে আল্লাহর সান্নিদ্ধ লাভের চেষ্টা করা। (৬) লায়লাতুল কাদ্‌রে বেশী ইবাদত করা। (৭) ফিতরা আদায় করা ইত্যাদি। এ সবই হচ্ছে তাকওয়া অর্জন তথা আল্লাহর নির্দেশের প্রতি আত্নসমর্পণের প্রশিক্ষণ।

যিনি যত বেশী ইভেন্টে সেরা নৈপূর্ণ অর্জন করতে পারবেন তিনি তত বেশী আল্লাহর অধিকতর প্রিয় বান্দাহ হতে পারবেন। সেরা মুত্তাকী হবার মাধ্যমে আপনিও আল্লাহর নিকট থেকে সেরা পুরষ্কার পেতে পারেন। এ উদ্দেশ্য সফল করার লক্ষ্যে World Assembly of Muslim Youth (WAMY) Bangladesh Office প্রকাশ করছে "রামাদান ম্যানূয়াল"। ওয়ামী প্রকাশিত অন্যান্য বইয়ের মত ব্যতিক্রমধর্মী এ ম্যানুয়েল রামাদনের লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। বইটিতে একেই সাথে পরিকল্পনা, সিলেবাস, ট্রেকস্ট (পাঠ্য বিষয়) রিপোর্ট ও সেল্‌ফ ইভালুয়েশন (নিজের মূল্যায়ন) ফরম দেয়া হয়েছে। বইটি প্রকাশ করতে পেরে আল্লাহর অবারিত শুকরিয়া আদায় করছি। প্রকাশের সাথে সম্পৃক্ত সকলকে আল্লাহ রব্বুল আলামীন উত্তম জাজাহ দিন। যে কোন ত্রুটি পরবর্তী সংস্করণে সংশোধনযোগ্য।

আলমগীর মুহাম্মদ ইউছুফ
ডেপুটি ডিরেক্টর ও ইনচার্জ
দাওয়াহ্‌ এন্ড এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট
ওয়ামী, বাংলাদেশ অফিস, ঢাকা।

www.pathagar.com

সূচীপত্র

	বিষয়	পৃষ্ঠা
➢	বিষয় ভিত্তিক আল-কোরআন অধ্যয়ন	৬
	১. সিয়াম	৭
	২. পাক কালিমা আর নাপাক কালিমা	১০
	৩. তাওহীদ	১৪
	৪. রিসালাহ ও দু'আ	১৯
	৫. আল-কোরআন	২৩
	৬. সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহর	২৯
	৭. মুমিনের গুণাবলী	৩১
	৮. ইসলাম প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা	৪২
	৯. সর্বোত্তম জাতি ও তাদের দায়িত্ব	৪৬
	১০. আল্লাহর সৃষ্টি	৪৯
	১১. পারস্পরিক আচার আচরণ	৫৯
	১২. আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল আর সূদকে হারাম করেছেন	৭৪
	১৩. মুনাফিকের পরিচয় ও আচরণ	৮৩
	১৪. জ্ঞান (ইলম)	৮৭
	১৫. আল্লাহ দ্বীনকে বিজয় করার প্রানান্তকর প্রচেষ্টা	৯১
	১৬. দাওয়াত	৯৫
	১৭. বদর যুদ্ধ	১০০
	১৮. পিতামাতার প্রতি ভাল ব্যবহার	১০৪
	১৯. কোমল ব্যবহার	১১৪
	২০. পর্দা (হিজাব)	১১৬
	২১. যাদের সাথে বিবাহ হারাম	১৪৩
	২২. সামাজিক দায়বদ্ধতা	১৪৯
	২৩. দুনিয়ার আকর্ষণ	১৫৬
	২৪. দুনিয়া মুসলমানদের জন্য পরীক্ষা	১৫৯
	২৫. অনুপম উপদেশ	১৬৯
	২৬. আখেরাতের চিত্র	১৭৭
	২৭. মর্যাদাপূর্ণ রাত	১৮২
	২৮. ইয়াতিম	১৮৬
	২৯. আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের পথ	১৯১
	৩০. দয়াময়ের বান্দার গুণাবলী	১৯৪
➢	নির্বাচিত আয়াত মুখস্তকরণ	২০৭
➢	দারসূল কুরআন	২১৩
➢	বিষয়ভিত্তিক আল-হাদীস অধ্যয়ন	২২৯
➢	নির্বাচিত হাদিস মুখস্তকরণ	২৪৭
➢	পরিকল্পনা, রিপোর্ট ও স্কোরিং শীট	২৫৯

www.pathagar.com

বিয়ষ ভিত্তিক
আল-কোরআন অধ্যয়ন

রামাদান ম্যানুয়েল- ৬

www.pathagar.com

০১ রামাদান
বিষয়ঃ সিয়াম
সূরা বাক্বারাহঃ ১৮৩-১৮৫

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (183) أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (184) شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (185)

১৮৩) হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ওপর রোযা ফরয করে দেয়া হয়েছে যেমনিভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর ফরয করা হয়েছিল। এ থেকে আশা করা যায়, তোমাদের মধ্যে তাক্ওয়ার গুণাবলী সৃষ্টি হয়ে যাবে। [১৮৩]

১৮৪) এ কতিপয় নির্দিষ্ট দিনের রোযা। যদি তোমাদের কেউ হয়ে থাকে রোগগ্রস্ত অথবা মুসাফির তাহলে সে যেন অন্য দিনগুলোয় এই সংখ্যা পূর্ণ করে। আর যাদের রোযা রাখার সামর্থ্য আছে (এরপরও রাখে না) তারা যেন ফিদিয়া দেয়। একটি রোযার ফিদিয়া একজন মিসকিনকে খাওয়ানো। আর যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় ও সানন্দে কিছু বেশী সৎকাজ করে, তা তার জন্য ভালো। তবে যদি তোমরা সঠিক বিষয় অনুধাবন করে থাকো [১৮৪] তাহলে তোমাদের জন্য রোযা রাখাই ভালো। [১৮৫]

১ ৮৫) রামাদানের মাস, এ মাসেই কুরআন নাযিল করা হয়েছে, যা মানব জাতির জন্য পুরোপুরি হিদায়াত এবং এমন দ্ব্যর্থহীন শিক্ষা সম্বলিত, যা সত্য-সঠিক পথ দেখায় এবং হক ও বাতিলের পার্থক্য সুস্পষ্ট করে দেয়। কাজেই এখন থেকে যে ব্যক্তি এ মাসের সাক্ষাত পাবে তার জন্য এই সম্পূর্ণ মাসটিতে রোযা রাখা অপরিহার্য এবং যে ব্যক্তি রোগগ্রস্ত হয় বা সফরে থাকে, সে যেন অন্য দিনগুলোয় রোযার সংখ্যা পূর্ণ করে। [১৮৬] আল্লাহ তোমাদের সাথে নরম নীতি অবলম্বন করতে চান, কঠোর নীতি অবলম্বন করতে চান না। তাই তোমাদেরকে এই পদ্ধতি জানানো হচ্ছে, যাতে তোমরা রোযার সংখ্যা পূর্ণ করতে পারো এবং আল্লাহ তোমাদের যে হিদায়াত দান করেছেন সে জন্য যেন তোমরা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করতে ও তার স্বীকৃতি দিতে এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারো। [১৮৭]

www.pathagar.com

আয়াত সমূহের ব্যাখ্যা

১৮৩. ইসলামের অন্যান্য বিধানের মতো রোযাও পর্যায়ক্রমে ফরয হয়। শুরুতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলামনদেরকে মাত্র প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এ রোযা ফরয ছিল না। তারপর দ্বিতীয় হিজরীতে রামাদান মাসের রোযার এই বিধান কুরআনে নাযিল হয়। তবে এতে এতটুকুন সুযোগ দেয়া হয়, রোযার কষ্ট বরদাশত করার শক্তি থাকা সত্ত্বেও যারা রোযা রাখবেনা তারা প্রত্যেক রোযার বদলে একজন মিসকিনকে আহার করাবে। পরে দ্বিতীয় বিধানটি নাযিল হয়। এতে পূর্ব প্রদত্ত সাধারণ সুযোগ বাতিল করে দেয়া হয়। কিন্তু রোগী, মুসাফির, গর্ভবর্তী মহিলা বা দুগ্ধপোষ্য শিশুর মাতা এবং রোযা রাখার ক্ষমতা নেই এমন সব বৃদ্ধদের জন্য এ সুযোগটি আগের মতোই বহাল রাখা হয়। পরে ওদের অক্ষমতা দূর হয়ে গেলে রামাদানের যে ক'টি রোযা তাদের বাদ গেছে সে ক'টি পূরণ করে দেয়ার জন্য তাদের নির্দেশ দেয়া হয়।

১৮৪. অর্থাৎ একাধিক মিসকিনকে আহার করায় অথবা রোযাও রাখে আবার মিসকিনকেও আহার করায়।

১৮৫. দ্বিতীয় হিজরীতে বদর যুদ্ধের আগে রামাদানের রোযা সম্পর্কে যে বিধান নাযিল হয়েছিল এ পর্যন্ত সেই প্রাথমিক বিধানই বর্ণিত হয়েছে। এর পরবর্তী আয়াত এর এক বছর পরে নাযিল হয় এবং বিষয়বস্তুর সাদৃশ্যের কারণে এর সাথে সংযুক্ত করে দেয়া হয়।

১৮৬. সফররত অবস্থায় রোযা না রাখা ব্যক্তির ইচ্ছা ও পছন্দের ওপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। সাহাবীগণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সফরে যেতেন। তাঁদের কেউ রোযা রাখতেন আবার কেউ রাখতেন না। উভয় দলের কেউ পরস্পরের বিরুদ্ধে আপত্তি উঠাতেন না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও সফরে কখনো রোযা রেখেছেন, কখনো রাখেননি। এক সফরে এক ব্যক্তি বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেলো। তার চারদিকে লোক জড়ো হয়ে গেলো। এ অবস্থা দেখে নবী সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যাপার কি জিজ্ঞেস করলেন। বলা হলো, এই ব্যক্তি রোযা রেখেছে। জবাব দিলেনঃ এটি সৎকাজ নয়। যুদ্ধের সময় তিনি রোযা না রাখার নির্দেশ জারী করতেন, যাতে দুশমনের সাথে পাঞ্জা লড়বার ব্যাপারে কোন প্রকার দূর্বলতা দেখা না দেয়। হযতর উমর (রা) রেওয়ায়াত করেছেন, "দু'বার আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে রামাদান মাসে যুদ্ধে যাই। প্রথমবার বদরে এবং শেষবার মক্কা বিজয়ের সময়। এই দু'বারই আমরা রোযা রাখিনি"। ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেছেন, মক্কা বিজয়ের সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেনঃ هذا يوم قتال فأفطروا "এটা কাফেরদের সাথে লড়াইয়ের দিন, কাজেই রোযা রেখো না"। অন্য হাদীসে নিম্নোক্তভাবে বলা হয়েছেঃ إنكم قد دنوتم عدوكم فأفطروا أقوى لكم "শত্রুর সাথে মোকাবিলা করতে হচ্ছে। কাজেই রোযা রেখো না। এর ফলে তোমরা যুদ্ধ করার শক্তি অর্জন করতে পারবে"।

www.pathagar.com

সাধারণ সফরের ব্যাপারে কতটুকুন দূরত্ব অতিক্রম করলে রোযা ভাঙ্গা যায়,রসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোন বক্তব্য থেকে তা সুস্পষ্ট হয় না। সাহাবায়ে কেরামের কাজও এ ব্যাপারে বিভিন্ন। এ ব্যাপারে সঠিক বক্তব্য হচ্ছে এই যে, যে পরিমাণ দূরত্ব সাধারণ্যের সফর হিসেবে পরিগণিত এবং যে পরিমাণ দূরত্ব অতিকক্রম করলে মুসাফিরী অবস্থা অনুভূত হয়, তাই রোযা ভাঙ্গার জন্য যথেষ্ট।

যেদিন সফর শুরু করা হয় সেদিনের রোযা না রাখা ব্যক্তির নিজের ইচ্ছাধীন, এটি একটি সর্বসম্মত বিষয়। মুসাফির চাইলে ঘর থেকে খেয়ে বের হতে পারে আর চাইলে ঘরে থেকে বের হয়েই খেতে নিতে পারে। সাহাবীদের থেকে উভয় প্রকারের কাজের প্রমাণ পাওয়া যায়।

কোন শহর শত্রুদের দ্বারা আক্রান্তহলে সেই শহরের অধিবাসীরা নিজেদের শহরে অবস্থান করা সত্ত্বেও জিহাদের কারণে রোযা ভাঙতে পারে কি না এ ব্যাপারে উলামায়ে কেরাম বিভিন্ন মত পোষণ করেন। কোন কোন আলেম এর অনুমতি দেননি। কিন্তু আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (র) অত্যন্ত শক্তিশালী প্রমাণের ভিত্তিতে এ অবস্থায় রোযা ভাঙ্গাকে পুরোপুরি জায়েয বলে ফতোয়া দিয়েছিলেন।

১৮৭. অর্থাৎ আল্লাহ রোযা রাখার জন্য কেবল রামাদান মাসের দিনগুলোকে নির্দিষ্ট করে দেননি। বরং কোন শরীয়াত সমর্থিত ওজরের কারণে যারা রামাদানে রোযা রাখতে অপারগ হয় তারা অন্য দিনগুলোয় এই রোযা রাখতে পারে, এর পথও উন্মুক্ত রাখা হয়েছে। মানুষকে কুরআনের যে নিয়ামত দান করা হয়েছে তার শুকরিয়া আদায় করার মূল্যবান সুযোগ থেকে যাতে কেউ বঞ্চিত না হয় তার জন্যই এই ব্যবস্থা।

এ প্রসংগে এ কথাটি অবশ্যই অনুধাবন করতে হবে যে, রামাদানের রোযাকে কেবলমাত্র তাক্ওয়ার অনুশীলনই গণ্য করা হয়নি বরং কুরআনের আকারে আল্লাহ যে বিরাট ও মহান নিয়ামত মানুষকে দান করেছেন রোযাকে তার শুকরিয়া আদায়ের মাধ্যম হিসেবেও গণ্য করা হয়েছে। আসলে একজন বুদ্ধিমান, জ্ঞানী ও সুবিবেচক ব্যক্তির জন্য কোন নিয়ামতের শুকরিয়া আদায়ের এবং কোন অনুগ্রহের স্বীকৃতি প্রদানের জন্য সর্বোত্তম পদ্ধতি একটিই হতে পারে। আর তা হচ্ছে, যে উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্য সেই নিয়ামতটি দান করা হয়েছিল তাকে পূর্ণ করার জন্য নিজেকে সর্বাত্মকভাবে প্রস্তুত করা। কুরআন আমাদের এই উদ্দেশ্যে দান করা হয়েছে যে, আমরা এর মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টির পথ জেনে নিয়ে নিজেরা সে পথে চলবো এবং অন্যদেরকেও সে পথে চালাবো। এই উদ্দেশ্যে আমাদের তৈরী করার সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে রোযা। কাজেই কুরআন নাযিলের মাসে আমাদের রোযা রাখা কেবল ইবাদাত ও নৈতিক অনুশীলনই নয় বরং এই সংগে কুরআনের মত নিয়ামতের যথার্থ শুকরিয়া আদায়ও এর মাধ্যমে সম্ভব হয়।

www.pathagar.com

০২ রামাদান
বিষয়: পাক কালিমা আর নাপাক কালিমা
সূরা ইবরাহীম : ২৪-২৭

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ (24) تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (25) وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِن فَوْقِ الأَرْضِ مَا لَهَا مِن قَرَارٍ (26) يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ (27)

২৪) তুমি কি দেখছো না আল্লাহ কালেমা তাইয়্যেবার [৩৪] উপমা দিয়েছেন কোন জিনিসের সাহায্যে? এর উপমা হচ্ছে যেমন একটি ভালো জাতের গাছ, যার শিকড় মাটির গভীরে প্রোথিত এবং শাখা-প্রশাখা আকাশে পৌঁছে গেছে। [৩৫]

২৫) প্রতি মুহূর্তে নিজের রবের হুকুমে সে ফলদান করে। [৩৬] এ উপমা আল্লাহ এ জন্য দেন যাতে লোকেরা এর সাহায্যে শিক্ষা লাভ করতে পারে।

২৬) অন্যদিকে অসৎ বাক্যের [৩৭] উপমা হচ্ছে, একটি মন্দ গাছ, যাকে ভূপৃষ্ঠ থেকে উপড়ে দূরে নিক্ষেপ করা হয়, যার কোন স্থায়িত্ব নেই। [৩৮]

২৭) ঈমানদারদেরকে আল্লাহ একটি শাশ্বত বাণীর ভিত্তিতে দুনিয়া ও আখেরাত উভয় স্থানে প্রতিষ্ঠা দান করেন। [৩৯] আর জালেমদেরকে আল্লাহ পথভ্রষ্ট করেন। [৪০] আল্লাহ যা চান তাই করেন।

আয়াত সমূহের ব্যাখ্যা

৩৪."কালিমা তাইয়্যেবা" র শাব্দিক অর্থ "পবিত্র কথা" কিন্তু এ শব্দের মাধ্যমে যে তাৎপর্য গ্রহণ করা হয়েছে তা হচ্ছে, এমন সত্য কথা এবং এমন পরিচ্ছন্ন বিশ্বাস যা পুরোপুরি সত্য ও সরলতার ওপর প্রতিষ্ঠিত। এ উক্তি ও আকীদা কুরআন মজীদের দৃষ্টিতে অপরিহার্যভাবে এমন একটি কথা ও বিশ্বাস হতে পারে যার মধ্যে রয়েছে তাওহীদের স্বীকৃতি, নবীগণ ও আসমানী কিতাবসমূহের স্বীকৃতি এবং আখেরাতের স্বীকৃতি। কারণ কুরআন এ বিষয়গুলোকেই মৌলিক সত্য হিসেবে পেশ করে।

৩৫. অন্য কথায় এর অর্থ হলো, পৃথিবী থেকে আকাশ পর্যন্ত সমগ্র বিশ্বব্যবস্থা যেহেতু এমন একটি সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত যার স্বীকৃতি একজন মুমিন তার কালিমা তাইয়্যেবার মধ্যে দিয়ে থাকে, তাই কোন স্থানের প্রাকৃতিক আইন এর সাথে সংঘর্ষ বাধায় না, কোন বস্তুর আসল, স্বভাব ও প্রাকৃতিক গঠন একে অস্বীকার করে না এবং

www.pathagar.com

কোথাও কোন প্রকৃত সত্য ও সততা এর সাথে বিরোধ করে না। তাই পৃথিবী ও তার সমগ্র ব্যবস্থা তার সাথে সহযোগিতা করে এবং আকাশ তথা সমগ্র মহাশূন্য জগত তাকে স্বাগত জানায়।

৩৬. অর্থাৎ সেটি একটি ফলদায়ক ও ফলপ্রসূ কালিমা। কোন ব্যক্তি বা জাতি তার ভিত্তিতে জীবন ব্যবস্থা গড়ে তুললে প্রতি মুহূর্তে সে তার সুফল লাভ করতে থাকে। সেটি চিন্তা ধারায় পরিপক্কতা ও পরিচ্ছন্নতা, স্বভাবে প্রশান্তি, মেজাজে ভারসাম্য, এ জীবন ধারায় মজবুতী, চরিত্রে পবিত্রতা, আত্মায় প্রফুল্লতা ও স্নিগ্ধতা, শরীরে পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা, আচরণে মাধুর্য, ব্যবহার ও লেনদেনে সততা, কথাবার্তায় সত্যবাদিতা, ওয়াদা ও অংগীকারে দৃঢ়তা, সামাজিক জীবন যাপনে সদাচার, কৃষ্টিতে ঔদার্য ও মহত্ব, সভ্যতায় ভারসাম্য, অর্থনীতিতে আদল ও ইনসাফ, রাজনীতিতে বিশ্বস্ততা, সন্ধিতে আন্তরিকতা এবং চুক্তি ও অংগীকারে বিশ্বস্ততা সৃষ্টি করে। সেটি এমন একটি পরশ পাথর যার প্রভাব কেউ যথাযথভাবে গ্রহণ করলে খাঁটি সোনায় পরিণত হয়।

৩৭. এটি কালিমা তাইয়্যেবার বিপরীত শব্দ। যদিও প্রতিটি সত্য বিরোধী ও মিথ্যা কথার ওপর এটি প্রযুক্ত হতে পারে তবুও এখানে এ থেকে এমন প্রতিটি বাতিল আক্বীদা বুঝায়, যার ভিত্তিতে মানুষ নিজের জীবন ব্যবস্থা গড়ে তোলে। এ বাতিল আক্বীদা নাস্তিক্যবাদ, নিরেশ্বরবাদ, ধর্মদ্রোহিতা, অবিশ্বাস, শিরক, পৌত্তলিকতা অথবা এমন কোন চিন্তাধারাও হতে পারে যা নবীদের মাধ্যমে আসেনি।

৩৮. অন্য কথায় এর অর্থ হলো, বাতিল আক্বীদা যেহেতু সত্য বিরোধী তাই প্রাকৃতিক আইন কোথাও তার সাথে সহযোগিতা করে না। বিশ্ব জগতের প্রতিটি অণুকণিকা তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। পৃথিবী ও আকাশের প্রতিটি বস্তু তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। জমিতে তার বীজ বপন করার চেষ্টা করলে জমি সবসময় তাকে উদ্গীরণ করার জন্য তৈরী থাকে। আকাশের দিকে তার শাখা প্রশাখা বেড়ে উঠতে থাকলে আকাশ তাদেরকে নিচের দিকে ঠেলে দেয়। পরীক্ষার খাতিরে মানুষকে যদি নির্বাচন করার স্বাধীনতা ও কর্মের অবকাশ না দেয়া হতো তাহলে এ অসৎ জাতের গাছটি কোথাও গজিয়ে উঠতে পারতো না। কিন্তু যেহেতু মহান আল্লাহ আদম সন্তানকে নিজের স্বাধীন ইচ্ছা ও প্রবণতা অনুযায়ী কাজ করার সুযোগ দান করেছেন, তাই যেসব নির্বোধ লোক প্রাকৃতিক আইনের বিরুদ্ধে লড়ে এ গাছ লাগাবার চেষ্টা করে তাদের শক্তি প্রয়োগের ফলে জমি একে সামান্য কিছু জায়গা দিয়েও দেয়, বাতাস ও পানি থেকে সে কিছু না কিছু খাদ্য পেয়েই যায় এবং শূন্যও তার ডালপালা ছড়াবার জন্য অনিচ্ছাকৃতভাবে কিছু জায়গা তাকে দিতে প্রস্তুত হয়ে যায়। কিন্তু যতদিন এ গাছ বেঁচে থাকে ততদিন তিক্ত, বিস্বাদ ও বিষাক্ত ফল দিতে থাকে এবং অবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথেই আকস্মিক ঘটনাবলীর এক ধাক্কাই তাকে সমূলে উৎপাটিত করে।

www.pathagar.com

পৃথিবীর ধর্মীয়, নৈতিক, চিন্তাগত ও তামাদ্দুনিক ইতিহাস অধ্যয়নকারী প্রত্যেক ব্যক্তিই কালিমায়ে তাইয়্যেবা তথা ভালো কথা এবং মন্দ কথার এ পার্থক্য সহজে অনুভব করতে পারে। সে দেখবে ইতিহাসের শুরু থেকে আজ পর্যন্ত ভালো কথা একই থেকেছে। কিন্তু মন্দ কথা সৃষ্টি হয়েছে অসংখ্য। ভালো কথাকে কখনো শিকড়শুদ্ধ উপড়ে ফেলা যায়নি। কিন্তু মন্দ কথার তালিকা হাজারো মৃত কথার নামে ভরে আছে। এমনকি তাদের অনেকের অবস্থা হচ্ছে এই যে, আজ ইতিহাসের পাতা ছাড়া আর কোথাও তাদের নাম নিশানাও পাওয়া যায় না। স্ব স্ব যুগে যেসব কথার প্রচন্ড দাপট ছিল আজ সে সব কথা উচ্চারিত হলে মানুষ এই ভেবে অবাক হয়ে যায় যে, একদিন এমন পর্যায়ের নির্বুদ্ধিতাও মানুষ করেছিল।

তারপর ভালো কথাকে যখনই যে জাতি বা ব্যক্তি যেখানেই গ্রহণ করে সঠিক অর্থে প্রয়োগ করেছে সেখানেই তার সমগ্র পরিবেশ তার সুবাসে আমোদিত হয়েছে। তার বরকতে শুধুমাত্র সেই ব্যক্তি বা জাতিই সমৃদ্ধ হয়নি বরং তার আশপাশের জগতও সমৃদ্ধ হয়েছে। কিন্তু কোন মন্দ কথা যেখানেই ব্যক্তি বা সমাজ জীবনে শিকড় গেড়েছে সেখানেই তার দুর্গন্ধে সমগ্র পরিবেশ পুতিগন্ধময় হয়ে উঠেছে এবং তার কাঁটার আঘাত থেকে তার মান্যকারীরা নিরাপদ থাকেনি এবং এমন কোন ব্যক্তিও নিরাপদ থাকতে পারেনি যে তার মুখোমুখি হয়েছে।

এ প্রসংগে একথা উল্লেখ্য যে, এখানে উপমার মাধ্যমে ১৮ আয়াতে যে বিষয়টি বর্ণনা করা হয়েছিল সেটিই বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে। ১৮ আয়াতে বলা হয়েছিল, নিজের রবের সাথে যারা কুফরী করে তাদের দৃষ্টান্ত এমন ছাই-এর মতো যাকে ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ দিনের প্রবল বাতাস উড়িয়ে দিয়েছে। এ একই বিষয়বস্তু ইতিপূর্বে সূরা আর রা'দ-এর ১৭ আয়াতে অন্যভাবে বন্যা ও গলিত ধাতুর উপমার সাহায্যে বর্ণনা করা হয়েছে।

৩৯. অর্থাৎ এ কালিমার বদৌলতে তারা দুনিয়ায় একটি স্থায়ী দৃষ্টিভংগী, একটি শক্তিশালী ও সুগঠিত চিন্তাধারা এবং একটি ব্যাপকভিত্তিক মতবাদ ও জীবন দর্শন লাভ করে। জীবনের সকল জটিল গ্রন্থীর উন্মোচনে এবং সকল সমস্যার সমাধানে তা এমন এক চাবির কাজ করে যা দিয়ে সকল তালা খোলা যায়। তার সাহায্যে চরিত্র মজবুত এবং নৈতিক বৃত্তিগুলো সুগঠিত হয়। তাকে কালের আবর্তন একটুও নড়াতে পারে না। তার সাহায্যে জীবন যাপনের এমন কতগুলো নিরেট মূলনীতি পাওয়া যায় যা একদিকে তাদের হৃদয়ে প্রশান্তিও মস্তিষ্কে নিশ্চিন্ততা এনে দেয় এবং অন্যদিকে তাদেরকে প্রচেষ্টা ও কর্মের পথে দিশেহারা হয়ে ঘুরে বেড়াবার দ্বারে দ্বারে ঠোকর খাওয়ার এবং অস্থিরতার শিকার হওয়ার হাত থেকে বাঁচায়। তারপর যখন তারা মৃত্যুর সীমানা পার হয়ে পরলোকের সীমান্তে পা রাখে তখন সেখানে তারা বিস্ময়াভিভূত, হতবাক ও পেরেশান হয় না। কারণ সেখানে তাদের প্রত্যাশা অনুযায়ী সবকিছু হতে থাকে। সে জগতে তারা এমনভাবে প্রবেশ করতে থাকে যেন সেখানকার আচার-অনুষ্ঠান ও রীতিনীতি সম্পর্কে তারা পূর্বাহ্লেই অবহিত ছিল। সেখানে এমন কোন পর্যায় উপস্থাপিত হয়না যে সম্পর্কে

www.pathagar.com

তাদের পূর্বাহ্নে খবর দেয়া হয়নি এবং যে জন্য তারা পূর্বেই প্রস্তুতি পর্ব সম্পন্ন করে রাখেনি। তাই সেখানে প্রত্যেক মন্‌যিলই তারা দৃঢ় পদে অতিক্রম করে যায়। পক্ষান্তরে কাফের ব্যক্তি মৃত্যুর পরপরই নিজের প্রত্যাশার সম্পূর্ণ বিপরীত অকস্মাৎ এক ভিন্ন অবস্থার মুখোমুখি হয়। তার অবস্থা মুমিন থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হয়।

৪০. অর্থাৎ যেসব জালেম কালিমায়ে তাইয়্যেবা বাদ দিয়ে কোন মন্দ কালেমার অনুসরণ করে আল্লাহ তাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও মন-মানসকে দিশেহারা করে দেন এবং তাদের প্রচেষ্টাবলীর মধ্যে বিশৃংখলা সৃষ্টি করেন। তারা কোন দিক দিয়েও চিন্তা কর্মের সঠিক পথে পাড়ি জমাতে পারে না। তাদের কোন তীরও সঠিক লক্ষ্যস্থলে লাগে না।

www.pathagar.com

০৩ রামাদান
বিষয়: তাওহীদ
সূরা আল্ বাক্বারাহ: ২৫৫-২৫৭

اللّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ (255) لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ لاَ انفِصَامَ لَهَا وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (256) اللّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُواْ يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْلِيَآؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (257)

২৫৫) আল্লাহ এমন এক চিরঞ্জীব ও চিরন্তন সত্তা, যিনি সমগ্র বিশ্ব-জাহানের দায়িত্বভার বহন করছেন, তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই।[২৭৮] তিনি ঘুমান না এবং তন্দ্রাও তাঁকে স্পর্শ করে না।[২৭৯] পৃথিবী ও আকাশে যা কিছু আছে সবই তাঁর।[২৮০] কে আছে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর কাছে সুপারিশ করবে ?[২৮১] যা কিছু মানুষের সামনে আছে তা তিনি জানেন এবং যা কিছু তাদের অগোচরে আছে সে সম্পর্কেও তিনি অবগত। তিনি নিজে যে জিনিসের জ্ঞান মানুষকে দিতে চান সেটুকু ছাড়া তাঁর জ্ঞানের কিছুই তারা আয়ত্ব করতে পারে না।[২৮২] তাঁর কর্তৃত্ব [২৮৩] আকাশ ও পৃথিবীব্যাপী। এগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত করে না। মূলত তিনিই এক মহান ও শ্রেষ্ঠ সত্তা।[২৮৪]

২৫৬) দ্বীনের ব্যাপারে কোন জোর-জবরদস্তি নেই।[২৮৫] ভ্রান্ত মত ও পথ থেকে সঠিক মত ও পথকে ছাঁটাই করে আলাদা করে দেয়া হয়েছে। এখন যে কেউ তাগুতকে [২৮৬] অস্বীকার করে আল্লাহর ওপর ঈমান আনে, সে এমন একটি মজবুত অবলম্বন আঁকড়ে ধরে, যা কখনো ছিন্ন হয় না। আর আল্লাহ (যাকে সে অবলম্বন হিসেবে আঁকড়ে ধরেছে) সবকিছু শোনেন ও জানেন।

২৫ ৭) যারা ঈমান আনে আল্লাহ তাদের সাহায্যকারী ও সহায়। তিনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর মধ্যে নিয়ে আসেন।[২৮৭] আর যারা কুফরীর পথ অবলম্বন করে তাদের সাহায্যকারী ও সহায় হচ্ছে তাগুত।[২৮৮] সে তাদের আলোক থেকে অন্ধকারের মধ্যে টেনে নিয়ে যায়। এরা আগুনের অধিবাসী। সেখানে থাকবে এরা চিরকালের জন্য।

www.pathagar.com

২৭৮. অর্থাৎ মূর্খতা নিজেদের কল্পনা ও ভাববাদিতার জগতে বসে যত অসংখ্য উপাস্য, ইলাহ্ ও মাবুদ তৈরী করুক না কেন আসলে কিন্তু সার্বভৌম ক্ষমতা প্রতিপত্তি ও শাসন কর্তৃত্ব নিরংকুশভাবে একমাত্র সেই অবিনশ্বর সত্তার অংশীভূত, যাঁর জীবন কারো দান নয় বরং নিজস্ব জীবনী শক্তিকে যিনি স্বয়ং জীবিত এবং যাঁর শক্তির ওপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছে এই বিশ্ব-জাহানের সমগ্র ব্যবস্থাপনা। নিজের এই বিশাল সীমাহীন রাজ্যের যাবতীয় শাসন কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার একচ্ছত্র মালিক তিনি একাই। তাঁর গুণাবলীতে দ্বিতীয় কোন সত্তার অংশীদারীত্ব নেই। তাঁর ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও অধিকারেও নেই দ্বিতীয় কোন শরীক। কাজেই তাঁকে বাদ দিয়ে বা তার সাথে শরীক করে পৃথিবীতে বা আকাশে কোথাও আর কাউকে মাবুদ, ইলাহ্ ও প্রভু বানানো হলে তা একটি নিরেট মিথ্যা ছাড়া আর কিছুই হয় না। এভাবে আসলে সত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়।

২৭৯. মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর সত্তাকে যারা নিজেদের দূর্বল অস্তিত্বের সদৃশ মনে করে এবং যাবতীয় মানবিক দুর্বলতাকে আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত করে, এখানে তাদের চিন্তা ও ধারণার প্রতিবাদ করা হয়েছে। যেমন বাইবেলের বিবৃতি মতে, আল্লাহ ছয় দিনে পৃথিবী ও আকাশ তৈরী করেন এবং সপ্তম দিনে বিশ্রাম নেন।

২৮০. অর্থাৎ তিনি পৃথিবী ও আকাশের এবং এ দু'য়ের মধ্যে যা কিছু আছে সবকিছুর মালিক। তাঁর মালিকানা, কর্তৃত্ব ও শাসন পরিচালনায় কারো এক বিন্দু পরিমাণও অংশ নেই। তাঁর পরে এই বিশ্ব-জাহানের অন্য যে কোন সত্তার কথাই চিন্তা করা হবে সে অবশ্যই হবে এই বিশ্ব-জগতের একটি সৃষ্টি। আর বিশ্ব-জগতের সৃষ্টি অবশ্যই হবে আল্লাহর মালিকানাধীন এবং তাঁর দাস। তাঁর অংশীদার ও সমকক্ষ হবার কোন প্রশ্নই এখানে ওঠে না।

২৮১. এখানে এক শ্রেণীর মুশরিকদের চিন্তার প্রতিবাদ করা হয়েছে, যারা বুযুর্গ ব্যক্তিবর্গ, ফেরেশতা বা অন্যান্য সত্তা সম্পর্কে এই ধারণা পোষণ করে যে, আল্লাহর ওখানে তাদের বিরাট প্রতিপত্তি রয়েছে। তারা যে কথার ওপর অটল থাকে, তা তারা আদায় করেই ছাড়ে। আর আল্লাহর কাছ থেকে তারা যে কোন কার্যোদ্ধার করতে সক্ষম। এখানে তাদেরকে বলা হচ্ছে, আল্লাহর ওখানে প্রতিপত্তির তো কোন প্রশ্নই ওঠে না, এমনকি কোন শ্রেষ্ঠতম পয়গম্বর এবং কোন নিকটতম ফেরেশতাও এই পৃথিবী ও আকাশের মালিকের দরবারে বিনা অনুমতিতে একটি শব্দও উচ্চারণ করার সাহস রাখে না।

২৮২. এই সত্যটি প্রকাশের পর শিরকের ভিত্তির ওপর আর একটি আঘাত পড়লো। ওপরের বাক্যগুলোয় আল্লাহর অসীম কর্তৃত্ব ও তার সাথে সম্পর্কিত ক্ষমতাবলী সম্পর্কে একটা ধারণা পেশ করে বলা হয়েছিল, তাঁর কর্তৃত্বে স্বতন্ত্রভাবে কারো অংশীদারীত্ব নেই এবং কেউ নিজের সুপারিশের জোরে তাঁর সিদ্ধান্তের ওপর প্রভাব বিস্তার করার ক্ষমতাও

www.pathagar.com

রাখে না। অতঃপর এখানে অন্যভাবে বলা হচ্ছে, অন্য কেউ তাঁর কাজে কিভাবে হস্তক্ষেপ করতে পারে যখন তার কাছে এই বিশ্ব-জাহানের ব্যবস্থাপনা এবং এর অন্তর্নিহিত কার্যকারণ ও ফলাফল বুঝার মতো কোন জ্ঞানই নেই? মানুষ, জ্বিন ফেরেশতা বা অন্য কোন সৃষ্টিই হোক না কেন সবার জ্ঞান অপূর্ণ ও সীমিত। বিশ্ব-জাহানের সমগ্র সত্য ও রহস্য কারো দৃষ্টিসীমার মধ্যে নেই। তারপর কোন একটি ক্ষুদ্রতর অংশেও যদি কোন মানুষের স্বাধীন হস্তক্ষেপ অথবা অনড় সুপারিশ কার্যকর হয় তাহলে তো বিশ্ব-জগতের সমগ্র ব্যবস্থাপনাই ওলট-পালট হয়ে যাবে। বিশ্ব-জগতের ব্যবস্থাপনা তো দূরের কথা মানুষ নিজের ব্যক্তিগত ভালোমন্দ বুঝারও ক্ষমতা রাখে না। বিশ্ব-জাহানের প্রভু ও পরিচালক মহান আল্লাহই এই ভালোমন্দের পুরোপুরি জ্ঞান রাখেন। কাজেই এক্ষেত্রে জ্ঞানের মূল উৎস মহান আল্লাহর হিদায়াতও পথনির্দেশনার ওপর আস্থা স্থাপন করা ছাড়া মানুষের জন্য দ্বিতীয় আর কোন পথ নেই।

২৮৩. কুরআনে উল্লিখিত মূল শব্দ হচ্ছে 'কুরসী'। সাধারণ এ শব্দটি কর্তৃত্ব, ক্ষমতা ও রাষ্ট্রশক্তি অর্থে রূপক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। (বাঙলা ভাষায় এরই সমজাতীয় শব্দ হচ্ছে 'গদি'। গদির লড়াই বললে ক্ষমতা কর্তৃত্বের লড়াই বুঝায়)।

২৮৪. এই আয়াতটি আয়াতুল কুরসী নামে খ্যাত। এখানে মহান আল্লাহর এমন পূর্ণাংগ পরিচিতি পেশ করার হয়েছে, যার নজীর আর কোথাও নেই। আর হাদীসে একে কুরআনের শ্রেষ্ঠ আয়াত বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রশ্ন উঠতে পারে, এখানে কোন্ প্রসংগে বিশ্ব-জাহানের মালিক মহান আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলী আলোচনা করা হয়েছে? এ বিষয়টি বুঝতে হলে ৩২ রুকূ' থেকে যে আলোচনাটি চলছে তার ওপর আর একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিতে হবে। প্রথমে মুসলমানদের ইসলামী জীবন বিধান প্রতিষ্ঠার জন্য ধন-প্রাণ উৎসর্গ করে জিহাদে উদ্বুদ্ধ করা হয়। বনী ইসরাঈলরা যেসব দূর্বলতার শিকার হয়েছিল তা থেকে দূরে থাকার জন্য তাদের জোর তাগিদ দেয়া হয়। তারপর তাদেরকে এ সত্যটি বুঝানো হয় যে, বিজয় ও সাফল্য সংখ্যা যুদ্ধাস্ত্রের আধিক্যের ওপর নির্ভর করে না বরং ঈমান, সবর, সংযম, নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা ও সংকল্পের দৃঢ়তার ওপর নির্ভর করে। অতঃপর যুদ্ধের সাথে আল্লাহর যে কর্মনীতি সম্পর্কিত রয়েছে সেদিকে ইংগিত করা হয়। অর্থাৎ দুনিয়ার ব্যবস্থাপনা অক্ষুন্ন রাখার জন্য তিনি সবসময় মানুষদের একটি দলের সাহায্যে আর একটি দলকে দমন করে থাকেন। নয়তো যদি শুধুমাত্র একটি দল স্থায়ীভাবে বিজয় লাভ করে কর্তৃত্ব ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকতো তাহলে দুনিয়ায় অন্যদের জীবন ধারণ কঠিন হয়ে পড়তো।

আবার এ প্রসংগে অজ্ঞ লোকদের মনে আরো যে একটি প্রশ্ন প্রায়ই জাগে তারও জবাব দেয়া হয়েছে। সে প্রশ্নটি হচ্ছে, আল্লাহ যদি তাঁর নবীদেরকে মতবিরোধ খতম করার ও ঝগড়া-বিবাদ মিটিয়ে ফেলার জন্য পাঠিয়ে থাকেন এবং তাদের আগমনের পরও মতবিরোধ ও ঝগড়া-বিবাদ খতম না হয়ে থাকে তাহলে কি আল্লাহ এতই দূর্বল যে, এই

www.pathagar.com

গলদগুলো দূর করতে চাইলেও তিনি দূর করতে পারেননি? এর জবাবে বলা হয়েছে, বলপূর্বক মতবিরোধ বন্ধ করা এবং মানব জাতিকে জোর করে একটি বিশেষ পথে পরিচালনা করা আল্লাহর ইচ্ছা ছিল না। যদি এটা আল্লাহর ইচ্ছা হতো তাহলে তার বিরুদ্ধাচরণ করার কোন ক্ষমতাই মানুষের থাকতো না। আবার যে মূল বিষয়বস্তুর মাধ্যমে আলোচনার সূচনা করা হয়েছিল একটি বাক্যের মধ্যে সেটিকেও ইংগিত করা হয়েছে। এরপর এখন বলা হচ্ছে, মানুষের আক্বীদা-বিশ্বাস,আদর্শ,মতবাদ ও ধর্ম যতই বিভিন্ন হোক না কেন আসলে ও প্রকৃত সত্য যার ওপর আকাশ ও পৃথিবীর সমগ্র ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত, এই আয়াতেই বিবৃত হয়েছে। মানুষ এ সম্পর্ক ভুল ধারণা করলেই বা কি, এ জন্য মূল সত্যের তো কোন চেহারা বদল হবে না। কিন্তু লোকদেরকে এটা মানতে বাধ্য করানো আল্লাহর উদ্দেশ্য নয়। যে ব্যক্তি এটা মেনে নেবে সে নিজেই লাভবান হবে। আর যে মুখ ফিরিয়ে নেবে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

২৮৫. এখানে দ্বীন বলতে ওপরের আয়াতে বর্ণিত আয়াতুল কুরসীতে আল্লাহ সম্পর্কিত আক্বীদা ও সেই আক্বীদার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত জীবন ব্যবস্থাকে বুঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ হচ্ছে, 'ইসলাম' এর এই আক্বীদাগত এবং নৈতিক ও কর্মগত ব্যবস্থা কারো ওপর জোর করে চাপিয়ে দেয়া যেতে পারেনা। যেমন কাউকে ধরে তার মাথায় জোর করে একটা বোঝা চাপিয়ে দেয়া হয়, এটা তেমন নয়।

২৮৬. আভিধানিক অর্থে এমন প্রত্যেকটি ব্যক্তিকে 'তাগুত' বলা হবে, যে নিজের বৈধ অধিকারের সীমানা লংঘন করেছে। কুরআনের পরিভাষায় তাগুত এমন এক বান্দাকে বলা হয়, যে বন্দেগী ও দাসত্বের সীমা অতিক্রম করে নিজেই প্রভু ও খোদা হবার দাবীদার সাজে এবং আল্লাহর বান্দাদেরকে নিজের বন্দেগী ও দাসত্বে নিযুক্ত করে। আল্লাহর মোকাবিলায় বান্দার প্রভুত্বের দাবীদার সাজার এবং বিদ্রোহ করার তিনটি পর্যায় আছে। **প্রথম পর্যায়** বান্দা নীতিগতভাবে তাঁর শাসন কর্তৃত্বকে সত্য বলে মেনে নেয় কিন্তু কার্যত তার বিধানের বিরুদ্ধাচরণ করে। একে বলা হয় ফাসেকী। **দ্বিতীয় পর্যায়ে** সে আল্লাহর শান কর্তৃত্বকে নীতিগতভাবে মেনে না নিয়ে নিজের স্বাধীনতার ঘোষণা দেয় অথবা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কারো বন্দেগী ও দাসত্ব করতে থাকে। একে বলা হয় কুফরী। **তৃতীয় পর্যায়ে** সে মালিক ও প্রভুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে তার রাজ্যে এবং তার প্রজাদের মধ্যে নিজের হুকুম চালাতে থাকে। এই শেষ পর্যায়ে যে বা যারা পৌঁছে যায় তাকেই বলা হয়া 'তাগুত'। কোন ব্যক্তি এই তাগুতকে অস্বীকার না করা পর্যন্ত কোনদিন সঠিক অর্থে আল্লাহর মু'মিন বান্দা হতে পারে না।

২৮৭. অন্ধকার মানে মূর্খতা ও অজ্ঞতার অন্ধকার। যে অন্ধকারে পথ হারিয়ে মানুষের নিজের কল্যাণ ও সাফল্যের পথ থেকে দূরে সরে যায় এবং সত্যের বিরুদ্ধাচরণ করে নিজের সমস্ত শক্তি ও প্রচেষ্টাকে ভুল পথে পরিচালিত করে, সেই অন্ধকারের কথা এখানে বলা হয়েছে।

www.pathagar.com

২৮৮. "তাগুত" শব্দটি এখানে বহুবচন (তাওয়াগীত) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে মানুষ একটি তাগুতের শৃংখলে আবদ্ধ হয়না বরং বহু তাগুত তার ওপর ঝেঁকে বসে। শয়তান একটি তাগুত। শয়তান তার সামনে প্রতিদিন নতুন নতুন আকাশ কুসুম রচনা করে তাকে মিথ্যা প্রলোভনে প্রলুব্ধ করে রাখে। দ্বিতীয় তাগুত হচ্ছে মানুষের নিজের নফস। এই নফস তাকে আবেগ ও লালসার দাস বানিয়ে জীবনের আঁকাবাঁকা পথে টেনে নিয়ে যেতে থাকে। এ ছাড়া বাইরের জগতে অসংখ্য তাগুত ছড়িয়ে রয়েছে। স্ত্রী, সন্তান, আত্মীয়-স্বজন, পরিবার, বংশ, গোত্র, বন্ধু-বান্ধব, পরিচিতজন, সমাজ, জাতি, নেতা, রাষ্ট্র, দেশ, শাসক ইত্যাকার সবকিছুই মানুষের জন্য মূর্তিমান তাগুত। এদের প্রত্যেকেই তাকে নিজের স্বার্থের দাস হিসেবে ব্যবহার করে। মানুষ তার এই অসংখ্য প্রভুর দাসত্ব করতে করতে এবং এদের মধ্যে থেকে কাকে সন্তুষ্ট করবে আর কার অসন্তুষ্টি থেকে আত্মরক্ষা করবে এই ফিকিরের চক্করে সারা জীবন কাটিয়ে দেয়।

www.pathagar.com

০৪ রামাদান

বিষয়: রিসালাহ ও দু'আ

সূরা বাক্বারাহ : ২৮৪- ২৮৬

لِّلَّه ما فِي السَّمَاوات وَمَا فِي الأَرْضِ وَإِن تُبْدُواْ مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ
اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاء وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاء وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (284) آمَنَ الرَّسُولُ
بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلآئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ
مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ (285) لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا
إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ
تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ
وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (286)

২৮৪) আকাশসমূহে [৩৩৩] ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহর। ৩৩৪ তোমরা নিজেদের মনের কথা প্রকাশ করো বা লুকিয়ে রাখো, আল্লাহ্ অবশ্যই তোমাদের কাছ থেকে তার হিসাব নেবেন। [৩৩৫] তারপর তিনি যাকে ইচ্ছা মাফ করে দেবেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেবেন, এটা তাঁর এখতিয়ারাধীন। তিনি সব জিনিসের ওপর শক্তি খাটাবার অধিকারী। [৩৩৬]

২৮৫) রাসূল তাঁর রবের পক্ষ থেকে তাঁর ওপর যে হিদায়াত নাযিল হয়েছে তার প্রতি ঈমান এনেছেন। আর যেসব লোক ঐ রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে তারাও ঐ হিদায়াতকে মনে-প্রাণে স্বীকার করে নিয়েছে। তারা সবাই আল্লাহকে, তাঁর ফেরেশতাদেরকে, তাঁর কিতাবসমূহকে ও তাঁর রাসূলদেরকে মানে এবং তাদের বক্তব্য হচ্ছেঃ "আমরা আল্লাহর রসূলদের একজনকে আর একজন থেকে আলাদা করি না। আমরা নির্দেশ শুনেছি ও অনুগত হয়েছি। হে প্রভু ! আমরা তোমার কাছে গোনাহ্ মাফের জন্য প্রার্থনা করছি। আমাদেরকে তোমারই দিকে ফিরে যেতে হবে। [৩৩৭]

২৮৬) আল্লাহ্ কারোর ওপর তার সামর্থের অতিরিক্ত দায়িত্বের বোঝা চাপিয়ে দেননা। [৩৩৮] প্রত্যেক ব্যক্তি যে নেকী উপার্জন করেছে তার ফল তার নিজেরই জন্য এবং যে গোনাহ সে অর্জন করেছে, তার প্রতিফলও তারই বর্তাবে। [৩৩৯] (হে ঈমানদারগণ, তোমরা এভাবে দোয়া চাও) হে আমাদের রব! ভুল-ভ্রান্তিতে আমরা যেসব গোনাহ করে বসি, তুমি সেগুলো পাকড়াও করো না। হে প্রভু! আমাদের ওপর এমন বোঝা চাপিয়ে দিয়ো না, যা তুমি আমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছিলে। [৩৪০] হে আমাদের প্রতিপালক! যে বোঝা বহন করার সামর্থ আমাদের নেই, তা আমাদের ওপর চাপিয়ে দিয়ো না। [৩৪১] আমাদের প্রতি কোমল হও, আমাদের অপরাধ ক্ষমা করো এবং আমাদের প্রতি করুণা করো। তুমি আমাদের অভিভাবক। কাফেরদের মোকাবিলায় তুমি আমাদের সাহায্য করো। [৩৪২]

www.pathagar.com

৩৩৩. এখানে ভাষণ সমাপ্ত করা হয়েছে। তাই দ্বীনের মৌলিক শিক্ষাগুলোর বর্ণনার মাধ্যমে যেমন সূরার সূচনা করা হয়েছিল ঠিক তেমনি যে সমস্ত মৌলিক বিষয়ের ওপর দ্বীনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত, সূরার সমাপ্তি প্রসংগে সেগুলোও বর্ণনা করে দেয়া হয়েছে। তুলনামূলক পাঠের জন্য সূরার প্রথম রুকূ'টি সামনে রাখলে বিষয়-বস্তু বুঝতে বেশী সাহায্য করবে বলে মনে করি।

৩৩৪. এটি হচ্ছে দ্বীনের প্রথম বুনিয়াদ। আল্লাহ এই পৃথিবী ও আকাশ সমূহের মালিক এবং আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে যা কিছু আছে সবকিছু তাঁর একক মালিকানাধীন, প্রকৃতপক্ষে এই মৌলিক সত্যের ভিত্তিতেই মানুষের জন্য আল্লাহর সামনে আনুগত্যের শির নত করা ছাড়া দ্বিতীয় কোন কর্মপদ্ধতি বৈধ ও সঠিক হতে পারে না।

৩৩৫. এই বাক্যটিতে আরো দু'টি কথা বলা হয়েছে। **এক:** প্রত্যেক ব্যক্তি এককভাবে আল্লাহর কাছে দায়ী হবে এবং এককভাবে তাকে জবাবাদিহি করতে হবে। **দুই:** পৃথিবী ও আকাশের যে একচ্ছত্র অধিপতির কাছে মানুষকে জবাবদিহি করতে হবে তিনি অদৃশ্য ও প্রকাশ্যের জ্ঞান রাখেন। এমনকি লোকদের গোপন সংকল্প এবং তাদের মনের সংগোপনে যেসব চিন্তা জাগে সেগুলোও তাঁর কাছে গোপন নেই।

৩৩৬. এটি আল্লাহর অবাধ ক্ষমতারই একটি বর্ণনা। তাঁর ওপর কোন আইনের বাঁধন নেই। কোন বিশেষ আইন অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য তিনি বাধ্য নন। বরং তিনি সর্বময় ও একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী। শাস্তি দেয়ার ও মাফ করার পূর্ণ ইখতিয়ার তাঁর রয়েছে।

৩৩৭. বিস্তারিত আলোচনায় না গিয়ে এই আয়াতে ইসলামী আক্বীদা-বিশ্বাস ও কর্মপদ্ধতির সংক্ষিপ্ত সঞ্চার বর্ণনা করা হয়েছে। এই সংক্ষিপ্ত সার হচ্ছেঃ আল্লাহকে, তাঁর ফেরেশতাদেরকে ও তাঁর কিতাবসমূহকে মেনে নেয়া,তাঁর রাসূলদের মধ্যে কোন প্রকার পার্থক্য সূচিত না করে (অর্থাৎ কাউকে মেনে নেয়া আর কাউকে না মেনে নেয়া) তাঁদেরকে স্বীকার করে নেয়া এবং সবশেষে আমাদের তাঁর সামনে হাজির হতে হবে এ বিষয়টি স্বীকার করে নেয়া। এ পাঁচটি বিষয় ইসলামের বুনিয়াদী আক্বীদার অন্তর্ভূক্ত। এই আক্বীদাগুলো মেনে নেয়ার পর একজন মুসলমানের জন্য নিম্নোক্ত কর্মপদ্ধিতই সঠিক হতে পারেঃ আল্লাহর পক্ষ থেকে যে নির্দেশগুলো আসবে সেগুলোকে সে মাথা পেতে গ্রহণ করে নেবে, সেগুলোর আনুগত্য করবে এবং নিজের ভালো কাজের জন্য অহংকার করে বেড়াবেনা বরং আল্লাহর কাছে অবনত হতে ও ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবে।

৩৩৮. অর্থাৎ আল্লাহর কাছে মানুষের সামর্থ অনুযায়ী তার দায়িত্ব বিবেচিত হয়। মানুষ কোন কাজ করার ক্ষমতা রাখেনা অথচ আল্লাহ তাকে সে কাজটি না করার জন্য জিজ্ঞাসাবাদ করবেন, এমনটি কখনো হবে না। অথবা প্রকৃতপক্ষে কোন কাজ বা জিনিস থেকে দূরে থাকার সামর্থই মানুষের ছিল না, সে ক্ষেত্রে তাতে জড়িত হয়ে পড়ার জন্য

www.pathagar.com

আল্লাহর কাছে তাকে জবাবদিহি করতে হবে না। কিন্তু এ ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে, নিজের শক্তি-সামর্থ আছে কিনা, এ সম্পর্কে মানুষ নিজে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে মানুষের কিসের শক্তি-সামর্থ ছিল আর কিসের ছিল না- এ সিদ্ধান্ত একমাত্র আল্লাহ গ্রহণ করতে পারেন।

৩৩৯. এটি আল্লাহ প্রদত্ত মানবিক এখতিয়ার বিধির দ্বিতীয় মূলনীতি। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজে যে কাজ করেছে তার পুরস্কার পাবে। একজনের কাজের পুরষ্কার অন্যজন পাবে এটা কখনো সম্ভব নয়। অনুরূপভাবে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজে যে দোষ করেছে সে জন্য পাকড়াও হবে। একজন দোষ করবে আর অন্যজন পাকাড়ও হবে এটা কখনো সম্ভব নয়। তবে এটা সম্ভব, এক ব্যক্তি কোন সৎকাজের ভিত্তি রাখলো এবং দুনিয়ায় হাজার বছর পর্যন্ত তার প্রভাব প্রতিষ্ঠিত থাকলো, এ ক্ষেত্রে এগুলো সব তার আমলনামায় লেখা হবে। আবার অন্য এক ব্যক্তি কোন খারাপ কাজের ভিত্তি রাখলো এবং শত শত বছর পর্যন্ত দুনিয়ায় তার প্রভাব প্রতিষ্ঠিত থাকলো। এ অবস্থায় এ গুলোর গোনাহ ঐ প্রথম জালেমের আমলনামায় লেখা হবে। তবে এ ক্ষেত্রে ভালো বা মন্দ যা কিছু ফল হবে সবই হবে মানুষের প্রচেষ্টা ও সাধনার ফলশ্রুতি। মোটকথা যে ভালো বা মন্দ কাজে মানুষের নিজের ইচ্ছা, সংকল্প, প্রচেষ্টা ও সাধনার কোন অংশই নেই,তার শাস্তি বা পুরস্কার সে পাবে, এটা কোনক্রমেই সম্ভব নয়। কর্মফল হস্তান্তর হওয়ার মতো জিনিস নয়।

৩৪০. অর্থাৎ আমাদের পূর্ববর্তীরা তোমার পথে চলতে গিয়ে যেসব পরীক্ষা, ভয়াবহ বিপদ, দুঃখ-দুর্দশা ও সংকটের সম্মুখীন হয়, তার হাত থেকে আমাদের রক্ষা করো। যদিও আল্লাহর রীতি হচ্ছে, যে ব্যক্তি সত্য ও ন্যায়ের অনুসরণ করার সংকল্প করেছে, তাকেই তিনি কঠিন পরীক্ষা ও সংকটের সাগরে নিক্ষেপ করেছেন এবং পরীক্ষার সম্মুখীন হলে মু'মিনের কাজই হচ্ছে পূর্ণ ধৈর্য্য ও দঢ়তার সাথে তার মোকাবিলা করা, তবুও মু'মিনকে আল্লাহর কাছে এই দোয়াই করতে হবে যে, তিনি যেন তার জন্য সত্য ও ন্যায়ের পথে চলা সহজ করে দেন।

৩৪১. অর্থাৎ সমস্যা ও সংকটের এমন বোঝা আমাদের ওপর চাপাও, যা বহন করার ক্ষমতা আমাদের আছে। যে পরীক্ষায় পুরোপুরি উত্তীর্ণ হবার ক্ষমতা আমাদের আয়ত্বাধীন তেমনি পরীক্ষায় আমাদের নিক্ষেপ করো। আমাদের সহ্য ক্ষমতার বেশী দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ আমাদের ওপর চাপিয়ে দিয়ো না। তাহলে আমরা সত্য পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যাবো।

৩৪২. এই দোয়াটির পূর্ণ প্রাণসত্তা অনুধাবন করার জন্য এর নিম্নোক্ত প্রেক্ষাপটটি সামনে রাখতে হবে। হিজরতের প্রায় এক বছর আগে মি'রাজের সময় এ আয়াতটি নাযিল হয়েছিল। তখন মক্কায় ইসলাম ও কুফরের লড়াই চরম পর্যায়ে পৌছে গিয়েছিল। মুসলমানদের মাথায় বিপদ ও সংকটের পাহাড় ভেঙ্গে পড়েছিল। কেবল মক্কাতেই নয়, আরব ভূ-খন্ডের কোথাও এমন কোন জায়গা ছিল না যেখানে কোন ব্যক্তি দ্বীন ইসলাম গ্রহন করেছিল এবং তার জন্য আল্লাহর যমীনে, বেঁচে থাকা কঠিন হয়ে পড়েনি। এ

www.pathagar.com

অবস্থায় মুসলমানদের আল্লাহর কাছে এভাবে দো'য়া করার নির্দেশ দেয়া হলো। দানকারী নিজেই যখন চাওয়ার পদ্ধতি বাতলে দেন তখন তা পাওয়ার ব্যাপারে পূর্ণ নিশ্চিত হওয়া যায়। তাই এই দো'য়া সেদিন মুসলমানদের জন্য অসাধারণ মানসিক নিশ্চিন্ততার কারণ হয়।

এ ছাড়াও এই দো'য়ায় পরোক্ষভাবে মুসলমানদের নির্দেশ দেয়া হয়, নিজেদের আবেগ অনুভূতিকে কখনো অসংগত ও অনুপযোগী ধারায় প্রবাহিত করো না বরং সেগুলোকে এই দোয়ার ছাঁচে ঢালাই করো। একদিকে নিছক সত্যানুসারিতা ও সত্যের প্রতি সমর্থন দানের কারণে লোকদের ওপর যেসব হৃদয় বিদারক জুলুম নির্যাতন চালানো হচ্ছিল সেগুলো দেখুন এবং অন্যদিকে এই দো'য়াগুলো দেখুন, যাতে শত্রুদের বিরুদ্ধে সামান্য তিক্ততার নামগন্ধও নেই। একদিকে এই সত্যানুসারীরা যেসব শারীরিক দুর্ভোগ ও আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছিল সেগুলো দেখুন এবং অন্যদিকে এই দো'য়াগুলো দেখুন, যাতে পার্থিব স্বার্থের সামান্য প্রত্যাশাও নেই, একদিকে সত্যানুসারীদের চরম দূরবস্থা দেখুন এবং অন্যদিকে এই দো'য়ায় উৎসারিত উন্নত ও পবিত্র আবেগ-উদ্দীপনা দেখুন। এই তুলনামূলক বিশেশ্লষণের মাধ্যমেই সে সময় ঈমানদারদের কোন ধরনের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অনুশীলন দেয়া হচ্ছিল, তা সঠিক ও নির্ভূলভাবে অনুধাবন করা সম্ভব হবে।

www.pathagar.com

০৫ রামাদান

বিষয়ঃ আল কোরান

সূরা আল ইমরানঃ ০১-০৯

بسم الله الرحمن الرحيم

الم (1) اللَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ (2) نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ
وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ (3) مِن قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِآيَاتِ
اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ (4) إِنَّ اللَّهَ لاَ يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الأَرْضِ
وَلاَ فِي السَّمَاء (5) هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاء لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ
الْحَكِيمُ (6) هُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ
مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا
يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ
أُوْلُواْ الأَلْبَابِ (7) رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ
الْوَهَّابُ (8) رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لاَّ رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لاَ يُخْلِفُ الْمِيعَادَ (9)

১) আলিফ লাম-মীম। ২) আল্লাহ্‌ এক চিরঞ্জীব ও শাশ্বত সত্তা, যিনি বিশ্ব-জাহানের সমগ্র ব্যবস্থাপনাকে ধারণ করে আছেন, আসলে তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ্‌ নেই।[১]

৩) তিনি তোমার ওপর এই কিতাব নাযিল করেছেন, যা সত্যের বাণী বহন করে এনেছে এবং আগের কিতাবগুলোর সত্যতা প্রমাণ করছে। এর আগে তিনি মানুষের হিদায়াতের জন্য তাওরাত ও ইনজীল নাযিল করেছিলেন।[২] আর তিনি মানদন্ড নাযিল করেছেন (যা সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করে দেয়)

৪) এখন যারা আল্লাহর বিধানসমূহ মেনে নিতে অস্বীকার করবে, তারা অবশ্যই কঠিন শাস্তি পাবে। আল্লাহ্‌ অসীম ক্ষমতার অধিকারী এবং তিনি অন্যায়ের শাস্তি দিয়ে থাকেন।

৫) পৃথিবী ও আকাশের কোন কিছুই আল্লাহর কাছে গোপন নেই।[৩]

৬) তিনি মায়ের পেটে থাকা অবস্থায় যেভাবে ইচ্ছা তোমাদের আকৃতি গঠন করেন।[৪] এই প্রবল পরাক্রান্ত মহাজ্ঞানের অধিকারী সত্তা ছাড়া আর কোন ইলাহ্‌ নেই।

৭) তিনিই তোমাদের প্রতি এ কিতাব নাযিল করেছেন। এ কিতাবে দুই ধরনের আয়াত আছেঃ এক হচ্ছে, মুহকামাত, যেগুলো কিতাবের আসল বুনিয়াদ[৫] এবং দ্বিতীয় হচ্ছে,

www.pathagar.com

মুতাশাবিহাত।[৬] যাদের মনে বক্রতা আছে তারা ফিত্না সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সব সময় মুতাশাবিহাতের পিছনে লেগে থাকে এবং তার অর্থ করার চেষ্টা করে থাকে। অথচ সেগুলোর আসল অর্থ আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না। বিপরীত পক্ষে পরিপক্ক জ্ঞানের অধিকারীরা বলেঃ "আমরা এর প্রতি ঈমান এনেছি, এসব আমাদের রবের পক্ষ থেকেই এসেছে"।[৭] আর প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানবান লোকেরাই কোন বিষয় থেকে সঠিক শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে।

৮) তারা আল্লাহর কাছে দোয়া করতে থাকেঃ "হে আমাদের রব! যখন তুমি আমাদের সোজা পথে চালিয়েছো তখন আর আমাদের অন্তরকে বক্রতায় আচ্ছন্ন করে দিয়োনা, তোমার দান ভান্ডার থেকে আমাদের জন্য রহমত দান করো কেননা তুমিই আসল দাতা।

৯) হে আমাদের রব! অবশ্যই তুমি সমগ্র মানব জাতিকে একদিন একত্রে সমবেত করবে, যে দিনটির আগমনের ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। তুমি কখনো ওয়াদা থেকে বিচ্যুত হও না।"

আয়াত সমূহের ব্যাখ্যা

১. এর ব্যাখা জানার জন্য সূরা আল বাক্বারার ২৭৮ টীকা দেখুন।

২. সাধারণভাবে লোকেরা তাওরাত বলতে বাইবেলের ওলড টেস্টামেন্টের (পুরাতন নিয়ম) প্রথম দিকের পাঁচটি পুস্তক এবং ইনজীল বলতে নিউ টেস্টামেন্টের (নতুন নিয়ম) চারটি প্রসিদ্ধ ইনজীল মনে করে থাকে। তাই এ পুস্তকগুলো সত্যিই আল্লাহর কালাম কিনা, এ প্রশ্ন দেখা দেয়। আর এই সংগে এ প্রশ্নও দেখা দেয় যে, এই পুস্তকগুলোতে যেসব কথা লেখা আছে যথার্থই কুরআন সেগুলোকে সত্য বলে কিনা। কিন্তু এ ব্যাপারে প্রকৃত সত্য হচ্ছে এই যে, তাওরাত বাইবেলের প্রথম পাঁচটি পুস্তকের নাম নয় বরং এগুলোর মধ্যে তাওরাত নিহিত রয়েছে এবং ইনজীল নিউ টেস্টামেন্টের চারটি ইনজীলের নাম নয় বরং এগুলোর মধ্যে ইনজীল পাওয়া যায়।

আসলে হযরত মূসা আলাইহিস সালামের নবুওয়াত লাভের পর থেকে তাঁর ইন্তিকাল পর্যন্ত প্রায় চল্লিশ বছর ধরে তাঁর ওপর যেসব বিধান অবতীর্ণ হয়েছিল সেগুলোই তাওরাত। এর মধ্যে পাথরের তক্তার গায়ে খোদাই করে দশটি বিধান আল্লাহ তাঁকে দান করেছিলেন। অবশিষ্ট বিধানগুলো হযরত মূসা (আ) লিখিয়ে তার বারোটি অনুলিপি করে বারোটি গোত্রকে দান করেছিলেন এবং একটি কপি সংরক্ষণ করার জন্যে দান করেছিলেন বনী লাবীকে। এ কিতাবারে নাম ছিল তাওরাত। বাইতুল মাকদিস প্রথমবার ধ্বংস হওয়া পর্যন্ত এটি একটি স্বতন্ত্র কিতাব হিসেবে সংরক্ষিত ছিল। বনি লাবীকে যে কপিটি দেয়া হয়েছিল, পাথরের তক্তা সহকারে সেটি 'অংগীকারের সিন্দুকে'র মধ্যে রাখা হয়েছিল। বনী ইসরাঈল সেটিকে 'তাওরীত' নামেই জানতো। কিন্তু তার ব্যাপারে তাদের গাফলতি এমন পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল যার ফলে ইয়াহুদীয়ার বাদশাহ

www.pathagar.com

ইউসিয়ার আমলে যখন 'হাইকেলে সুলাইমানী' মেরামত করা হয়েছিল তখন ঘটনাক্রমে 'কাহেন' প্রধান (অর্থাৎ হাইকেল বা উপাসনা গৃহের গদীনশীন এবং জাতির প্রধান ধর্মীয় নেতা)। খিলকিয়াহ একস্থানে তাওরাত সুরক্ষিত অবস্থায় পেয়ে গেলেন। তিনি একটি অদ্ভুত বস্তু হিসেবে এটি বাদশাহর প্রধান সেক্রেটারীকে দিলেন। সেক্রেটারী সেটিকে এমনভাবে বাদশাহর সামনে পেশ করেন যেন ঐটি একটি বিস্ময়কর আবিষ্কার (২-রাজাবলী, অধ্যায় ২২, শ্লোক ৮-১৩ দেখুন)। এ কারণেই বখতে নসর যখন জেরুজালেম জয় করে হাইকেলসহ সঞ্চারা শহর ধ্বংস করে দিল তখন বনী ইসরাঈলরা তাওরাতের যে মূল কপিটিকে বিস্মৃতির সাগরে ডুবিয়ে দিয়েছিল এবং যার অতি অল্প সংখ্যক অনুলিপি তাদের কাছে ছিল, সেগুলো হারিয়ে ফেললো চিরকালের জন্য। তারপর আযরা (উযাইর) কাহেনের যুগে বনী ইসরাঈলদের অবশিষ্ট লোকেরা বেবিলনের কারাগঞ্চার থেকে জেরুজালেমে ফিরে এলো এবং বাইতুল মাক্বদিস পূনর্নির্মাণ করা হলো। এ সময় উযাইর নিজের জাতির আরো কয়েকজন মনীষীর সহায়তায় বনী ইসরাঈলদের পূর্ণ ইতিহাস লিখে ফেললেন। বর্তমান বাইবেলের প্রথম সতেরটি পরিচ্ছেদ এ ইতিহাস সম্বলিত।

এ ইতিহাসের চারটি অধ্যায় অর্থাৎ যাত্রা, লেবীয়, গণনা ও দ্বিতীয় বিবরণে হযরত মূসা আলাইহিস সালামের জীবনী লিপিবদ্ধ হয়েছে। আযরা ও তার সহযোগীরা তাওরাতের যতগুলো আয়াত সংগ্রহ করতে পেরেছিল এই জীবন ইতিহাসের বিভিন্ন স্থানে অবতীর্ণের সময়-কাল ও ধারাবাহিকতা অনুযায়ী ঠিক জায়গামতো সেগুলো সন্নিবেশিত হয়েছে। কাজেই এখন মূসা আলাইহিস সালামের জীবন ইতিহাসের মধ্যে সেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অংশের নামই তাওরাত। এগুলোকে চিহ্নিত করার জন্য আমরা কেবলমাত্র নিম্নোক্ত আলামতের ওপর নির্ভর করতে পারি। এ ঐতিহাসিক বর্ণনার মাঝখানে যেখানে লেখক বলেন, প্রভু মূসাকে একথা বললেন অথবা মূসা বলেন, সদাপ্রভু তোমাদের প্রভু একথা বললেন, সেখান থেকে তাওরাতের একটি অংশ শুরু হচ্ছে, তারপর আবার যেখান থেকে জীবনী প্রসংগ শুরু হয়ে গেছে সেখান থেকে ঐ অংশ খতম হয়ে গেছে ধরে নিতে হবে। মাঝখানে যেখানে যেখানে বাইবেলের লেখক ব্যাখ্যা বা টীকা আকারে কিছু অংশ বৃদ্ধি করেছে, সেগুলো চিহ্নিত করে ও বাছাই করে আসল তাওরাত থেকে আলাদা কিতাবসমূহের গভীর জ্ঞান রাখেন, তারা ঐসব অংশের কোথায় কোথায় ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ মূলক বৃদ্ধি করা হয়েছে কিছুটা নির্ভুলভাবে তা অনুধাবন করতে পারেন। এ ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অংশগুলোকেই কুরআন তাওরাত নামে আখ্যায়িত করেছে। কুরআন এগুলোকেই সত্য বলে ঘোষণা দিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এ অংশগুলোকে একত্র করে কুরআনের পাশাপাশি দাঁড় করালে কোন কোন স্থানে ছোট খাটো ও খুঁটিনাটি বিধানের মধ্যে কিছু বিরোধ দেখা গেলেও মৌলিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সামান্যতম পার্থক্যও পাওয়া যাবে না। আজও একজন সচেতন পাঠক সুস্পষ্টভাবে অনুভব করতে পারেন যে, এ দু'টি স্রোতধারা এক উৎস থেকে উৎসারিত।

www.pathagar.com

অনুরূপভাবে ইনজীল হচ্ছে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের ইলহামী ভাষণ ও বাণী সমষ্টি, যা তিনি নিজের জীবনের শেষ আড়াই তিন বছরে নবী হিসেবে প্রচার করেন। এ পবিত্র বাণীসমূহ তাঁর জীবদ্দশায় লিখিত, সংকলিত ও বিন্যস্ত হয়েছিল কিনা সে সম্পর্ক জানার কোন উপায় আমাদের কাছে নেই। হতে পারে কিছু লোক সেগুলো নোট করে নিয়েছিলেন। আবার এমনও হতে পারে, শ্রবণকারী ভক্তবৃন্দ সেগুলো কণ্ঠস্থ করে ফেলেছিলেন। যাহোক দীর্ঘকাল পরে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের জীবন বৃত্তান্ত সম্বলিত বিভিন্ন পুস্তিকা রচনা কালে তাতে ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর সাথে সাথে ঐ পুস্তিকাগুলোর রচয়িতাদের কাছে মৌখিক বাণী ও লিখিত স্মৃতিকথা আকারে হযরত ঈসাঞ্চার (আ) যেসব বাণী ও ভাষণ পৌঁছেছিল সেগুলোও বিভিন্ন স্থানে জায়গা মতো সংযোজিত হয়েছিল। বর্তমানে মথিমার্ক, লুক ও যোহন লিখিত যেসব পুস্তককে ইনজীল বলা হয় সেগুলো আসলে ইনজীল নয়। বরং ইনজীল হচ্ছে ঐ পুস্তকগুলোতে সংযোজিত হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের বাণীসমূহ। আমাদের কাছে সেগুলো চেনার ও জীবনীকারদের নিজেদের কথা থেকে সেগুলো আলাদা করার এ ছাড়া আর দ্বিতীয় কোন মাধ্যম নেই যে, যেখানে জীবনীকার বলেন, ঈসা বলেছেন অথবা মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন-কেবলমাত্র এ স্থানগুলো আসল ইনজীলের অংশ। কুরআন এ অংশগুলোর সমষ্টিকে ইনজীল নামে অভিহিত করে এবং এরই সত্যতার ঘোষণা দেয়। এ বিক্ষিপ্ত অংশগুলোকে একত্র করে আজ যে কেউ কুরআনের পাশাপাশি রেখে এর সত্যতা বিচার করতে পারেন। তিনি উভয়ের মধ্যে অতি সামান্য পার্থক্যই দেখতে পাবেন। আর যে সামান্য পার্থক্য অনুভূত হবে পক্ষপাতহীন চিন্তা-ভাবনা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে তা সহজেই দূর করা যাবে।

৩. অর্থাৎ তিনি বিশ্ব-জাহানের যাবতীয় তত্ত্ব ও বাস্তব সত্য জানেন। কাজেই যে কিতাব তিনি নাযিল করেছেন তা পরিপূর্ণ সত্যই হওয়া উচিত। বরং নির্ভেজাল সত্য একমাত্র সেই কিতাবের মধ্যেই পাওয়া যেতে পারে যেটি সেই সর্বজ্ঞ ও মহাজ্ঞানী সত্তার পক্ষ থেকে পাঠানো হয়েছে।

৫. মুহকাম পাকাপোক্ত জিনিসকে বলা হয়। এর বহুবচন 'মুহকামাত'। 'মুহকামাত আয়াত' বলতে এমন সব আয়াত বুঝায় যেগুলোর ভাষা একেবারেই সুস্পষ্ট, যেগুলোর অর্থ নির্ধারণ করার ব্যাপারে কোন প্রকার সংশয়-সন্দেহের অবকাশ থাকে না, যে শব্দগুলো দ্ব্যর্থহীন বক্তব্য উপস্থাপন করে এবং যেগুলোর অর্থ বিকৃত করার সুযোগ লাভ করা বড়ই কঠিন। এ আয়াতগুলো 'কিতাবের আসল বুনিয়াদ'। অর্থাৎ যে উদ্দেশ্যে কুরআন নাযিল করা হয়েছে এ আয়াতগুলো সেই উদ্দেশ্য পূর্ণ করে। এ আয়াতগুলোর মাধ্যমে দুনিয়াবাসীকে ইসলামের দিকে আহবান জানানো হয়েছে। এগুলোতেই শিক্ষা ও উপদেশের কথা বর্ণিত হয়েছে। স্রষ্টতার গলদ তুলে ধরে সত্য-সঠিক পথের চেহারা সুস্পষ্ট করা হয়েছে। দ্বীনের মূলনীতি এবং আক্বীদা-বিশ্বাস, ইবাদাত, চরিত্রনীতি,দায়িত্ব-কর্তব্য ও আদেশ-নিষেধের বিধান এ আয়াতগুলোতেই বর্ণিত

www.pathagar.com

হয়েছে। কাজেই কোন সত্যানুসন্ধানী ব্যক্তি কোন্ পথে চলবে এবং কোন্ পথে চলবেনা, একথা জানার জন্য যখন কুরআনের স্মরণাপন্ন হয় তখন এ 'মুহকাম' আয়াতগুলোই তার পথ প্রদর্শন করে। স্বাভাবিক ভাবে এগুলোর প্রতি তার দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় এবং এগুলো থেকে উপকৃত হবার জন্য সে প্রচেষ্টা চালাতে থাকে।

৬. 'মুতাশাবিহাত' অর্থ যেসব আয়াতের অর্থ গ্রহণে সন্দেহ-সংশয়ের ও বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে দেবার অবকাশ রয়েছে।

বিশ্ব-জাহানের অন্তর্নিহিত সত্য ও তাৎপর্য, তার সূচনা ও পরিণতি, সেখানে মানুষের অবস্থান, মর্যাদা ও ভূমিকা এবং এ ধরনের আরো বিভিন্ন মৌলিক বিষয় সম্পর্কিত সর্বনিম্ন অপরিহার্য তথ্যাবলী মানুষকে সরবরাহ না করা পর্যন্ত মানুষের জীবন পথে চলার জন্য কোন পথনির্দেশ দেয়া যেতে পারেনা, এটি একটি সর্বজন বিদিত সত্য। আবার একথাও সত্য, মানবিক ইন্দ্রিয়ানুভূতির বাইরের বস্তু-বিষয়গুলো, যেগুলো মানবিক জ্ঞানের আওতায় কখনো আসেনি এবং আসতেও পারে না, যেগুলোকে সে কখনো দেখেনি, স্পর্শ করেনি এবং যেগুলোর শব্দও গ্রহণ করেনি, সেগুলো বুঝাবার জন্য মানুষের ভাষার ভান্ডারে কোন শব্দও রচিত হয়নি এবং প্রত্যেক শ্রোতার মনে তাদের নির্ভুল ছবি অংকিত করার মতো কোন পরিচিত বর্ণনা পদ্ধতিও পাওয়া যায় না। কাজেই এ ধরনের বিষয় বুঝাবার জন্য এমন সব শব্দ ও বর্ণনা পদ্ধতি অবলম্বন করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে, যেগুলো প্রকৃত সত্যের সাথে নিকটতর সাদৃশ্যের অধিকারী অনুভবযোগ্য জিনিসগুলো বুঝাবার জন্য মানুষের ভাষায় পাওয়া যায়। এ জন্য অতি প্রাকৃতিক তথা মানবিক জ্ঞানের উর্ধের ও ইন্দ্রিয়াতীত বিষয়গুলো বুঝাবার জন্য কুরআন মাজীদে এ ধরনের শব্দ ও ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। যেসব আয়াতে এ ধরনের ভাষা ও শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলোকেই 'মুতাশাবিহাত' বলা হয়।

কিন্তু এ ভাষা ব্যবহারের ফলে মানুষ বড়জোর সত্যের কাছাকাছি পৌঁছতে পারে অথবা সত্যের অস্পষ্ট ধারণা তার মধ্যে সৃষ্টি হতে পারে, এর বেশী নয়। এ ধরনের আয়াতের অর্থ নির্ণয়ের ও নির্দিষ্ট করনের জন্য যত বেশী চেষ্টা করা হবে তত বেশী সংশয়-সন্দেহ ও সম্ভাবনা বাড়তে থাকবে। ফলে মানুষ প্রকৃত সত্যের নিকটতর হবার চাইতে বরং তার থেকে আরো দূরে সরে যাবে। কাজেই যারা সত্য সন্ধানী এবং আজেবাজে অর্থহীন বিষয়ের চর্চা করার মানসিকতা যাদের নেই, তারা 'মুতাশাবিহাত' থেকে প্রকৃত সত্য সম্পর্কে অস্পষ্ট ধারণা লাভ করেই সন্তুষ্ট থাকে। এতটুকুন ধারণাই তাদের কাজ চালাবার জন্য যথেষ্ট হয়। তারপর তারা 'মুহকামাত' এর পেছনে নিজেদের সর্বশক্তি নিয়োগ করে। কিন্তু যারা ফিত্নাবাজ অথবা বাজে কাজে সময় নষ্ট করতে অভ্যস্থ, তাদের কাজই হয় মুতাশাবিহাতের আলোচনায় মশগুল থাকা এবং তার সাহায্যেই তারা পেছন দিয়ে সিঁদ কাটে।

৭. এখানে এ অমূলক সন্দেহ করার কোন প্রশ্নই ওঠে না যে, মুতাশাবিহাতের সঠিক অর্থ যখন তারা জানে না তখন তারা তার ওপর কেমন করে ঈমান আনে? আসলে একজন

www.pathagar.com

সচেতন বিবেক-বুদ্ধির অধিকারী ব্যক্তির মনে মুতাশাবিহাত আয়াতগুলোর দূরবর্তী অসংগত বিশ্লেষণ ও অস্পষ্ট বিকৃত ব্যাখার মাধ্যমে কুরআন আল্লাহর কিতাব হবার বিশ্বাস জন্মে না। এ বিশ্বাস জন্মে মুহকামাত আয়াতগুলো অধ্যয়নের মাধ্যমে। মুহকামাত আয়াতগুলোর মধ্যে চিন্তা-গবেষণা করার পর যখন তার মনে কুরআন আল্লাহর কিতাব হবার ব্যাপারে পরিপূর্ণ নিশ্চিন্ততা আসে তখন মুতাশাবিহাত তার মনে কোন প্রকার দ্বন্দ্ব ও সংশয় সৃষ্টিতে সক্ষম হয় না। তাদের যতটুকু সরল অর্থ সে অনুধাবন করতে সক্ষম হয় ততটুকুই গ্রহণ করে নেয় আর যেখানে অর্থের জটিলতা দেখা দেয় সেখানে দূরবীণ লাগিয়ে অর্থের গভীরে প্রবেশ করার নামে উল্টা সিধা অর্থ করার পরিবর্তে সে আল্লাহর কালামের ওপর সামগ্রিকভাবে ঈমান এনে কাজের কথাগুলোর দিকে নিজে দৃষ্টি ফিরিয়ে দেয়।

৮) তারা আল্লাহর কাছে দোয়া করতে থাকে: "হে আমাদের রব! যখন তুমি আমাদের সোজা পথে চালিয়েছো তখন আর আমাদের অন্তরকে বক্রতায় আচ্ছন্ন করে দিয়ো না, তোমার দান ভান্ডার থেকে আমাদের জন্য রহমত দান করো কেননা তুমিই আসল দাতা।

www.pathagar.com

০৬ রামাদান
বিষয়: সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহর
সূরা আল ইমরান: ২৬-২৮

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاء وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاء وَتُعِزُّ مَن تَشَاء وَتُذِلُّ مَن تَشَاء بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (26) تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاء بِغَيْرِ حِسَابٍ (27) لاَّ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّهِ فِي شَيْءٍ إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللّهِ الْمَصِيرُ (28) قُلْ إِن تُخْفُواْ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ(28

২৬) বলুন, হে আল্লাহ! বিশ্ব-জাহানের মালিক! তুমি যাকে চাও রাষ্ট্রক্ষমতা দান করো এবং যার থেকে চাও রাষ্ট্রক্ষমতা ছিনিয়ে নাও। যাকে চাও মর্যাদা ও ইজ্জত দান করো এবং যাকে চাও লাঞ্ছিত ও হেয় করো। কল্যাণ তোমার হাতেই নিহিত। নি:সন্দেহে তুমি সবকিছুর ওপর শক্তিশালী।

২৭) তুমি রাতকে দিনের মধ্যে প্রবেশ করাও এবং দিনকে রাতের মধ্যে। জীবনহীন থেকে জীবন্তের আবির্ভাব ঘটাও এবং জীবন্ত থেকে জীবনহীনের। আর যাকে চাও তাকে তুমি অগণিত রিযিক দান করো।[২৪]

২৮) মু'মিনরা যেন ঈমানদারদের বাদ দিয়ে কখনো কাফেরদেরকে নিজেদের পৃষ্ঠপোষক, বন্ধু ও সহযোগী হিসেবে গ্রহণ না করে। যে এমনটি করবে, আল্লাহর সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। তবে হ্যাঁ, তাদের জুলুম থেকে আত্মরক্ষার জন্য তোমরা যদি বাহ্যত এ নীতি অবলম্বন করো তাহলে তা মাফ করে দেয়া হবে।[২৫] কিন্তু আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর নিজের সত্তার ভয় দেখাচ্ছেন আর তোমাদের তাঁরই দিকে ফিরে যেতে হবে।[২৬]

আয়াত সমূহের ব্যাখ্যা

২৪. মানুষ যখন একদিকে কাফের ও নাফরমানদের কার্যলাপ দেখে এবং তারপর দেখে কিভাবে দিনের পর দিন তাদের বিত্ত ও প্রাচুর্য বেড়ে যাচ্ছে, আবার অন্যদিকে দেখে ঈমানদারদের আনুগত্যের পসরা এবং তারপর তাদের দারিদ্র, অভাব অনাহারে জর্জরিত জীবন, আর দেখে তাদের একের পর এক বিপদ মুসিবত ও দু:খ দুর্দশার শিকার হতে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার সাহাবীগণ তৃতীয় হিজরী ও তার কাছাকাছি

www.pathagar.com

সময়ে যার শিকার হয়েছিলেন, তখন স্বাভাবিক ভাবেই তার মনের মধ্যে একটি অদ্ভুত আক্ষেপ মিশ্রিত জিজ্ঞাসা জেগে উঠে। আল্লাহ এখানে এই জিজ্ঞাসার জবাব দিয়েছেন। এমন সূক্ষ্মভাব দিয়েছেন, যার চেয়ে বেশী সুক্ষ্মতার কথা কল্পনাই করা যায় না।

২৫. অর্থাৎ যদি কোন মু'মিন ইসলামের কোন দুশমন দলের ফাঁদে আটকা পড়ে যায় এবং সে তাদের জুলুম-নির্যাতন চালাবার আশংকা করে, তাহলে এ অবস্থায় তাকে অনুমতি দেয়া হয়েছে, সে নিজের ঈমান লুকিয়ে রেখে কাফেরদের সাথে বাহ্যত এমনভাবে অবস্থান করতে পারে যেন সে তাদেরই একজন। অথবা যদি তার মুসলমান হবার কথা প্রকাশ হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্য সে কাফেরদের প্রতি বন্ধুত্বের মনোভাব প্রকাশ করতে পারে। এমনকি কঠিন ভয়ভীতি ও আশংকাপূর্ণ অবস্থায় যে ব্যক্তি সহ্য ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে,তাকে কুফরীর বাক্য পর্যন্ত মুখে উচ্চারণ করার অনুমতিটুকু দেয়া হয়েছে।

২৬. অর্থাৎ মানুষের ভয় যেন তোমাকে এমনভাবে আচ্ছন্ন না করে ফেলে যার ফলে আল্লাহর ভয় মন থেকে উবে যায়। মানুষ বড়জোর তোমার পার্থিব ও বৈষয়িক স্বার্থের ক্ষতি করতে পারে, যার পরিসর দুনিয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু আল্লাহ তোমাকে চিরন্তন আযাবের মধ্যে নিক্ষেপ করতে পারেন। কাজেই নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্য যদি কখনো বাধ্য হয়ে কাফেরদের সাথে আত্মরক্ষামূলক বন্ধুত্বের নীতি অবলম্বন করতে হয়,তাহলে তার পরিসর কেবলমাত্র ইসলামের মিশন, ইসলামী জামায়াতের স্বার্থ ও কোন মুসলমানের ধন-প্রাণের ক্ষতি না করেই নিজের জানমালের হেফাজত করে নেয়া পর্যন্তই সীমিত হতে পারে। কিন্তু সাবধান, তোমার মাধ্যমে যেন কুফর ও কাফেরদের এমন কোন খেদমত না হয় যার ফলে ইসলামের মোকাবিলায় কুফরী বিস্তার লাভ করে এবং মুসলমানদের ওপর কাফেরদের বিজয় লাভ ও আধিপত্য ও বিস্তারের পথ প্রশস্ত হবার সম্ভাবনা দেখা দেয়। অবশ্যই একথা ভালোভাবে জেনে রাখতে হবে, নিজেকে বাঁচাতে গিয়ে যদি তোমরা আল্লাহর দ্বীনকে অথবা মু'মিনদের জামায়াতকে বা কোন মুসলিম ব্যক্তিকে কোনভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করে থাকো অথবা আল্লাহ দ্রোহীদের কোন যথার্থ খেদমত করে থাকো, তাহলে আল্লাহর পাকড়াও থেকে তোমরা কোন ক্রমেই রক্ষা পেতে পারবে না। তোমাদের তো অবশেষে তার কাছে যেতেই হবে।

www.pathagar.com

০৭ রামাদান
বিষয়: মুমিনের গুণাবলী
সূরা আল মুমিনুন: ০১-১১

بسم الله الرحمن الرحيم

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (1) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (2) وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ (3) وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ (4) وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (7) وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ (8) وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ (9) أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ (10) الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (11)

১) নিশ্চিতভাবে সফলকাম হয়েছে মু'মিনরা [১] ২) যারা নিজেদের [২] নামাযে বিনয়াবনত [৩] হয়, ৩) বাজে কথা ও কাজ থেকে দূরে থাকে, [৪] ৪) যাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে সক্রিয় থাকে, [৫] ৫) নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে, [৬] ৬) নিজেদের স্ত্রীদের ও অধিকারভুক্ত বাঁদীদের ছাড়া, এদের কাছে (হেফাজত না করলে) তারা তিরস্কৃত হবে না, ৭) তবে যারা এর বাইরে আরো কিছু চাইবে তারাই হবে সীমালংঘনকারী, [৭] ৮) নিজেদের আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে [৮] ৯) এবং নিজেদের নামাযগুলো রক্ষণাবেক্ষণ করে, [৯] ১০) তারাই এমন ধরনের উত্তরাধিকারী যারা নিজেদের উত্তরাধিকার হিসেবে ফিরদাউস, [১০] লাভ করবে ১১) এবং সেখানে তারা থাকবে চিরকাল।

আয়াত সমূহের ব্যাখ্যা

১. মু'মিনরা বলতে এমন লোকদেরকে বুঝানো হয়েছে যারা মুহাম্মাদসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াত গ্রহণ করেছেন, তাঁকে নিজেদের নেতা ও পথপ্রদর্শক বলে মেনে নিয়েছেন এবং তিনি জীবন যাপনের যে পদ্ধতি পেশ করেছেন তা অনুসরণ করে চলতে রাজি হয়েছেন।

মূল শব্দ হচ্ছে 'ফালাহ'। ফালাহ মানে সাফল্য ও সমৃদ্ধি। এটি ক্ষতি, ঘাটতি, লোকসান ও ব্যর্থতার বিপরীত অর্থবোধক শব্দ। যেমন-أفلح الرجل - মানে হচ্ছে, অমুক ব্যক্তি সফল হয়েছে, নিজেদের লক্ষ্যে পৌঁছে গেছে, প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ ও সমৃদ্ধশালী হয়ে গেছে, তার প্রচেষ্টা ফলবতী হয়েছে, তার অবস্থা ভালো হয়ে গেছে।

قَدْ أَفْلَحَ "নিশ্চিতভাবেই সফলতা লাভ করেছে"। এ শব্দগুলো দিয়ে বাক্য শুরু করার তাৎপর্য বুঝতে হলে যে পরিবেশে এ ভাষণ দেয়া হচ্ছিল তা চোখের সামনে রাখা

www.pathagar.com

অপরিহার্য। তখন একদিকে ছিল ইসলামী দাওয়াত বিরোধী সরদারবৃন্দ। তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য উন্নতির পর্যায়ে ছিল। তাদের কাছে ছিল প্রচুর ধন-দৌলত। বৈষয়িক সমৃদ্ধির যাবতীয় উপাদান তাদের হাতের মুঠোয় ছিল। আর অন্যদিকে ছিল ইসলামী দাওয়াতের অনুসঞ্চারীরা। তাদের অধিকাংশ তো আগে থেকেই ছিল গরীব ও দুর্দশাগ্রস্ত। কয়েকজনের অবস্থা সচ্ছল থাকলেও অথবা কাজ- কারবারের ক্ষেত্রে তারা আগে থেকেই সফলকাম থাকলেও সর্বব্যাপী বিরোধীতার কারণে তাদের অবস্থাও এখন খারাপ হয়ে গিয়েছিলো। এ অবস্থায় যখন "নিশ্চিতভাবেই মু'মিনরা সফলকাম হয়েছে" বাক্যাংশ দিয়ে বক্তব্য শুরু করা হয়েছে তখন এ থেকে আপনা আপনি এ অর্থ বের হয়ে এসেছে যে, তোমাদের সাফল্য ও ক্ষতির মানদন্ড ভুল, তোমাদের অনুমান ত্রুটিপূর্ণ, তোমাদের দৃষ্টি সুদূর প্রসঞ্চারী নয়, তোমাদের নিজেদের যে সাময়িক ও সীমিত সমৃদ্ধিকে সাফল্য মনে করছো তা আসল সাফল্য নয়, তা হচ্ছে ক্ষতি এবং মুহাম্মাদসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যে অনুসারীদেরকে তোমরা ব্যর্থ ও অসফল মনে করছো তারাই আসলে সফলকাম ও সার্থক। এ সত্যের দাওয়াত গ্রহণ করে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি বরং তারা এমন জিনিস লাভ করেছে যা তাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জায়গায় স্থায়ী সমৃদ্ধি দান করবে। আর ওকে প্রত্যাখ্যান করে তোমরা আসলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এর খারাপ পরিণতি তোমরা এখানেও দেখবে এবং দুনিয়ার জীবনকাল শেষ করে পরবর্তী জীবনেও দেখতে থাকবে।

এ হচ্ছে এ সূরার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু। এ সূরার সমগ্র ভাষণ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এ বক্তব্যটিকে মনের মধ্যে বদ্ধমূল করে দেবার জন্য উপস্থাপন করা হয়েছে।

২. এখান থেকে নিয়ে ৯ আয়াত পর্যন্ত মু'মিনদের যে গুণাবলীর কথা বলা হয়েছে তা আসলে মু'মিনরা সফলকাম হয়েছে এ বক্তব্যের সপক্ষে যুক্তিস্বরূপ। অন্য কথায়, বলা হচ্ছে, যেসব লোক এ ধরনের গুণাবলীর অধিকারী তারা কেনইবা সফল হবেনা। এ গুণাবলী সম্পন্ন লোকেরা ব্যর্থ ও অসফল কেমন করে হতে পারে। তারাই যদি সফলকাম না হয় তাহলে আর কারা সফলকাম হবে।

৩. মূল শব্দ হচ্ছে "খুশূ"। এর আসল মানে হচ্ছে করোর সামনে ঝুঁকে পড়া, দমিত বা বশীভূত হওয়া , বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ করা। এ অবস্থাটার সম্পর্ক মনের সাথে এবং দেহের বাহ্যিক অবস্থার সাথেও। মনের খূশূ' হচ্ছে, মানুষ কারোর ভীতি, শ্রেষ্ঠত্ব, প্রতাপ ও পরাক্রমের দরুণ সন্ত্রস্ত ও আড়ষ্ট থাকবে। আর দেহের খুশূ' হচ্ছে, যখন সে তার সামনে যাবে তখন মাথা নত হয়ে যাবে, অংগ-প্রত্যঙ্গ ঢিলে হয়ে যাবে, দৃষ্টি নত হবে, কণ্ঠস্বর নিম্নগামী হবে এবং কোন জবরদস্ত প্রতাপশালী ব্যক্তির সামনে উপস্থিত হলে মানুষের মধ্যে যে স্বাভাবিক ভীতির সঞ্চার হয় তার যাবতীয় চিহ্ন তার মধ্যে ফুটে উঠবে। নামাযে খুশূ' বলতে মন ও শরীরের এ অবস্থাটা বুঝায় এবং এটাই নামাযের আসল প্রাণ। হাদীসে বলা হয়েছে, একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক ব্যক্তিকে নামায পড়তে দেখলেন এবং সাথে সাথে এও দেখলেন যে, সে নিজের দাড়ি

www.pathagar.com

নিয়ে খেলা করছে। এ অবস্থা দেখে তিনি বললেন, لو خشع قلبه خشعت جوارحه "যদি তার মনে খুশূ' থাকতো তাহলে তার দেহেও খুশূ'র সঞ্চার হতো"।

যদিও খুশূ'র সম্পর্ক মূলত মনের সাথে এবং মনের খুশূ' আপনা আপনি দেহে সঞ্চারিত হয়, যেমন ওপরে উল্লিখিত হাদিস থেকে এখনই জানা গেলো, তবুও শরীয়াতে নামাযের এমন কিছু নিয়ম-কানুন নির্ধারিত করে দেয়া হয়েছে যা একদিকে মনের খুশূ' (আন্তরিক বিনয়-নম্রতা) সৃষ্টিতে সাহায্য করে এবং অন্যদিকে খুশূ'র হ্রাস-বৃদ্ধির অবস্থায় নামাযের কর্মকান্ডকে কমপক্ষে বাহ্যিক দিক দিয়ে একটি বিশেষ মানদন্ডে প্রতিষ্ঠিত রাখে। এই নিয়ম-কানুনগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে, নামাযী যেন ডানে বামে না ফিরে এবং মাথা উঠিয়ে ওপরের দিকে না তাকায়, (বড়জোর শুধুমাত্র চোখের কিনারা দিয়ে এদিক ওদিক তাকাতে পারে। হানাফী ও শাফেয়ীদের মতে দৃষ্টি সিজদার স্থান অতিক্রম না করা উচিত। কিন্তু মালেকীগণ মনে করেন দৃষ্টি সামনের দিকে থাকা উচিত।) নামাযের মধ্যে নড়াচড়া করা এবং বিভিন্ন দিকে ঝুঁকে পড়া নিষিদ্ধ। বারবার কাপড় গুটানো অথবা ঝাড়া কিংবা কাপড় নিয়ে খেলা করা জায়েয নয়। সিজদায় যাওয়ার সময় বসার জায়গা বা সিজদা করার জায়গা পরিষ্কার করার চেষ্টা করতেও নিষেধ করা হয়েছে। গর্বিত ভংগীতে খাড়া হওয়া, জোরে জোরে ধমকের সুরে কুরআন পড়া অথবা কুরআন পড়ার মধ্যে গান গাওয়া ও নামাযের নিয়ম বিরোধী। জোরে জোরে আড়মোড়া ভাংগা ও ঢেকুর তোলাও নামাযের মধ্যে বেআদবী হিসেবে গণ্য। তাড়াহুড়া করে টপাটপ নামায পড়ে নেয়াও ভীষণ অপছন্দনীয়। নির্দেশ হচ্ছে, নামাযের প্রত্যেকটি কাজ পুরোপুরি ধীরস্থিরভাবে প্রশান্ত চিত্তে সম্পন্ন করতে হবে। এক একটি কাজ যেমন রুকূ', সিজদা, দাঁড়ানো বা বসা যতক্ষণ পুরোপুরি শেষ না হয় ততক্ষণ অন্য কাজ শুরু করা যাবে না। নামায পড়া অবস্থায় যদি কোন জিনিস কষ্ট দিতে থাকে তাহলে এক হাত দিয়ে তা দূর করে দেয়া যেতে পারে। কিন্তু বারবার হাত নাড়া অথবা উভয় হাত একসাথে ব্যবহার করা নিষিদ্ধ।

এ বাহ্যিক আদবের সাথে সাথে নামাযের মধ্যে জেনে বুঝে নামাযের সাথে অসংশ্লিষ্ট ও অবান্তর কথা চিন্তা করা থেকে দূরে থাকার বিষয়টিও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অনিচ্ছাকৃত চিন্তা-ভাবনা মনের মধ্যে আসা ও আসতে থাকা মানুষ মাত্রেরই একটি স্বভাবগত দূর্বলতা। কিন্তু মানুষের পূর্ণ প্রচেষ্টা থাকতে হবে নামাযের সময় তার মন যেন আল্লাহর প্রতি আকৃষ্ট থাকে এবং মুখে সে যা কিছু উচ্চারণ করে মনও যেন তারই আর্জি পেশ করে। এ সময়ের মধ্যে যদি অনিচ্ছাকৃত ভাবে অন্য চিন্তাভাবনা এসে যায় তাহলে যখনই মানুষের মধ্যে এর অনুভূতি সজাগ হবে তখনই তার মনোযোগ সেদিক থেকে সরিয়ে নিয়ে পুনরায় নামাযের সাথে সংযুক্ত করতে হবে।

৪. لغو এর মানে এমন প্রত্যেকটি কথা ও কাজ যা অপ্রয়োজনীয়, অর্থহীন ও যাতে কোন ফল লাভও হয় না। যেসব কথায় বা কাজে কোন লাভ হয় না, যেগুলোর পরিণাম

www.pathagar.com

কল্যাণকর নয়, যেগুলোর আসলে কোন প্রয়োজন নেই, যেগুলোর উদ্দেশ্যও ভালো নয়- সেগুলোর সবই 'বাজে' কাজের অন্তর্ভূক্ত।

مُعْرِضُوْنَ অনুবাদ করেছি 'দূরে থাকে'। কিন্তু এতটুকুতে সম্পূর্ণ কথা প্রকাশ হয় না। আয়াতের পূর্ণ বক্তব্য হচ্ছে এই যে, তারা বাজে কথায় কান দেয় না এবং বাজে কাজের দিকে দৃষ্টি ফেরায় না। সে ব্যাপারে কোন প্রকার কৌতূহল প্রকাশ করে না। যেখানে এ ধরনের কথাবার্তা হতে থাকে অথবা এ ধরণের কাজ চলতে থাকে সেখানে যাওয়া থেকে দূরে থাকে। তাতে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত থাকে আর যদি কোথাও তার সাথে মুখোমুখি হয়ে যায় তাহলে তাকে উপেক্ষা করে এড়িয়ে চলে যায় অথবা অন্ততপক্ষে তা থেকে সম্পর্কহীন হয়ে যায়। এ কথাটিকেই অন্য জায়গায় এভাবে বলা হয়েছে:

" وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا "

"যখন এমন কোন জায়গা দিয়ে তারা চলে যেখানে বাজে কথা হতে থাকে অথবা বাজে কাজের মহড়া চলে তখন তারা ভদ্রভাবে সে জায়গা অতিক্রম করে চলে যায়"। (আল ফুরকান, ৭২ আয়াত)

এ ছোট্ট সংক্ষিপ্ত বাক্যটিতে যে কথা বলা হয়েছে তা আসলে মু'মিনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গুণাবলীর অন্তর্ভুক্ত। মু'মিন এমন এক ব্যক্তি যার মধ্যে সবসময়ে দায়িত্বানুভূতি সজাগ থাকে। সে মনে করে দুনিয়াটা আসলে একটা পরীক্ষাগৃহ। যে জিনিসটিকে জীবন, বয়স, সময় ইত্যাদি বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে সেটি আসলে একটি মাপাজোকা মেয়াদ। তাকে পরীক্ষা করার জন্য এ সময়-কালটি দেয়া হয়েছে। যে ছাত্রটি পরীক্ষার হলে বসে নিজের প্রশ্নপত্রের জবাব লিখে চলছে সে যেমন নিজের কাজকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করে পূর্ণ ব্যস্ততা সহকারে তার মধ্যে নিজেকে নিমগ্ন করে দেয়। সেই ছাত্রটি যেমন অনুভব করে পরীক্ষার এ ঘন্টা ক'টি তার আগামী জীবনের চূড়ান্তভাগ্য নির্ধারণকারী এবং এ অনুভূতির কারণে সে এ ঘন্টাগুলোর প্রতিটি মুহূর্তে নিজের প্রশ্নপত্রের সঠিক জবাব লেখার প্রচেষ্টায় ব্যয় করতে চায় এবং এগুলোর একটি সেকেন্ড ও বাজে কাজে নষ্ট করতে চায় না, ঠিক তেমনি মু'মিনও দুনিয়ার এ জীবনকালকে এমন সব কাজে ব্যয় করে যা পরিণামের দিক দিয়ে কল্যাণকর। এমনকি সে খেলাধূলা ও আনন্দ উপভোগের ক্ষেত্রেও এমন সব জিনিস নির্বাচন করে যা নিছক সময় ক্ষেপণের কারণ হয়না বরং কোন অপেক্ষাকৃত ভালো উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্য তাকে তৈরী করে। তার দৃষ্টিতে সময় 'ক্ষেপণ' করার জিনিস হয় না বরং ব্যবহার করার জিনিস হয়। অন্য কথায়, সময় কাটানোর জিনিস নয়- কাজে 'খাটানোর' জিনিস।

এ ছাড়াও মু'মিন হয় একজন শান্ত-সমাহিত ভারসাম্যপূর্ণ প্রকৃতির অধিকারী এবং পবিত্র-পরিচ্ছন্ন স্বভাব ও সুস্থ রুচিসম্পন্ন মানুষ। বেহুদাপনা তার মেজাজের সাথে কোন রকমেই খাপ খায় না। সে ফলদায়ক কথা বলতে পারে, কিন্তু আজেবাজে গল্প মারা তার স্বভাব বিরুদ্ধ। সে ব্যঙ্গ, কৌতুক, ও হালকা পরিহাস পর্যন্ত করতে পারে কিন্তু উচ্ছল

www.pathagar.com

ঠাট্টা-তামাসায় মেতে উঠতে পারে না, বাজে ঠাট্টা-মস্করা ও ভাঁড়ামি বরদাশত করতে পারে না এবং আনন্দ-ফূর্তি ও ভাঁড়ামির কথাবার্তাকে নিজের পেশায় পরিণত করতে পারে না। তার জন্য তো এমন ধরণের সমাজ হয় একটি স্থায়ী নির্যাতন কক্ষ বিশেষ, যেখানে কারো কান কখনো গালি-গালাজ, পরনিন্দা, পরচর্চা, অপবাদ, মিথ্যা কথা, কুরুচিপূর্ণ গান-বাজনা ও অশ্লীল কথাবার্তা থেকে নিরাপদ থাকে না। আল্লাহ তাকে জান্নাতের আশা দিয়ে থাকেন। এটা তাঁর একটি অন্যতম নিয়ামত। তিনি এটাই বর্ণনা করেছেন যে, - لَا تَسْمَعُ فِيْهَا لَاغِيَةً - "সেখানে তুমি কোন বাজে কথা শুনবে না"।

৫. "যাকাত দেয়া" ও "যাকাতের পথে সক্রিয় থাকার" মধ্যে অর্থের দিক দিয়ে বিরাট ফারাক আছে। একে উপেক্ষা করে উভয়কে একই অর্থবোধক মনে করা ঠিক নয়। এটা নিশ্চয়ই গভীর তাৎপর্যবহ যে, এখানে মু'মিনদের গুণাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে - يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ - এর সর্বজন পরিচিত বর্ণনাভংগী পরিহার করে - وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فَاعِلُوْنَ - এর অপ্রচলিত বর্ণনা পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। আরবী ভাষায় যাকাত শব্দের দু'টি অর্থ হয়। একটি হচ্ছে "পবিত্রতা-পরিচ্ছন্নতা তথা পরিশুদ্ধি" এবং দ্বিতীয়টি "বিকাশ সাধন"- কোন জিনিসের উন্নতি সাধনে যেসব জিনিস প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় সেগুলো দূর করা এবং তার মৌলিক উপাদান ও প্রাণবস্তুকে বিকশিত ও সমৃদ্ধ করা। এ দু'টি অর্থ মিলে যাকাতের পূর্ণ ধারণাটি সৃষ্টি হয়। তারপর এ শব্দটি ইসলামী পরিভাষায় পরিণত হলে এর দু'টি অর্থ প্রকাশ হয়। এক, এমন ধন-সম্পদ যা পরিশুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে বের করা হয়। দুই, পরিশুদ্ধ করার মূল কাজটি। যদি -يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ - বলা হয় তাহলে এর অর্থ হবে, তারা পরিশুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে নিজেদের সম্পদের একটি অংশ দেয় বা আদায় করে। এভাবে শুধুমাত্র সম্পদ দেবার মধ্যেই ব্যাপারটি সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। কিন্তু যদি -لِلزَّكٰوةِ فَاعِلُوْنَ - বলা হয় তাহলে এর অর্থ হবে, তারা পরিশুদ্ধ করার কাজ করে এবং এ অবস্থায় ব্যাপারটি শুধুমাত্র আর্থিক যাকাত আদায় করার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না বরং আত্মার পরিশুদ্ধি চরিত্রের পরিশুদ্ধি, জীবনের পরিশুদ্ধি, অর্থের পরিশুদ্ধি ইত্যাদি প্রত্যেকটি দিকের পরিশুদ্ধি পর্যন্ত এর ব্যাপ্তি ছড়িয়ে পড়বে। আর এছাড়াও এর অর্থ কেবলমাত্র নিজের জীবনের পরিশুদ্ধি পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকবে না বরং নিজের চারপাশের জীবনের পরিশুদ্ধি পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়বে। কাজেই অন্য কথায় এ আয়াতের অনুবাদ হবে "তারা পরিশুদ্ধির কার্য সম্পাদনকারী লোক"। অর্থাৎ তারা নিজেদেরকেও পরিশুদ্ধ করে এবং অন্যদেরকেও পরিশুদ্ধ করার দায়িত্ব পালন করে। তারা নিজেদের মধ্যে মৌলিক মানবিক উপাদানের বিকাশ সাধন করে এবং বাইরের জীবনেও তার উন্নতির প্রচেষ্টা চালাতে থাকে। এ বিষয় বস্তুটি কুরআন মজীদের অন্যান্য স্থানেও বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন সূরা আ'লায় বলা হয়েছেঃ

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى (14) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى (15)

www.pathagar.com

"সফলকাম হয়েছে সে ব্যক্তি যে পবিত্রতা অবলম্বন করেছে এবং নিজের রবের নাম স্মরণ করে নামায পড়েছে"।

সূরা শামসে বলা হয়েছেঃ

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا (9) وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا (10)

"সফলকাম হলো সে ব্যক্তি যে আত্মশুদ্ধি করেছে এবং ব্যর্থ হলো সে ব্যক্তি যে তাকে দলিত করেছে"।

কিন্তু এ দু'টির তুলনায় সংশ্লিষ্ট আয়াতটি ব্যাপক অর্থের অধিকারী। কারণ এ দু'টি আয়াত শুধুমাত্র আত্মশুদ্ধির ওপর জোর দেয় এবং আলোচ্য আয়াতটি স্বয়ং শুদ্ধিকর্মের গুরুত্ব বর্ণনা করে আর এ কর্মটির মধ্যে নিজের সত্তা ও সমাজ জীবন উভয়েরই পরিশুদ্ধি শামিল রয়েছে।

৬. এর দু'টি অর্থ হয়। **এক:** নিজের দেহের লজ্জাস্থানগুলো ঢেকে রাখে। অর্থাৎ উলঙ্গ হওয়া থেকে নিজেকে রক্ষা করে এবং অন্যের সামনে লজ্জাস্থান খুলে না। **দুই:** তারা নিজেদের সততা ও পবিত্রতা সংরক্ষণ করে। অর্থাৎ যৌন স্বাধীনতা দান করেনা এবং কামশক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে লাগামহীন হয় না। (আরও ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা নূর, ৩০-৩২ টীকা)।

৭. এটি একটি প্রাসংগিক বাক্য। "লজ্জাস্থানের হেফাজত করে" বাক্যাংশটি থেকে যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয় তা দূর করার জন্য এ বাক্যটি বলা হয়েছে। দুনিয়াতে পূর্বেও একথা মনে করা হতো এবং আজো বহু লোক এ বিভ্রান্তিতে ভুগছে যে, কামশক্তি মূলত একটি খারাপ জিনিস এবং বৈধ পথে হলেও তার চাহিদা পূরণ করা সৎ ও আল্লাহর প্রতি অনুগত লোকদের জন্য সংগত নয়। যদি কেবল মাত্র "সফলতা লাভকারী মু'মিনরা নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে" এতটুকু কথা বলেই বাক্য খতম করে দেয়া হতো তাহলে এ বিভ্রান্তিটি জোরদার হয়ে যেতো। কারণ এর এ অর্থ করা যেতে পারতো যে, তারা মালকোঁচা মেরে থাকে, তারা সন্যাসী ও যোগী এবং বিয়ে-শাদীর ঝামেলায় তারা যায় না। তাই একটি প্রাসংগিক বাক্য বাড়িয়ে দিয়ে এ সত্যটি সুস্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে যে, বৈধ স্থানে নিজের প্রবৃত্তির কামনা পূর্ণ করা কোন নিন্দনীয় ব্যাপার নয়। তবে কাম প্রবৃত্তির সেবা করার জন্য এ বৈধ পথ এড়িয়ে অন্য পথে চলা অবশ্যই গোনাহের কাজ। এ প্রাসংগিক বাক্যটি থেকে কয়েকটি বিধান বের হয়। এগুলো সংক্ষেপে এখানে বর্ণনা করা হচ্ছেঃ

এক: লজ্জাস্থান হেফাজত করার সাধারণ হুকুম থেকে দু'ধরনের স্ত্রীলোককে বাদ দেয়া হয়েছে। **এক:** স্ত্রী। **দুই:** -مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ- । স্ত্রী (أَزْوَاجٌ) শব্দটি আরবী ভাষার পরিচিত ব্যবহার এবং স্বয়ং কুরআনের সুস্পষ্ট বক্তব্য অনুযায়ী কেবলমাত্র এমনসব নারী সম্পর্কে বলা হয় যাদেরকে যথারীতি বিবাহ করা হয়েছে এবং আমাদের দেশে প্রচলিত "স্ত্রী" শব্দটি এরই সমার্থবোধক। আর -مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ- বলতে যে বাঁদী বুঝায়

www.pathagar.com

আরবী প্রবাদ ও কুরআনের ব্যবহার উভয়ই তার সাক্ষী। অর্থাৎ এমন বাঁদী যার ওপর মানুষের মালিকানা অধিকার আছে। এভাবে এ আয়াত পরিষ্কার বলে দিচ্ছে বিবাহিতা স্ত্রীর ন্যায় মালিকানাধীন বাঁদীর সাথেও যৌন সম্পর্ক স্থাপন করা বৈধ এবং বৈধতার ভিত্তি বিয়ে নয় বরং মালিকানা। যদি এ জন্যও বিয়ে শর্ত হতো তাহলে একে স্ত্রী থেকে আলাদা করেও বর্ণনা করার প্রয়োজন ছিল না। কারণ বিবাহিত হলে সে ও স্ত্রীর পর্যায়ভূক্ত হতো। বর্তমান কালের কোন কোন মুফাস্‌সির যারা বাঁদীর সাথে যৌন সম্ভোগ স্বীকার করেননি। তারা সূরা নিসার (২৫ আয়াত)

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ

আয়াতটি থেকে যুক্তি আহরণ করে একথা প্রমাণ করতে চান যে, বাঁদীর সাথে যৌন সম্ভোগও কেবলমাত্র বিয়ের মাধ্যমেই করা যেতে পারে। কারণ সেখানে হুকুম দেয়া হয়েছে, যদি আর্থিক দূরবস্থার কারণে তোমরা কোন স্বাধীন পরিবারের মেয়েকে বিয়ে করার ক্ষমতা না রাখে তাহলে কোন বাঁদীকে বিয়ে করো। কিন্তু এসব লোকের একটি অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য লক্ষ করার মতো। এরা একই আয়াতের একটি অংশকে নিজেদের উদ্দেশ্যের পক্ষে লাভজনক দেখতে পেয়ে গ্রহণ করে নেন, আবার সে একই আয়াতের যে অংশটি এদের উদ্দেশ্য বিরোধী হয় তাকে জেনে বুঝে বাদ দিয়ে দেন। এ আয়াতে বাঁদীদেরকে বিয়ে করার নির্দেশ যেসব শব্দের মাধ্যমে দেয়া হয়েছে সেগুলো হচ্ছেঃ

فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

"কাজেই এ বাঁদীদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যাও এদের অভিভাবকদের অনুমতিক্রমে এবং এদেরকে পরিচিত পদ্ধতিতে মোহরানা প্রদান করো"। এ শব্দগুলো পরিষ্কার বলে দিচ্ছে, এখানে বাঁদীর মালিকের বিষয় আলোচনার বিষয়বস্তু নয় বরং এমন ব্যক্তির বিষয় এখানে আলোচনা করা হচ্ছে, যে স্বাধীন মেয়ে বিয়ে করার ব্যয়ভার বহন করার ক্ষমতা রাখে না এবং এ জন্য অন্য কোন ব্যক্তির মালিকানাধীন বাঁদীকে বিয়ে করতে চায়। নয়তো যদি নিজেরই বাঁদীকে বিয়ে করার ব্যাপার হয় তাহলে তার এ "অভিভাবক" কে হতে পারে যার কাছ থেকে তার অনুমতি নেয়ার প্রয়োজন হয়? কিন্তু কুরআনের সাথে কৌতুককারীরা কেবলমাত্র - فَانْكِحُوهُنَّ - কে গ্রহণ করেন অথচ তার পরেই যে - بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ - এসেছে তাকে উপেক্ষা করেন। তাছাড়াও তারা একটি আয়াতের এমন অর্থ বের করেন যা একই বিষয়বস্তু সম্পর্কিত কুরআনের অন্যান্য আয়াতের সাথে সংঘর্ষশীল। কোন ব্যক্তি যদি নিজের চিন্তাধারার নয় বরং কুরআন মজীদের অনুসরণ করতে চায় তাহলে তাকে অবশ্যই সূরা নিসার ৩-৩৫, সূরা আহযাবের ৫০-৫২ এবং সূরা মা'আরিজের ৩০ আয়াতকে সূরা মু'মিনূনের এ আয়াতের সাথে মিলিয়ে পড়তে হবে। এভাবে সে নিজেই এ ব্যাপারে কুরআনের বিধান কি তা জানতে পারবে। (এ বিষয়ে আরো বেশী বিস্তারিত জানতে হলে পড়ুন তাফহীমুল

www.pathagar.com

কুরআন, সূরা নিসা, ৪৪ টীকা; তাফহীমাত (মওদূদী রচনাবলী) ২য় খন্ড ২৯০ থেকে ৩২৪ পৃঃ এবং রাসায়েল ও মাসায়েল ১ম খন্ড, ২৪ থেকে ৩৩৩ পৃষ্ঠা)

দুই: - إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ - বাক্যাংশে - عَلَى - শব্দটি একথা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করে দেয় যে, এ আনুসংগিক বাক্যে আইনের যে ধারা বর্ণনা করা হচ্ছে তার সম্পর্ক শুধু পুরুষদের সংগে। বাকি - قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ - থেকে নিয়ে - خَالِدُونَ - পর্যন্ত পুরো আয়াতটিতেই সর্বনাম পুংলিঙ্গে বর্ণিত হওয়া সত্ত্বেও পুরুষ ও নারী উভয়েই শামিল রয়েছে। কারণ আরবী ভাষায় পুরুষ ও নারীর সমষ্টির কথা যখন বলা হয় তখণ সর্বনামের উল্লেখ পুংলিংগেই করা হয়। কিন্তু এখানে - هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ - এর হুকুমের বাইরে রেখে - عَلَى - শব্দ ব্যবহার করার মাধ্যমে একথা সুস্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে যে, এ ব্যতিক্রমটি পুরুষদের জন্য, মেয়েদের জন্য নয়। যদি "এদের কাছে" না বলে "এদের থেকে" হেফাজত না করলে তাদেরকে নিন্দনীয় নয় বলা হতো, তাহলে অবশ্যই এ হুকুমটিও নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য কার্যকর হতে পারতো। এ সূক্ষ্ম বিষয়টি না বুঝার কারণে হযরত উমরের (রা:) যুগে জনৈকা মহিলা তাঁর গোলামের সাথে যৌন সম্ভোগ করে বসেছিলেন। সাহাবায়ে কেরামের মজলিসে শূরায় যখন তাঁর বিষয়টি পেশ হলো তখন সবাই এক বাক্যে বললেন : تأولت كتاب الله تعالى غير تأويله - অর্থাৎ "সে আল্লাহর কিতাবের ভুল অর্থ গ্রহণ করেছে"। এখানে কারো মনে যেন এ সন্দেহ সৃষ্টি না হয় যে, এ ব্যতিক্রম যদি শুধুমাত্র পুরুষদের জন্য হয়ে থাকে তাহলে স্ত্রীদের জন্য তাদের স্বামীরা কেমন করে হালাল হলো? এ সন্দেহটি সঠিক না হবার কারণ হচ্ছে এই যে, যখন স্ত্রীদের ব্যাপারে স্বামীদেরকে পুরুষাংগ হেফাজত করার হুকুমের বাইরে রাখা হয়েছে তখন নিজেদের স্বামীদের ব্যাপারে স্ত্রীরা আপনা আপনিই এ হুকুমের বাইরে চলে গেছে। এরপর তাদের জন্য আর আলাদা সুস্পষ্ট বক্তব্যের প্রয়োজন থাকেনি। এভাবে এ ব্যক্তিক্রমের হুকুমের প্রভাব কার্যত শুধুমাত্র পুরুষ ও তার মালিকানাধীন নারী পর্যন্তই সীমাবদ্ধ হয়ে যায় এবং নারীর জন্য তার গোলামের সাথে দৈহিক সম্পর্ক হারাম গণ্য হয়। নারীর জন্য এ জিনিসটি হারাম গণ্য করার কারণ হচ্ছে এই যে, গোলাম তার প্রবৃত্তির কামনা পূর্ণ করতে পারে কিন্তু তার ও তার গৃহের পরিচালকা হতে পারে না এবং এর ফলে পারিবারিক জীবনের সংযোগ ও শৃঙ্খলা ঢিলা থেকে যায়।

তিন: "তবে যারা এর বাইরে আরো কিছু চাইবে তারাই হবে সীমালংঘনকারী"-এ বাক্যটি ওপরে উল্লিখিত দু'টি বৈধ আকার ছাড়া যিনা বা সমকাম অথবা পশু-সংগম কিংবা কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য অন্য যাই কিছু হোক না কেন সবই হারাম করে দিয়েছে। একমাত্র হস্তমৈথুনের (Masturbation) ব্যাপারে ফকীহগণের মধ্যে মতবিরোধ আছে। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল একে জায়েয গণ্য করেন। ইমাম মালেক

www.pathagar.com

ও ইমাম শাফেঈ একে চূড়ান্ত হারাম বলেন। অন্যদিকে হানাফীদের মতে যদিও এটি হারাম, তবুও যদি চরম মুহূর্তে কখনো কখনো এ রকম কাজ করে বসে তাহলে আশা করা যায় তা মাফ করে দেয়া হবে।

চার: কোন কোন মুফাস্‌সির মুতা' বিবাহ হারাম হবার বিষয়টিও এ আয়াত থেকে প্রমাণ করেছেন। তাঁদের যুক্তি হচ্ছে, যে মেয়েকে মুতা' বিয়ে করা হয় সে না স্ত্রীর পর্যায়ভুক্ত, না বাঁদীর। বাঁদী তো সে নয় একথা সুস্পষ্ট, আবার স্ত্রীও নয়। কারণ স্ত্রীর মর্যাদা লাভ করার জন্য যতগুলো আইনগত বিধান আছে তার কোনটাই তার ওপর আরোপিত হয় না। সে পুরুষের উত্তরধিকারী হয়না, পুরুষও তার উত্তরাধিকারী হয়না। তার জন্য ইদ্দত নেই, তালাকও নেই, খোরপোশ নেই এবং ঈলা, যিহার ও লি'আন ইত্যাদি কোনটিই নেই। বরং সে চার স্ত্রীর নির্ধারিত সীমানার বাইরে অবস্থান করছে কাজেই সে যখন "স্ত্রী" ও "বাঁদী" কোনটার সংজ্ঞায় পড়ে না তখন নিশ্চয়ই সে 'এর বাইরে আরো কিছু'র মধ্যে গণ্য হবে। আর এ আরও কিছু যারা চায় তাদেরকে কুরআন সীমালংঘনকারী গণ্য করেছে। এ যুক্তিটি অনেক শক্তিশালী। তবে এর মধ্যে একটি দূর্বলতার দিকও আছে। আর এ দূর্বলতাটি হচ্ছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুতা' হারাম হবার শেষ ও চূড়ান্ত ঘোষণা দেন মক্কা বিজয়ের বছরে। এর পূর্বে অনুমতির প্রমাণ সহী হাদীসগুলোতে পাওয়া যায়। যদি একথা মেনে নেয়া যে, মুতা' হারাম হবার হুকুম কুরআনের এ আয়াতের মধ্যেই এসে গিয়েছিল আর এ আয়াতটির মক্কী হবার ব্যাপারে সবাই একমত এবং এটি হিজরতের কয়েক বছর আগে নাযিল হয়েছিল, তাহলে কেমন করে ধারণা করা যেতে পারে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা বিজয় পর্যন্ত একে জায়েয রেখেছিলেন? কাজেই একথা বলাই বেশী নির্ভুল যে, মুতা' বিষয়ে কুরআন মজীদের কোন সুস্পষ্ট ঘোষণার মাধ্যেম নয় বরং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতের মাধ্যমেই হারাম হয়েছে। সুন্নাতের মধ্যে যদি এ বিষয়টির সুস্পষ্ট ফয়সালা না থাকতো তাহলে নিছক এ আয়াতের ভিত্তিতে এর হারাম হওয়ার ফায়সালা দেয়া কঠিন ছিল। মুতা'র আলোচনা যখন এসে গেছে তখন আরও দু'টি কথা স্পষ্ট করে দেয়া সংগত বলে মনে হয়। **এক:** এর হারাম হওয়ার বিষয়টি স্বয়ং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকেই প্রমাণিত। কাজেই হযরত উমর (রা) একে হারাম করেছেন, এ কথা বলা ঠিক নয়। হযরত উমর (রা) এ বিধিটির প্রবর্তক বা রচয়িতা ছিলেন না বরং তিনি ছিলেন কেবলমাত্র এর প্রচারক ও প্রয়োগকারী। যেহেতু এ হুকুমটি রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর আমলের শেষের দিকে দিয়েছিলেন এবং সাধারণ লোকদের কাছে এটি পৌছেনি তাই হযরত উমর (রা) এটিকে সাধারণ্যে প্রচার ও আইনের সাহায্যে কার্যকরী করেছিলেন। **দুই:** শিয়াগণ মুতা'কে সর্বোতভাবে ও শর্তহীনভাবে মুবাহ সাব্যস্ত করার যে নীতি অবলম্বন করেছেন কুরআন ও সুন্নাহের কোথাও তার কোন অবকাশই নেই। প্রথম যুগের সাহাবা, তাবেঈ ও ফকীহদের মধ্যে কয়েকজন যারা এর বৈধতার সমর্থক ছিলেন তারা শুধুমাত্র অনন্যোপায় অবস্থায় অনিবার্য পরিস্থিতিতে এবং চরম প্রয়োজনের সময় একে বৈধ গণ্য করেছিলেন। তাদের একজনও একে বিবাহের মতো শর্তহীন মুবাহ

www.pathagar.com

এবং সাধারণ অবস্থায় অবলম্বনযোগ্য বলেননি। বৈধতার প্রবক্তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী উল্লেখযোগ্য হিসেবে পেশ করা হয় হযরত ইবনে আব্বাসের (রা) নাম। তিনি নিজের মত এভাবে ব্যক্ত করেছেন ما هي إلا كالميتة لا تحل إلا للمضطر (এ হচ্ছে মৃতের মতো, যে ব্যক্তি অনিবার্য ও অনন্যোপায় অবস্থার শিকার হয়েছে তার ছাড়া আর কারোর জন্য বৈধ নয়।) আবার তিনি যখন দেখলেন তাঁর এ বৈধতার অবকাশ-দান মূলক ফতোয়া থেকে লোকেরা অবৈধ স্বার্থ উদ্ধার করে যথেচ্ছভাবে মুতা' করতে শুরু করেছে এবং তাকে প্রয়োজনের সময় পর্যন্ত মুলতবী করছে না তখন তিনি নিজের ফতওয়া প্রত্যাহার করে নিলেন। ইবনে আব্বাস (রা:) ও তাঁর সমমনা মুষ্টিমেয় কয়েকজন তাঁদের এ মত প্রত্যাহার করেছিলেন কিনা এ প্রশ্নটি যদি বাদ দেয়াও যায় তাহলে তাদের মত গ্রহণকারীরা বড় জোর "ইযতিহার" তথা অনিবার্য ও অনন্যোপায় অবস্থায় একে বৈধ বলতে পারেন। অবাধ ও শর্তহীন মুবাহ এবং প্রয়োজন ছাড়াই মুতা' বিবাহ করা এমন কি বিবাহিত স্ত্রীদের উপস্থিতিতেও মুতা'-বিবাহিত স্ত্রীদের সাথে যৌন সম্ভোগ করা এমন একটি সেচ্ছাচার যাকে সুস্থ ও ভারসাম্যপূর্ণ রুচিবোধও কোনদিন বরদাশত করেনা। ইসলামী শরীয়াত ও রাসূল বংশোদ্ভূত ইমামদেরকে এর সাথে জড়িত মনে করার তো কোন প্রশ্নই উঠে না। আমি মনে করি, শিয়াদের মধ্য থেকে কোন শুদ্ধ ও রুচিবান ব্যক্তিও তার মেয়ের জন্য কেউ বিবাহের পরিবর্তে মুতা'র প্রস্তাব দেবে এটা বরদাশত করতে পারেনা। এর অর্থ এ দাঁড়ায় যে, মুতা'র বৈধতার জন্য সমাজে বারবনিতাদের মতো মেয়েদের এমন একটি নিকৃষ্ট শ্রেণী থাকতে হবে যাদের সাথে মুতা' করার অবাধ সুযোগ থাকে। অথবা মুতা' হবে শুধুমাত্র গরীবদের কন্যা ও ভগিনীদের জন্য এবং তা থেকে ফায়দা হাসিল করার অধিকারী হবে সমাজের ধনিক ও সমৃদ্ধশালী শ্রেণীর পুরুষেরা। আল্লাহ ও রাসূলের শরীয়াত থেকে কি এ ধরনের বৈষম্যপূর্ণ ও ইনসাফ বিহীন আইনের আশা করা যেতে পারে? আবার আল্লাহ ও তাঁর রাসূল থেকে কি এটাও আশা করা যেতে পারে যে, তিনি এমন কোন কাজকে মুবাহ করে দেবেন যাকে যে কোন সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে নিজের জন্য অমর্যাদাকর এবং বেহায়াপনা মনে করে?

৮. আমানত শব্দটি বিশ্ব-জাহানের প্রভু অথবা সমাজ কিংবা ব্যক্তি যে আমানত কাউকে সোপর্দ করেছেন তা সবগুলোর অর্থে ব্যবহৃত হয়। আর এমন যাবতীয় চুক্তি প্রতিশ্রুতি ও অংগীকারের অন্তর্ভুক্ত হয় যা মানুষ ও আল্লাহর মধ্যে অথবা মানুষ ও মানুষের মধ্যে কিংবা জাতি ও জাতির মধ্যে সম্পাদিত হয়েছে। মু'মিনের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, সে কখনো আমানতের খেয়ানত করে না এবং কখনো নিজের চুক্তি ও অগীকার ভঙ্গ করে না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রায়ই তাঁর ভাষণে বলতেন:

لا إيمان لمن لا أمانة له و لا دين لمن لا عهد له

যার মধ্যে আমানতদারীর গুণ নেই তার মধ্যে ঈমান নেই এবং যার মধ্যে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার গুণ নেই তার মধ্যে দ্বীনদারী নেই। (বায়হাকী, ঈমানের শাখা-প্রশাখাসমূহ)

বুখারী ও মুসলিম একযোগে এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন: চারটি অভ্যাস যার মধ্যে পাওয়া যায় সে নিখাদ মুনাফিক এবং যার মধ্যে এর কোন একটি পাওয়া যায় সে তা ত্যাগ না করা পর্যন্ত তার মধ্যে তা মুনাফিকীর একটি অভ্যাস হিসেবেই থাকে। সে চারটি অভ্যাস হচ্ছে, কোন আমানত তাকে সোপর্দ করা হলে সে তার খেয়ানত

www.pathagar.com

করে, কখনো কথা বললে মিথ্যা কথা বলে, প্রতিশ্রুতি দিলে ভঙ্গ করে এবং যখনই কারোর সাথে ঝগড়া করে তখনই (নৈতিকতা ও সততার) সমস্ত সীমা লংঘন করে।

৯. উপরের খুশূ'র আলোচনায় সালাত শব্দ এক বচনে বলা হয়েছিল আর এখানে বহুবচনে সালাতগুলো বলা হয়েছে। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে এই যে, সেখানে লক্ষ্য ছিল মূল সালাত আর এখানে পৃথক পৃথকভাবে প্রতিটি ওয়াক্তের সালাত সম্পর্কে বক্তব্য দেয়া হয়েছে। নামাযগুলোর সংরক্ষণ-এর অর্থ হচ্ছে : সে নামাযের সময়, নামাযের নিয়ম-কানুন, আরকান ও আহ্কাম মোটকথা নামাযের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকটি জিনিসের প্রতি পুরোপুরি নজর রাখে। শরীর ও পোশাক পরিচ্ছদ পাক রাখে। অযু ঠিক মতো করে। কখনো যেন বিনা অযুতে নামায না পড়া হয় এদিকে খেয়াল রাখে। সঠিক সময়ে নামায পড়ার চিন্তা করে। সময় পার করে দিয়ে নামায পড়ে না। নামাযের সমস্ত আরকান পুরোপুরি ঠান্ডা মাথায় পূর্ণ একাগ্রতা ও মানসিক প্রশান্তি সহকারে আদায় করে। একটি বোঝার মতো তাড়াতাড়ি নামিয়ে দিয়ে সরে পড়ে না। যা কিছু নামাযের মধ্যে পড়ে এমনভাবে পড়ে যাতে মনে হয় বান্দা তার প্রভু আল্লাহর কাছে কিছু নিবেদন করছে, এমনভাবে পড়ে না যাতে মনে হয় একটি গৎবাধা বাক্য আউড়ে শুধুমাত্র বাতাসে কিছু বক্তব্য ফুঁকে দেয়াই তার উদ্দেশ্য।

১০. ফিরদৌস জান্নাতের সবচেয়ে বেশী পরিচিত প্রতিশব্দ। মানব জাতির প্রায় সমস্ত ভাষায়ই এ শব্দটি পাওয়া যায়। সংস্কৃতে বলা হয় পরদেষা, প্রাচীন কূলদানী ভাষায় পরদেসা, প্রাচীন ইরানী (যিন্দা) ভাষায় পিরীদাইজা,হিব্রু ভাষায় পারদেস, আর্মেনীয় ভাষায় পারদেজ, সুরিয়ানী ভাষায় ফারদেসো, গ্রীক ভাষায় পারাডাইসোস, ল্যাটিন ভাষায় প্যারাডাইস এবং আরবী ভাষায় ফিরদৌস। এ শব্দটি এসব ভাষায় এমন একটি বাগানের জন্য বলা হয়ে থাকে যার চারদিকে পাঁচিল দেয়া থাকে, বাগানটি বিস্তৃত হয়, মানুষের আবাসগৃহের সাথে সংযুক্ত হয় এবং সেখানে সব ধরনের ফল বিশেষ করে আঙ্গুর পাওয়া যায়। বরং কোন ভাষায় এর অর্থের মধ্যে এ কথাও বুঝা যায় যে, এখানে বাছাই করা গৃহপালিত পশু-পাখিও পাওয়া যায়। কুরআনের পূর্বে আরবদের জাহেলী যুগের ভাষায় ও ফিরদৌস শব্দের ব্যবহার ছিল। কুরআনে বিভিন্ন বাগানের সমষ্টিকে ফিরদৌস বলা হয়েছে। যেমন সূরা কাহ্ফে বলা হয়েছে: - كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا - তাদের আপ্যায়নের জন্য ফিরদৌসের বাগানগুলো আছে। এ থেকে মনের মধ্যে যে ধারণা জন্মে তা হচ্ছে এই যে, ফিরদৌস একটি বড় জায়গা, যেখানে অসংখ্য বাগ- বাগিচা ও উদ্যান রয়েছে।

মু'মিনদের ফিরদৌসের অধিকারী হবার বিষয়টির ওপর সূরা ত্বা-হা (৮৩ টীকা) ও সূরা আল আম্বিয়া (৯৯ টীকা) যথেষ্ট আলোকপাত করা হয়েছে।.

www.pathagar.com

০৮ রামাদান
বিষয়ঃ ইসলাম প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা
সূরা সফ দ্বিতীয় রুকু: ২৪-২৭

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ
(9) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (10) تُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ
تَعْلَمُونَ (11) يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ
طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (12) وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ
وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (13) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونوا أَنصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ
لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ فَآمَنَت طَّائِفَةٌ مِّن بَنِي
إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَت طَّائِفَةٌ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ (14)

৯) তিনিই সেই মহান সত্তা যিনি তাঁর রাসূলকে হিদায়াত এবং 'দ্বীনে হক' দিয়ে পাঠিয়েছেন যাতে তিনি এ দ্বীনকে অন্য সকল দ্বীনের ওপর বিজয়ী করেন, চাই তা মুশরিকদের কাছে যতই অসহনীয় হোক না কেন।[১৩]

১০) হে ঈমান আনয়নকারীগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি ব্যবসায়ের [১৪] সন্ধান দেবো যা তোমাদেরকে কঠিন আযাব থেকে মুক্তি দেবে?
১১) তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের [১৫] প্রতি ঈমান আন এবং আল্লাহর পথে অর্থ-সম্পদ ও জান-প্রাণ দিয়ে জিহাদ করো এটাই তোমাদের জন্য অতিব কল্যাণকর যদি তোমরা তা জান। [১৬]

১২) আল্লাহ তোমাদের গোনাহ মাফ করে দেবেন এবং তোমাদেরকে এমন সব বাগানে প্রবেশ করাবেন যার নীচ দিয়ে ঝর্ণাধারা বয়ে চলবে। আর চিরস্থায়ী বসবাসের জায়গা জান্নাতের মধ্যে তোমাদেরকে সর্বোত্তম ঘর দান করবেন। এটাই বড় সফলতা।[১৭]

১৩) আর আরেক জিনিস যা তোমরা আকাংখা করো আল্লাহ তাও তোমাদের দেবেন আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য এবং অতি নিকটবর্তী সময়ে বিজয়। [১৮] হে নবী! ঈমানদারদেরকে এর সুসংবাদ দান করো।

১৪) হে ঈমানদাগণ! তোমরা আল্লাহর সাহায্যকারী হয়ে যাও। ঠিক তেমনি, যখন ঈসা ইবনে মারইয়াম হাওয়ারীদের [১৯] উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন: আল্লাহর দিকে (আহবান করার ক্ষেত্রে) কে আমার সাহায্যকারী? তখন হাওয়ারীরা জবাব দিয়েছিলো: আমরা

www.pathagar.com

আছি আল্লাহর সাহায্যকারী। [২০] সেই সময় বনী ইসরাঈল জাতির একটি দল ঈমান আনয়ন করেছিল এবং আরেকটি দল অস্বীকার করেছিল। অতপর আমি ঈমান আনয়নকারীদেরকে তাদের শত্রুদিগের বিরুদ্ধে শক্তি যোগালাম এবং তারাই বিজয়ী হয়ে গেল।[২১]

আয়াত সমূহের ব্যাখ্যা

১৪. ব্যবসায় এমন জিনিস যাতে মানুষ তার অর্থ সময়, শ্রম, এবং মেধা ও যোগ্যতা নিয়োজিত করে মুনাফা অর্জনের জন্য। এ বিষয়টি বিবেচনা করেই এখানে ঈমান ও আল্লাহর পথে জিহাদ করাকে ব্যবসায় বলা হয়েছে। অর্থাৎ এই পথে নিজের সবকিছু নিয়োজিত করলে সেই মুনাফা তুমি অর্জন করতে পারবে যার কথা একটু পরেই বলা হচ্ছে। সূরা তাওবার ১১১ আয়াতে এই বিষয়টিই অন্য এক ভঙ্গিতে বলা হয়েছে: (দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আত তাওবা, টীকা ১০৬)।

১৫. যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে যখন বলা হয় ঈমান আনো তখন আপনা থেকেই তার অর্থ দাঁড়ায় খাঁটি ও নিষ্ঠাবান মুসলমান হও। ঈমানের মৌখিক দাবীই শুধু করোনা, বরং যে বিষয়ের প্রতি ঈমান এনেছো তার জন্য সব রকম ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত হয়ে যাও।

১৬. অর্থাৎ এ ব্যবসায় তোমাদের জন্য দুনিয়ার সব ব্যবসায় থেকে অনেক বেশী উত্তম।

১৭. এটা সেই ব্যবসায়ের আসল মুনাফা। আখেরাতের চিরস্থায়ী জীবনে এই মুনাফাই অর্জিত হবে। **এক:** আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা পাওয়া। **দুই:** গোনাহসূহ মাফ হওয়া। **তিন:** আল্লাহর সেই জান্নাতে প্রবেশ করা যার নিয়ামতসমূহ চিরস্থায়ী ও অবিনশ্বর।

১৮. যদিও পৃথিবীতে বিজয়ী ও সফলতা লাভ করাও একটা বড় নিয়ামত। কিন্তু মু'মিনের নিকট প্রকৃত গুরুত্বের বিষয় এ পৃথিবীর সফলতা নয়, বরং আখেরাতের সফলতা। এ কারণেই দুনিয়ার এই জীবনে যে শুভ ফলাফল অর্জিত হবে তার উল্লেখ পরে করা হয়েছে আর আখেরাতে যে ফলাফল পাওয়া যাবে তার উল্লেখ আগে করা হয়েছে।

১৯. হযরত ঈসা (আ) সংগীদের জন্য বাইবেলে সাধারণত 'শিষ্য' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু পরবর্তীকালে খৃস্টানদের মধ্যে তাদের জন্য রসূল(সা:) পরিভাষাটি চালু হয়। তবে তাঁরা আল্লাহর রাসূল ছিল এ অর্থে তাঁদেরকে রাসূল বলা হতো না, বরং তাদেরকে রাসূল বলা হতো এ অর্থে যে, হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম নিজের পক্ষ থেকে তাঁদেরকে ফিলিস্তিনের বিভিন্ন অঞ্চলে মুবাল্লিগ হিসেবে পাঠাতেন। যেসব লোককে হাইকলের জন্য চাঁদা সংগ্রহের উদ্দেশ্যে পাঠানো হতো তাদের জন্য এ শব্দটির ব্যবহার ইহুদীদের মধ্যে পূর্ব থেকেই ছিল। পক্ষান্তরে কুরআন মজীদে এর পরিবর্তে হাওয়ারী পরিভাষা ব্যহৃত হয়েছে যা এ দুটি খৃষ্টীয় পরিভাষা থেকে উত্তম। এ শব্দটির

www.pathagar.com

মূল হলো (حور) যার অর্থ শুভ্রতা। ধোপাকে (حوارى) হাওয়ারী বলা হয়। এ জন্য যে, সে কাপড় ধুয়ে পরিষ্কার ও সাদা করে দেয়। খাঁটি ও নিখাদ জিনিসকেও হাওয়ারী বলা হয়। চালুনি দিয়ে চেলে যে আটার ভূষি ও ছাল বের করে আলাদা করা হয়েছে তাকে (حوارى) হাওয়ারা বলে। এ অর্থে অকৃত্রিম বন্ধু ও নিঃস্বার্থ সাহায্যকারীকে বুঝাতে ও এ শব্দটি ব্যবহার করা হয়। ইবনে সাইয়েদ বলেনঃ যেসব ব্যক্তি কাউকে অধিক মাত্রায় সাহায্য করে তাকেও ঐ ব্যক্তির হাওয়ারী বলে। (লিসানুল আরব)

২০. যারা আল্লাহর দ্বীনের দিকে মানুষকে আহবান জানায় এবং কুফরের মোকাবিলায় আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্য চেষ্টা-সাধনা করে কুরআন মজীদের যেসব জায়গায় তাদেরকে আল্লাহর সাহায্যকারী বলা হয়েছে এটি তার মধ্যে সর্বশেষ জায়গা। ইতিপূর্বে সূরা আলে ইমরানের ৫২ আয়াত, সূরা হজ্জের ৪০ আয়াত , সূরা মুহাম্মাদের ৭ আয়াত, সূরা হাদীদের ২৫ আয়াত এবং সূরা হাশরের ৮ আয়াতে এই একই বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে এবং তাফহীমুল কুরআনে সূরা আলে ইমরানের ৫০ নং টীকা, সূরা হজ্জের ৮৪ নং টীকা, সূরা মুহাম্মাদের ১২নং টীকা এবং সূরা হাদীদের ৪৭ নং টীকায় আমরা এর ব্যাখ্যা পেশ করেছি। তাছাড়া সূরা মুহাম্মাদের ৯নং টীকায়ও এ বিষয়টির একটি দিক সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে আলোকপাত করা হয়েছে। এসব সত্ত্বেও কারো কারো মনে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, আল্লাহ তা'আলা যখন নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী, সমস্ত সৃষ্টির কারো উপরই নির্ভরশীল নন, কারো মুখাপেক্ষী নন, বরং সবাই তাঁরই মুখাপেক্ষী তখন তার কোন বান্দা কেমন করে তাঁর সাহায্যকারী হতে পারে? এই খটকা এবং সন্দেহ-সংশয় দূর করার জন্য আমরা বিষয়টির আরো কিছু ব্যাখ্যা এখানে পেশ করেছি।

এসব লোককে আল্লাহর সাহায্যকারী মূলতঃ এজন্য বলা হয়নি যে, কোন কাজের জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর কোন সৃষ্টির মুখাপেক্ষী (নাউযুবিল্লাহ)। বরং তাদেরকে আল্লাহর সাহায্যকারী এ জন্য বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা মানুষকে জীবনের যে গন্ডিতে কুফর ও ঈমান এবং আনুগত্য ও নাফরমানীর যে স্বাধীনতা দিয়েছেন সে ক্ষেত্রে তিনি তাঁর অজেয় শক্তিকে কাজে লাগিয়ে জোর করে মানুষকে মু'মিন ও অনুগত বানান না। বরং নবী-রাসূল ও কিতাবের সাহায্যে তাদেরকে উপদেশ দেন, শিক্ষাদান করেন এবং বুঝিয়ে সুজিয়ে সঠিক পথ দেখানোর পন্থা অবলম্বন করেন। যে ব্যক্তি এই উপদেশ ও শিক্ষাকে স্বেচ্ছায় ও সাগ্রহে, গ্রহণ করে সে মু'মিন; যে কাজে পরিণত করে সে মুসলিম, অনুগত ও আবেদ; যে আল্লাহভীতির নীতি অনুসরণ করে সে মুত্তাকী, যে নেকীর কাজে অগ্রগামী হয় সে 'মুহসিন' এবং এ থেকে আরও এক ধাপ অগ্রসর হয়ে যে এই উপদেশ ও শিক্ষার সাহায্য আল্লাহর বান্দাদের সংস্কার ও সংশোধনের উদ্দেশ্যে এবং কুফর ও পাপাচারের স্থলে আল্লাহর আনুগত্যের বিধান কায়েম করার জন্য কাজ করতে শুরু করে আল্লাহ তা'আলা তাকে তাঁর সাহায্যকারী বলে আখ্যায়িত করেন। যেমন উপরোক্ত আয়াতের কয়েকটি স্থানে স্পষ্ট ভাষায় এ কথাটিই বলা হয়েছে। যদি আল্লাহর সাহায্যকারী না বলে আল্লাহর দ্বীনের সাহায্যকারী বলা মূল উদ্দেশ্য হতো

www.pathagar.com

তাহলে (أنصار الله) না বলে (أنصار دين الله) বলা হতো, (ينصرون الله) না বলে (ينصرون دين الله) বলা হতো এবং (ان تنصروا الله) না বলে (ان تنصروا دين الله) বলা হতো। একটি বিষয় বলার জন্য আল্লাহ তা'আলা যখন এ কথাই প্রমাণ করে যে, এ ধরণের লোকদের আল্লাহর সাহায্যকারী বলাই এর মূল উদ্দেশ্য। তবে এই সাহায্য নাউযুবিল্লাহ এ অর্থে নয় যে, এসব লোক আল্লাহ তা'আলার এমন কোন প্রয়োজন পূরণ করেছে যার তিনি মুখাপেক্ষী। বরং এর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলার যে কাজ তাঁর জবরদস্ত শক্তির জোরে না করে তাঁর নবী -রাসূল ও কিতাবের সাহায্যে করতে চান এসব লোক সেই কাজে অংশগ্রহণ করছে।

২১. ঈসা মাসীহর প্রতি ঈমান আনতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারী বলতে ইহুদী এবং ঈমান গ্রহণকারী বলতে খৃষ্টান ও মুসলমান উভয়কে বুঝানো হয়েছে আর এই দুই জাতিকেই আল্লাহ তা'আলা ঈসা মাসীহর অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে বিজয় দান করেছেন। এখানে এ কথাটি বলার উদ্দেশ্য মুসলমানদের এ বিষয়ে নিশ্চয়ইতা দেয়া যে, হযরত ঈসার অনুসারীরা ইতিপূর্বেও যেভাবে তাঁর অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হয়েছেন এখনও তেমনি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের অনুসারীরা তাঁর অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হবেন।

www.pathagar.com

০৯ রামাদান

বিষয়: সর্বোত্তম জাতি ও তাদের দায়িত্ব

সূরা আল ইমরান: ১০২-১১০

بسم الله الرحمن الرحيم

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ (102) وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (103) وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (104) وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (105) يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُواْ الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ (106) وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (107) تِلْكَ آيَاتُ اللّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ (108) وَلِلّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَإِلَى اللّهِ تُرْجَعُ الأُمُورُ (109) كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ (110)

১০২) হে ঈমানদারগণ! তোমরা যথাযথভাবে আল্লাহকে ভয় করো। মুসলিম থাকা অবস্থায় ছাড়া যেন তোমাদের মৃত্যু না হয়।[৮২] ১০৩) তোমরা সবাই মিলে আল্লাহর রজ্জু[৮৩] মজবুতভাবে আকঁড়ে ধরো এবং দলাদলি করো না। আল্লাহ তোমাদের প্রতি যে অনুগ্রহ করেছেন সে কথা স্মরণ রেখো। তোমরা ছিলে পরস্পরের শত্রু। তিনি তোমাদের হৃদয়গুলো জুড়ে দিয়েছেন। ফলে তাঁর অনুগ্রহ ও মেহেরবানীতে তোমরা ভাই ভাই হয়ে গেছো। তোমরা একটি অগ্নিকুন্ডের কিনারে দাঁড়িয়ে ছিলে। আল্লাহ সেখান থেকে তোমাদের বাঁচিয়ে নিয়েছেন।[৮৪] এভাবেই আল্লাহ তাঁর নির্দশনসমূহ তোমাদের সামনে সুস্পষ্ট করে তুলেন। হয়তো এই নিদর্শনগুলোর মাধ্যমে তোমরা নিজেদের কল্যাণের সোজা সরল পথ দেখতে পাবে।[৮৫] ১০৪) তোমাদের মধ্যে এমন কিছু লোক অবশ্যই থাকতে হবে, যারা নেকী ও সৎকর্মশীলতার দিকে আহবান জানাবে, ভালো কাজের নির্দেশ দেবে ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখবে। যারা এ দায়িত্ব পালন করবে তারাই সফলকাম হবে। ১০৫) তোমরা যেন তাদের মতো হয়ে যেয়ো না, যারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে গেছে এবং সুস্পষ্ট ও প্রকাশ্য হিদায়াত পাওয়ার পরও মতবিরোধে লিপ্ত হয়েছে।[৮৬] যারা এ নীতি অবলম্বন করেছে তারা সেদিন কঠিন শাস্তি পাবে। ১০৬)

www.pathagar.com

যেদিন কিছু লোকের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠবে এবং কিছু লোকের মুখ কালো হয়ে যাবে। তাদেরকে বলা হবে, ঈমানের নিয়ামত লাভ করার পরও তোমরা কুফরী নীতি অবলম্বন করলে? ঠিক আছে, তাহলে এখন এই নিয়ামত অস্বীকৃতির বিনিময়ে আযাবের স্বাদ গ্রহন করো। ১০৭) আর যাদের চেহারা উজ্জ্বল হবে, তারা আল্লাহর রহমতের আশ্রয় লাভ করবে এবং তারা চিরদিন এই অবস্থায় থাকবে। ১০৮) এগুলো আল্লাহর বাণী, তোমাকে যথাযথভাবে শুনিয়ে যাচ্ছি। কারণ দুনিয়াবাসীদের প্রতি জুলুম করার কোন ইচ্ছা আল্লাহর নেই।[৮৭] ১০৯) আল্লাহ পৃথিবী ও আকাশের সমস্ত জিনিসের মালিক এবং সমস্ত বিষয় আল্লাহর দরবারে পেশ হয়। ১১০) এখন তোমরাই দুনিয়ায় সর্বোত্তম দল। তোমাদের কর্মক্ষেত্রে আনা হয়েছে মানুষের হিদায়াত ও সংস্কার সাধনের জন্য।[৮৮] তোমরা নেকীর হুকুম দিয়ে থাকো, দুস্কৃতি থেকে বিরত রাখো এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনো। এই আহলি কিতাবরা [৮৯] ঈমান আনলে তাদের জন্যই ভালো হতো। যদিও তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক ঈমানদার পাওয়া যায়, কিন্তু তাদের অধিকাংশই নাফরমান।

আয়াত সমূহের ব্যাখ্যা

৮২. অর্থাৎ মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত আল্লাহর প্রতি অনুগ্রহ ও বিশ্বস্ত থাকো।

৮৩. আল্লাহর রজ্জু বলতে তাঁর দ্বীনকে বুঝানো হয়েছে। আল্লাহর দ্বীনকে রজ্জুর সাথে তুলনা করার কারণ হচ্ছে এই যে, এটিই এমন একটি সম্পর্ক, যা একদিকে আল্লাহর সাথে ঈমানদারদের সম্পর্ক জুড়ে দেয় এবং অন্যদিকে সমস্ত ঈমানদারকে পরস্পরের সাথে মিলিয়ে এক জামায়াতবদ্ধ করে। এই রজ্জুকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরার মানে হচ্ছে, মুসলমানরা "দ্বীন" কেই আসল গুরুত্বের অধিকারী মনে করবে, তার ব্যাপারেই আগ্রহ পোষণ করবে, তাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রচেষ্টা চালাবে এবং তারই খেদমত করার জন্য পরস্পরের সাথে সহযোগিতা করবে। যেখানেই মুসলমানরা দ্বীনের মৌলিক শিক্ষা ও দ্বীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়বে এবং তাদের সমগ্র দৃষ্টি ও আগ্রহ ছোটখাট ও খুঁটিনাটি বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হবে সেখানেই অনিবার্যভাবে তাদের মধ্যে সে এই প্রকারের দলাদলি ও মতবিরোধ দেখা দেবে, যা ইতিপূর্বে বিভিন্ন নবীর উম্মাতদেরকে তাদের আসল জীবন লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত করে দুনিয়া ও আখেরাতের লাঞ্ছনার আবর্তে নিক্ষেপ করেছিল।

৮৪. ইসলামের আগমনের পূর্বে আরববাসীরা যেসব ভয়াবহ অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিল, এখানে সেদিকেই ইংগিত করা হয়েছে। বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে পারস্পরিক শত্রুতা, কথায় কথায় ঝগড়া বিবাদ এবং রাতদিন মারামারি, কাটাকাটি, হানাহানি ও যুদ্ধ-বিগ্রহের কারণে সমগ্র আবর জাতিই ধ্বংসের কবলে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। এই আগুনে পুড়ে ভস্মীভূত হওয়া থেকে ইসলামই তাদেরকে রক্ষা করেছিল। এই আয়াত নাযিল হওয়ার তিন চার বছর আগেই মদীনার লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করেছিল। ইসলামের এ জীবন্ত অবদান তারা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছিল। তারা দেখছিল: আওস ও খাযরাজ দু'টি

www.pathagar.com

গোত্রে বছরের পর বছর থেকে শত্রুতা চলে আসছিল। তারা ছিল পরস্পরের রক্ত পিপাসু। ইসলামের বদৌলতে তারা পরস্পরের সাথে মিলে মিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল। এই গোত্র দু'টি মক্কা থেকে আগত মুহাজিরদের সাথে এমন নজীর বিহীন ত্যাগ ও প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার করছিল, যা সাধারণত একই পরিবারের লোকদের নিজেদের মধ্যে করতে দেখা যায় না।

৮৫. অর্থাৎ যদি তোমাদের সত্যিকার চোখ থেকে থাকে, তাহলে এই আলামতগুলো দেখে তোমরা নিজেরাই আন্দাজ করতে পারবে, কিসে তোমাদের কল্যাণ-এই দ্বীনকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরার মধ্যে, না একে পরিত্যাগ করে আবার তোমাদের সেই পূর্বের অবস্থায় ফিরে যাওয়ার মধ্যে। তোমাদের আসল কল্যাণকামী কে-আল্লাহ ও তাঁর রসূল না সেই ইহুদী, মুশরিক ও মুনাফিক, যারা তোমাদের আগের অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে।

৮৬. এখানে পূর্ববর্তী নবীদের এমন সব উম্মাতের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে, যারা সত্য দ্বীনের সরল ও সুস্পষ্ট শিক্ষা লাভ করেছিল। কিন্তু কিছুদিন অতিবাহিত হবার পর দ্বীনের মূল বিষয়গুলো পরিত্যাগ করে দ্বীনের সাথে সম্পর্কবিহীন গৌণ ও অপ্রয়োজনীয় খুঁটিনাটি বিষয়াবলীর ভিত্তিতে নিজেদেরকে একটি আলাদা ধর্মীয় সম্প্রদায় হিসেবে গড়ে তুলতে শুরু করে দিয়েছিল। তারপর অবান্তর ও আজেবাজে কথা নিয়ে এমনভাবে কলহে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল যে, আল্লাহ তাদের ওপর যে দায়িত্বের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছিলেন তার কথাই তারা ভুলে গিয়েছিল এবং বিশ্বাস ও নৈতিকতার যেসব মূলনীতির ওপর আসলে মানুষের সাফল্য ও কল্যাণের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে, তার প্রতি কোন আগ্রহই তাদের ছিল না।

৮৭. অর্থাৎ যেহেতু আল্লাহ দুনিয়াবাসীদের প্রতি কোন জুলুম করতে চান না তাই তিনি তাদেরকে সোজা পথ দেখিয়ে দিচ্ছেন। আবার শেষ পর্যন্ত কোন কোন বিষয়ে তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে সে কথাও পূর্বাহ্নেই জানিয়ে দিচ্ছেন। এরপরও যারা বাঁকা পথ ধরবে এবং নিজেদের ভ্রান্ত কর্মপদ্ধতি পরিহার করবে না, তারা আসলে নিজেরাই নিজেদের ওপর জুলুম করবে।

www.pathagar.com

১০ রামাদান
বিষয়: আল্লাহর সৃষ্টি
সূরা নাবা: ০১-১৬

بسم الله الرحمن الرحيم

عَمَّ يَتَسَاءلُونَ (1) عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ (2) الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ (3) كَلاَّ سَيَعْلَمُونَ (4)
ثُمَّ كَلاَّ سَيَعْلَمُونَ (5) أَلَمْ نَجْعَلِ الأَرْضَ مِهَادًا (6) وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا (7) وَخَلَقْنَاكُمْ
أَزْوَاجًا (8) وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا (9) وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا (10) وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا
(11) وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا (12) وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا (13) وَأَنزَلْنَا مِنَ
الْمُعْصِرَاتِ مَاء ثَجَّاجًا (14) لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا (15) وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا (16)

১) এরা কি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করছে ? ২) সেই বড় খবরটা সম্পর্কে কি , ৩) যে ব্যাপারে এরা নানান ধরনের কথা বলে ও ঠাট্টা_ বিদ্রুপ করে ফিরছে ?[১] ৪) কখনো না [২] শীঘ্রই এরা জানতে পারবে। ৫) হাঁ কখখনো না , শীঘ্রই এরা জানতে পারবে।[৩] ৬) একথা কি সত্য নয় , আমি যমীনকে বিছানা বানিয়েছি ? [৪] ৭) পাহাড়গুলোকে গেঁড়ে দিয়েছি পেরেকের মতো? [৫] ৮) তোমাদের (নারী ও পুরুষ) জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি ?[৬] ৯) তোমাদের ঘুমকে করেছি শান্তির বাহন,[৭] ১০) রাতকে করেছি আবরণ ১১) এবং দিনকে জীবিকা আহরণের সময় ?[৮] ১২) তোমাদের ওপর সাতটি মজবুত আকাশ স্থাপন করেছি [৯] ১৩) এবং একটি অতি উজ্জ্বল ও উত্তপ্ত বাতি সৃষ্টি করেছি ? [১০] ১৪) আর মেঘমালা থেকে বর্ষণ করেছি অবিরাম বৃষ্টিধারা, ১৫) যাতে তার সাহায্যে উৎপন্ন করতে পারি ১৬) শস্য, শাক সবজি ও নিবিড় বাগান ?[১১]

আয়াত সমূহের ব্যাখ্যা

১. বড় খবর বলতে কিয়ামত ও আখেরাতের কথা বুঝানো হয়েছে। মক্কাবাসীরা অবাক হয়ে কিয়ামত ও আখেরাতের কথা শুনতো। তারপর তাদের প্রত্যেকটি আলাপ আলোচনায়, বৈঠকে, মজলিসে এ সম্পর্কে নানান ধরনের কথা বলতো ও ঠাট্টা-বিদ্রুপ করতো। জিজ্ঞাসাবাদ বলতেও এ নানা ধরনের কথাবার্তা ও ঠাট্টা-বিদ্রুপের কথাই বোঝানো হয়েছে। লোকেরা পরস্পরের সাথে দেখা হলে বলতো, আরে ভাই, শুনেছো নাকি। মানুষ নাকি মরে যাবার পরে আবার জীবিত হবে। এমন কথা আগে কখনো শুনেছিলে। যে মানুষটি মরে পচে গেছে, যার

www.pathagar.com

শরীরের হাড়গুলো পর্যন্ত মাটিতে মিশে গেছে, তার মধ্যে নাকি আবার নতুন করে প্রাণ সঞ্চার হবে, একথা কি মেনে নেয়া যায়। আগের পরের সব বংশধররা জেগে উঠে এক জায়গায় জমা হবে, একথা কি যুক্তিসম্মত। আকাশের বুকে মাথা উঁচু করে পৃথিবী পৃষ্ঠে দাঁড়িয়ে থাকা এসব বড় বড় পাহাড় নাকি পেঁজা তুলোর মতো বাতাসে উড়তে থাকবে। চাঁদ, সুরুজ আর তারাদের আলো কি নিভে যেতে পারে। দুনিয়ার এই জমজমাট ব্যবস্থাটা কি ওলটপালট হয়ে যেতে পারে। এই মানুষটি তো গতকাল পর্যন্তও বেশ জ্ঞানী ও বিচক্ষণ ছিল, আজ তার কি হয়ে গেলো, আমাদের এমন সব অদ্ভুত অদ্ভুত খবর শুনিয়ে যাচ্ছে। এ জান্নাত ও জাহান্নাম এতদিন কোথায় ছিল। এর আগে কখনো আমরা তার মুখে একথা শুনিনি কেন। এখন এরা হঠাৎ টপকে পড়লো কোথা থেকে। কোথা থেকে এদের অদ্ভুত ধরনের ছবি এঁকে এনে আমাদের সামনে পেশ করা হচেছ।

هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ আয়াতাংশটির একটি অর্থ তো হচ্ছেঃ এ ব্যাপারে তারা নানান ধরনের কথা বলছে ও ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে ফিরছে। এর দ্বিতীয় অর্থ এও হতে পারে,দুনিয়ার পরিণাম সম্পর্কে তারা নিজেরাও কোন একটি অভিন্ন আক্বীদা পোষণ করে না বরং "তাদের মধ্যে এ ব্যাপারে বিভিন্ন মত পাওয়া যায়"। তাদের কেউ কেউ খৃষ্টানদের চিন্তাধারায় প্রভাবিত ছিল। কাজেই তারা মৃত্যুর পরের জীবন স্বীকার করতো। তবে এই সংগে তারা একথাও মনে করতো যে,এই জীবনটি শারীরিক নয়, আত্মিক পর্যায়ের হবে। কেউ কেউ আবার আখেরাত পুরোপুরি অস্বীকার করতো না, তবে তা ঘটতে পারে কিনা, এ ব্যাপারে তাদের সন্দেহ ছিল। কুরআন মজীদে এ ধরনের লোকদের এ উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছেঃ إِنْ نَظُنُّ إِلا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ "আমরা তো মাত্র একটি ধারণাই পোষণ করি, আমাদের কোন নিশ্চিত বিশ্বাস নেই"। [আল জাসিয়াহ- ৩১] আবার কেউ কেউ একদম পরিস্কার করে বলতো ঃ إِنْ هِيَ إِلا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ "আমাদের এ দুনিয়ার জীবনটাই সবকিছু এবং মরার পর আমাদের আর কখনো দ্বিতীয়বার উঠানো হবে না " [আর আন'আম ২৯], তাদের মধ্যে, আবার কেউ কেউ সবকিছুর জন্য সময়কে দায়ী করতো । তারা বলতোঃ مَا هِيَ إِلا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلا الدَّهْرُ "আমাদের এই জীবনটাই সবকিছু । এখানেই আমরা মরি, এখানেই জীবন লাভ করি এবং এবং সময়ের চক্রে ছাড়া আর কিছুই নেই যা আমাদের ধ্বংস করে ।" [আল জাসিয়া, ২৪] আবার এমন কিছু লোকও ছিল , যারা সময়কে সবকিছুর জন্য মানুষের আবার জীবিত করে তোলার ক্ষমতা

www.pathagar.com

আল্লাহর ছিল না । তাদের বক্তব্য ছিল ঃ قَالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ "এই হাড়গুলো পঁচেগেলে নষ্ট হয়ে যাবার পর আবার এগুলোকে জীবিত করবে কে? [ইয়াসীন, ৭৮] তাদের এসব বিভিন্ন বক্তব্য একথা প্রমাণ করে যে, এ বিষয়ে তাদের কোন সঠিক জ্ঞান ছিল না । বরং তারা নিছক আন্দাজ – অনুমান ও ধারণার বশবর্তী হয়ে অন্ধকারে তীর ছুঁড়ে যাচ্ছিল । নয়তো এ ব্যাপাওে তাদের কাছে যদি কোন সঠিক জ্ঞান থাকতো তাহলে তারা সবাই একটি বক্তব্যের উপর একমত হতে পারতো ।

২. অর্থাৎ আখেরাত সম্পর্কে যেসব কথা এরা বলে যাচ্ছে এগুলো সবই ভুল। এরা যা কিছু মনে করেছে ও বুঝেছে তা কোনক্রমেই সঠিক নয়।

৩. অর্থাৎ যে বিষয়ে এরা নিজেরা নানা আজেবাজে কথা বলছে ও ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে ফিরছে। সেটি যথার্থ সত্য হয়ে এদের সামনে ফুটে ওঠার সময় মোটেই দূরে নয়। সে সময় এরা জানতে পারবে, রাসূল এদেরকে যে খবর দিয়েছিলেন তা ছিল সঠিক এবং আন্দাজ অনুমানের ভিত্তিতে এরা যেসব কথা তৈরী করছিল তা ছিল ভিত্তিহীন অসার।

৪. যমীনকে মানুষের জন্য বিছানা অর্থাৎ একটি শান্তিময় আবাস ভূমিতে পরিণত করার মধ্যে আল্লাহর যে নির্ভুল ও পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান, ক্ষমতা ও কর্মকুশলতা সক্রিয় রয়েছে সে সম্পর্কে ইতিপূর্বে তাফহীমুল কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ নীচের স্থানগুলো দেখুন : তাফহীমুল কুরআন , আন নামল ৭৩ , ৭৪ ও ৮১ টীকা , ইয়াসীন ২৯ টীকা, আল মু'মিন ৯০ ও ৯১ টীকা, আয যুখরুফ ৭ টীকা, আল জাসিয়াহ ৭ টীকা এবং কাফ ১৮ টীকা।

৫. পৃথিবীতে পাহাড় সৃষ্টির কারণ এবং এর পেছনে আল্লাহর যে কল্যাণ স্পর্শ রয়েছে তা জানার জন্য তাফহীমূল কুরআনের সূরা আন নাহল ১২ টীকা , আন নমল ৭৪ টীকা এবং আল মুরসালাত ১৫ টীকা দেখুন।

৬. মানব জাতিকে নারী ও পুরুষের জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করার মধ্যে সৃষ্টিকর্তার যে মহান কল্যাণ ও উদ্দেশ্যে রয়েছে তা বিস্তারিতভাবে জানার জন্য তাফহীমূল কুরআনের সূরা আল ফুরকান ৬৯ টীকা, আর রুম ২৮ থেকে ৩০ টীকা, ইয়াসীন ৩১ টীকা, আশ শূরা ৭৭ টীকা, আয যুখরুফ ১২ টীকা এবং আল কিয়ামাহ ২৫ টীকা দেখুন।

www.pathagar.com

৭. মানুষকে দুনিয়ায় কাজ করার যোগ্য করার জন্য মহান আল্লাহ্ অত্যন্ত কর্মকুশলতা সহকারে তার প্রকৃতিতে ঘুমের এক অভিলাষ বা চাহিদা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। প্রতি কয়েক ঘন্টা পরিশ্রম করার পর এই চাহিদা আবার তাকে কয়েক ঘন্টা ঘুমাতে বাধ্য করে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানার জন্য পড়ুন তাফহীমুল কুরআনের সূরা আর রুম ৩৩ টীকা।

৮. অর্থাৎ রাতকে অন্ধকার করে দিয়েছি। ফলে আলো থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে তার মধ্যে তোমরা সহজেই ঘুমের প্রশান্তি লাভ করতে সক্ষম হবে। অন্যদিকে দিনকে আলোকোজ্জ্বল করে দিয়েছি। ফলে তার মধ্যে তোমরা অতি সহজেই নিজেদের রুজি রোজগারের জন্য কাজ করতে পারবে। পৃথিবীতে রাত দিনের নিয়মিত ও নিরবিছিন্ন আবর্তনের মধ্যে অসংখ্য কল্যাণ রয়েছে। কিন্তু তার মধ্যে থেকে মাত্র এই একটি কল্যাণের দিকে ইংগিত করার মাধ্যমে মহান আল্লাহ একথা বুঝতে চান যে, এখানে যা কিছু ঘটছে এগুলোর পেছনে উদ্দেশ্য কাজ করছে। তোমাদের নিজেদের শার্থের সাথে এ উদ্দেশ্যের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। তোমাদের অস্তিত্বের গঠন প্রকৃতি নিজের আরাম ও প্রশান্তির জন্য যে অন্ধকারের অভিলাষী ছিল তার জন্যে রাতকে এবং তার জীবিকার জন্য যে আলোর অভিলাষী ছিল তার জন্য দিনকে সরবরাহ করা হয়েছে। তোমাদের প্রয়োজন অনুযায়ী সম্পাদিত এই ব্যবস্থাপনা নিজেই সাক্ষ্য দিয়ে চলছে যে, কোন জ্ঞানময় সত্তার কর্মকৌশল ছাড়া এটা সম্ভবপর হয়নি। (অধিক ব্যাখ্যার জন্য তাফহীমুল কুরআন সূরা ইউনুস ৬৫ টীকা, ইয়াসীন ৩২ টীকা, আল মু'মিন ৮৫ টীকা এবং আয যুখরুফ ৪ টীকা)।

৯. মজবুত বলা হয়েছে এ অর্থে যে, আকাশের সীমান্ত অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে সংঘবদ্ধতার মধ্যে সামান্যতম পরিবর্তনও কখনো হয় না। এ সীমানা পেরিয়ে উর্ধ্ব জগতের অসংখ্য গ্রহ-নক্ষত্রের মধ্য থেকে কোন একটিও কখনো অন্যের সাথে সংঘর্ষ বাধায় না এবং কোনটি কক্ষচ্যুত হয়ে পৃথিবীর বুকে আছড়েও পড়ে না। (অধিক ব্যাখ্যার জন্য পড়ুন তাফহীমুল কুরআন আল-বাকারাহ ৩৪ টীকা,আর-রা'দ ২ টীকা ,আল হিজর ৮ ও ১২ টীকা,আল মু'মিনুন ১৫ টীকা, লুকমান ১৩ টীকা, ইয়াসীন ৩৭ টীকা, আস সাফফাত ৫ ও ৬ টীকা, আল মু'মিন ৯০ টীকা এবং কাফ ৭ও ৮ টীকা)।

১০. এখানে সূর্যের কথা বলা হয়েছে। মূলে (وَهَّاج) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর মানে হচ্ছে অতি উত্তপ্ত আবার অতি উজ্জ্বলও। তাই আয়াতের অনুবাদে আমি দুটো অর্থই ব্যবহার করেছি। এ ছোট বাক্যটির মধ্যে মহান আল্লাহর শক্তি ও

www.pathagar.com

কর্মকুশলতার যে বিরাট নিদর্শনটির দিকে ইংগিত করা হয়েছে সে নিদর্শনটির অর্থাৎ সূর্যের ব্যাস পৃথিবী থেকে ১০৯ গুণ বেশী এবং তার আয়তন পৃথিবীর তুলনায় ৩ লক্ষ ৩৩ হাজার গুণ বড়। তার তাপমাত্রা ১ কোটি ৪০ লক্ষ সেন্টিগ্রেড। পৃথিবী থেকে ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল দূরে অবস্থান করা সত্ত্বেও তার আলোর শক্তি এত বেশী যে ,মানুষ খালি চোখে তার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রাখার চেষ্টা করলে দৃষ্টি শক্তি হারিয়ে ফেলবে। তার উত্তাপ এত বেশী যে পৃথিবীর কোথাও তার উত্তাপের ফলে তাপমাত্রা ১৪০ ডিগ্রী ফারেনহাইট পর্যন্ত পৌঁছে যায়। মহান আল্লাহ তাঁর অসীম জ্ঞান ও সৃষ্টিকুশলতার মাধ্যমে পৃথিবীকে সূর্য থেকে এক ভারসাম্যপূর্ণ দূরত্বে স্থাপন করেছেন। পৃথিবী তার অবস্থানের চাইতে সূর্যের বেশী কাছাকাছি নয় বলে অস্বাভাবিক গরম নয়। আবার বেশী দূরে নয় বলে অস্বাভাবিক ঠান্ডাও নয়। এ কারণে মানুষ, পশু-পাখি ও উদ্ভিদের জীবন ধারণ সম্ভবপর হয়েছে। সূর্য থেকে শক্তির অপরিমেয় ভান্ডার উৎসারিত হয়ে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ছে এবং এ শক্তিই পৃথিবীর বুকে আমাদের জীবন ধারণের উৎস। তারই সাহায্যে আমাদের ক্ষেতে ফসল পাকছে। এবং পৃথিবীর প্রতিটি প্রাণী তার আহার লাভ করছে। তারই উত্তাপে সাগরের পানি বাষ্প হয়ে আকাশে উঠে যায়, তারপর বাতাসের সাহায্যে দুনিয়ার বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ে বারি বর্ষণ করে। এ সূর্যের বুকে মহান সর্বশক্তিমান আল্লাহ এমন বিশাল অগ্নিকুন্ড জ্বালিয়ে রেখেছেন যা কোটি কোটি বছর থেকে সমগ্র সৌরজগতে আলো ,উত্তাপ ও বিভিন্ন প্রকার রশ্মি অব্যাহতভাবে ছড়িয়ে চলছে।

১১. পৃথিবীতে বৃষ্টিপাতের ব্যবস্থাপনা এবং উদ্ভিদের তরতাজা হয়ে ওঠার মধ্যে প্রতিনিয়ত আল্লাহর অসীম ক্ষমতা ও সৃষ্টিকুশলতার যে বিস্ময়কর আত্মপ্রকাশ ঘটে চলছে সে সম্পর্কে তাফহীমুল কুরআনের নিম্নোক্তস্থান সমূহে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছেঃ সূরা আন নাহল ৫৩ টীকা,আল মু'মিনুন ১৭ টীকা,আশ শূ'আরা ৫ টীকা, আর রুম ৩৫ টীকা, ফাতের ১৯ টীকা,ইয়াসীন ২৯ টীকা,আল মু'মিন ২০ টীকা, আয যুখরুফ ১০ -১১ টীকা এবং আল ওয়াকিয়াহ ২৮ থেকে ৩০ টীকা।

www.pathagar.com

১১ রামাদান
বিষয়: পারস্পরিক আচার আচরণ
সূরা হুজুরাত: ১১-১৮

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَومٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلا نِسَاء مِّن نِّسَاء عَسَى أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلا تَنَابَزُوا بِالأَلْقَابِ بِئْسَ الاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (11) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلا تَجَسَّسُوا وَلا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللّهَ إِنَّ اللّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ (12) يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (13) قَالَتِ الأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِن تُطِيعُوا اللّهَ وَرَسُولَهُ لا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (14) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أُوْلَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ (15) قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللّهَ بِدِينِكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (16) يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُل لاَّ تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلامَكُم بَلِ اللّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ (17) إِنَّ اللّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاللّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (18)

১১) হে [১৯] ঈমানদারগণ, পুরুষরা যেন অন্য পুরুষদের বিদ্রুপ না করে। হতে পারে তারাই এদের চেয়ে উত্তম। আর মহিলারাও যেন অন্য মহিলাদের বিদ্রুপ না করে। হতে পারে তারাই এদের চেয়ে উত্তম। [২০] তোমরা একে অপরকে বিদ্রুপ করো না। [২১] এবং পরস্পরকে খারাপ নামে ডেকো না। [২২] ঈমান গ্রহণের পর গোনাহের কাজে প্রসিদ্ধি লাভ করা অত্যন্ত জঘন্য ব্যাপার। [২৩] যারা এ আচরণ পরিত্যাগ করেনি তারাই জালেম।

১২) হে ঈমানদাগণ, বেশী ধারণা ও অনুমান করা থেকে বিরত থাকো। কারণ কোন কোন ধারণা ও অনুমান গোনাহ। [২৪] অপরের দোষ অন্বেষণ করো না। [২৫] আর তোমাদের কেউ যেন কারো গীবত না করে। [২৬] এমন কেউ কি তোমাদের মধ্যে আছে, যে তার নিজের মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া পছন্দ করবে ? [২৭] দেখো, তা খেতে তোমাদের ঘৃণা হয়। আল্লাহকে ভয় করো। আল্লাহ অধিক পরিমাণে তাওবা কবুলকারী এবং দয়ালু।

১৩) হে মানব জাতি, আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ এবং একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি। তারপর তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠীতে বিভক্ত করে দিয়েছি যাতে

www.pathagar.com

তোমরা পরস্পরকে চিনতে পার। তোমাদের মধ্যে যে অধিক পরহেজগার সে-ই প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর কাছে অধিক মর্যাদার অধিকারী।[২৮] নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও সবকিছু সম্পর্কে অবহিত।[২৯]

১৪) এ বেদুঈনরা বলে, "আমরা ঈমান এনেছি"[৩০] তাদের বলে দাও তোমরা ঈমান আননি। বরং বল, আমরা অনুগত হয়েছি।[৩১] ঈমান এখনো তোমাদের মনে প্রবেশ করেনি। তোমরা যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের পথ অনুসরণ করো তাহলে তিনি তোমাদের কার্যবলীর পুরষ্কার প্রদানে কোন কার্পণ্য করবেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু।

১৫) প্রকৃত ঈমানদার তারাই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওপর ঈমান এনেছে এবং এ ব্যাপারে পরে আর কোন সন্দেহ পোষণ করেনি। তারপর প্রাণ ও অর্থ-সম্পদ দিয়ে জিহাদ করেছে। তারাই সত্যবাদী।

১৬) হে নবী! ঈমানের এ দাবীদারদের বলো, তোমরা কি আল্লাহকে তোমাদের দ্বীনের কথা অবগত করাচ্ছো? আল্লাহ তো আসমান ও যমীনের প্রত্যেকটি জিনিস ভালভাবে অবহিত।

১৭) (হে রাসূল!) এরা মনে করে যে, ইসলাম কবুল করে আপনার উপর দয়া করেছে। তাদেরকে বলুন, তোমাদের ইসলাম দ্বারা আমাদের ধন্য করনি। তোমরা যদি ঈমানের দাবীতে সত্যবাদী হয়ে থাক তাহলে (তোমাদের বুঝা উচিত যে,) আল্লাহই ঈমানের দিকে হেদায়াত করে তোমাদেরকে ধন্য করেছেন।

১৮) আল্লাহ আসমান ও যমীনের প্রতিটি গোপনীয় বিষয় সম্পর্কে জানেন। তোমরা যা কিছু করছো তা সবই তিনি দেখছেন।

আয়াত সমূহের ব্যাখ্যা

১৯. পূর্বের দু'টি আয়াতে মুসলমানদের পারস্পরিক লড়াই সম্পর্কে জরুরী নির্দেশনা দেয়ার পর ঈমানদারদেরকে এ অনুভূতি দেয়া হয়েছিল যে, ইসলামের পবিত্রতম সম্পর্কের ভিত্তিতে তারা একে অপরের ভাই এবং আল্লাহর ভয়েই তাদেরকে নিজেদের মধ্যকার সম্পর্ক ঠিক রাখার চেষ্টা করা উচিত। এখন পরবর্তী দু'টি আয়াতে এমন সব বড় বড় অন্যায়ের পথ রুদ্ধ করার নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যা সাধারণত লোকদের পরস্পরিক সম্পর্ক নষ্ট করে দেয়। একে অপরের ইজ্জতের ওপর হামলা, একে অপরকে মনোকষ্ট দেয়া, একে অপরের প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করা এবং একে অপরের দোষ-ত্রুটি তালাশ করা পারস্পরিক শত্রুতা সৃষ্টির এগুলোই মূল কারণ। এসব কারণ অন্যান্য কারনের সাথে মিশে বড় বড় ফিতনার সৃষ্টি করে। এ ক্ষেত্রে পরবর্তী আয়াত সমূহে যেসব নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং তার যেসব ব্যাখ্যা হাদিস সমূহে পাওয়া যায় তার ভিত্তিতে মানহানি (Law of Libel) সম্পর্কিত বিস্তারিত আইন-বিধান রচনা করা যেতে পারে। পাশ্চাত্যের মানহানি সম্পর্কিত আইন এ ক্ষেত্রে এতটাই অসম্পূর্ণ যে, এ আইনের অধীনে কেউ মানহানীর অভিযোগ পেশ করে নিজের মার্যাদা আরো কিছু

www.pathagar.com

খুইয়ে আসে। পক্ষান্তরে ইসলামী আইন প্রত্যেক ব্যক্তির এমন একটি মৌলিক মর্যাদার স্বীকৃতি দেয় যার ওপর কোন আক্রমণ চালানোর অধিকার কারো নেই। এ ক্ষেত্রে হামলা বাস্তবতা ভিত্তিক হোক বা না হোক এবং যার ওপর আক্রমণ করা হয়, জনসমক্ষে তার কোন সুপরিচিত মর্যাদা থাক বা না থাক তাতে কিছু যায় আসে না। এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে অপমান করেছে শুধু এতটুকু বিষয়ই তাকে অপরাধী প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট। তবে এ অপমান করার যদি কোন শরীয়ত সম্মত বৈধতা থাকে তাহলে ভিন্ন কথা।

২০. বিদ্রুপ করার অর্থ কেবল কথার দ্বারা হাসি-তামাসা করাই নয়। বরং কারো কোন কাজের অভিনয় করা, তার প্রতি ইংগিত করা, তার কথা, কাজ, চেহারা বা পোশাক নিয়ে হাসাহাসি করা অথবা তার কোন ত্রুটি বা দোষের দিকে এমনভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাতে অন্যদের হাসি পায়। এ সবই হাসি-তামাসার অন্তর্ভুক্ত। মূলতঃ নিষিদ্ধ বিষয় হলো কেউ যেন কোনভাবেই কাউকে উপহাস ও হাসি-তামাসার লক্ষ্য না বানায়। কারণ, এ ধরনে হাসি-তামাসা ও ঠাট্টা-বিদ্রুপের পেছনে নিশ্চিতভাবে নিজের বড়ত্ব প্রদর্শন এবং অপরের অপমানিত করা ও হেয় করে দেখানোর মনোবৃত্তি কার্যকর। যা নৈতিকভাবে অত্যন্ত দোষনীয়। তাছাড়া এভাবে অন্যের মনোকষ্ট হয় যার কারণে সমাজে বিপর্যয় ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এ কারণেই এ কাজকে হারাম করে দেয়া হয়েছে।

পুরুষ ও নারীদের কথা আলাদা করে উল্লেখ করার অর্থ এ নয় যে, পুরুষদের নারীদেরকে বিদ্রুপের লক্ষ্য বানানো এবং নারীদের পুরুষদের হাসি-তামাসার লক্ষ্য বানানো জায়েয। মূলত যে কারণে নারী ও পুরুষের বিষয় আলাদা করে উল্লেখ করা হয়েছে তা হচ্ছে, ইসলাম এমন সমাজ আদৌ সমর্থন করেনা। যেখানে নারী অবাধে মেলামেশা করতে পারে। অবাধ খোলামেলা মজলিসেই সাধারণত একজন আরেকজনকে হাসি তামাসার লক্ষ্য বানাতে পারে। মুহাররাম নয় এমন নারী পুরুষ কোন মজলিসে একত্র হয়ে পরস্পর হাসি-তামাসা করবে ইসলামে এমন অবকাশ আদৌ রাখা হয়নি। তাই একটি মুসলিম সমাজের একটি মজলিসে পুরুষ কোন নারীকে উপহাস ও বিদ্রুপ করবে কিংবা নারী কোন পুরুষকে বিদ্রুপ ও উপহাস করবে এমন বিষয় কল্পনার যোগ্যও মনে করা হয়নি।

২১. মূল আয়াতে (لمز) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। শব্দটির মধ্যে বিদ্রুপ ও কুৎসা ছাড়াও আরো কিছু সংখ্যক অর্থ এর মধ্যে শামিল। যেমনঃ উপহাস করা, অপবাদ আরোপ করা, দোষ বের করা এবং খোলাখুলি বা গোপনে অথবা ইশারা-ইঙ্গিত করে কাউকে তিরস্কারের লক্ষ্যস্থল বানানো। এসব কাজও যেহেতু পারস্পরিক সুসম্পর্ক নষ্ট করে এবং সমাজে বিপর্যয় সৃষ্টি করে তাই এসব কাজও হারাম করে দেয়া হয়েছে। এখানে আল্লাহর ভাষায় চমৎকারিত্ব এই যে, (لَا يَلْمِزْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا) একে অপরকে বিদ্রুপ করো না। বলার পরিবর্তে (وَلَا تَلْمِزُوْا اَنْفُسَكُمْ) নিজেকে নিজে বিদ্রুপ করো

www.pathagar.com

না। কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে। এর দ্বারা স্বতই একথার ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, অন্যদের বিদ্রুপ ও উপহাসকারী প্রকৃতপক্ষে নিজেকেই বিদ্রুপও উপহাস করে। এ বিষয়টি সুস্পষ্ট যে, যতক্ষন না করো মনে কুপ্রেরণার লাভা জমে উপচে পড়ার জন্য প্রস্তুত না হবে ততক্ষণ তার মুখ অন্যদের কুৎসা রটনার জন্য খুলবে না। এভাবে এ মানসিকতার লালনকারী অন্যদের আগে নিজেকেই তো কুকর্মের আস্তানা বানিয়ে ফেলে। তারপর যখন সে অন্যদের ওপর আঘাত করে তখন তার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, সে তার নিজের ওপর আঘাত করার জন্য অন্যদেরকে আহবান করছে। ভদ্রতার কারণে কেউ যদি তার আক্রমণ এড়িয়ে চলে তাহলে তা ভিন্ন কথা। কিন্তু যাকে সে তার বাক্যবাণের লক্ষ্যস্থল বানিয়েছে সেও পালাক্রমে তার ওপর আক্রমণ করুক এ দরজা সে নিজেই খুলে দিয়েছে।

২২. এ নির্দেশের উদ্দেশ্য হচ্ছে, কোন ব্যক্তিকে এমন নামে ডাকা না হয় অথবা এমন উপাধি না দেয়া হয় যা তার অপছন্দ এবং যা দ্বারা তার অবমাননা ও অমর্যাদা হয়। যেমন কাউকে ফাসেক বা মুনাফিক বলা। কাউকে খোঁড়া, অন্ধ অথবা কানা বলা। কাউকে তার নিজের কিংবা মা-বাপের অথবা বংশের কোন দোষ বা ত্রুটির সাথে সম্পর্কিত করে উপাধি দেয়া। মুসলমান হওয়ার পর তার পূর্ব অনুসৃত ধর্মের কারণে ইহুদী ব খৃষ্টান বলা। কোন ব্যক্তি, বংশ, আত্মীয়তা অথবা গোষ্ঠির এমন নাম দেয়া যার মধ্যে তার নিন্দা ও অপমানের দিকটি বিদ্যমান। তবে যেসব উপাধি বাহ্যত খারাপ কিন্তু তা দ্বারা কারো নিন্দা করা উদ্দেশ্য নয়, রবং ঐ উপাধি দ্বারা যাদের সম্বোধন করা হয় তা তাদের পরিচয়ের সহায়ক এমন সব উপাধি এ নির্দেশের মধ্যে পড়ে না। এ কারণে মুহাদ্দিসগণ "আসমাউর রিজাল" (বা হাদীসের রাবীদের পরিচয় মূলক) শাস্ত্রে সুলায়মান আল আ'মাশ (ক্ষীণ দৃষ্টি সম্পন্ন সুলায়মান) এবং ওয়াসেল আল আহদাব (কুঁজো ওয়াসেল) এর মত নামের উল্লেখ রেখেছেন। যদি একই নামের কয়েকজন লোক থাকে এবং তাদের মধ্যে কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে তার বিশেষ কোন উপাধি দ্বারাই কেবল চেনা যায় তাহলে ঐ উপাধি খারাপ হলেও তা বলা যেতে পারে। যেমন আব্দুল্লাহ নামের যদি কয়েকজন লোক থাকে আর তাদের মধ্যে একজন অন্ধ হয় তাহলে তাকে চেনা সুবিধানর জন্য আপনি অন্ধ আবদুল্লাহ বলতে পারেন। অনুরূপ এমন সব উপাধি বা উপনাম এ নির্দেশের মধ্যে পড়বে না যা দ্বারা বাহ্যত অমর্যাদা বুঝায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা ভালবাসা ও স্নেহবশতই রাখা হয় এবং যাদেরকে এ উপাধি বা উপনামে ডাকা হয় তারা নিজেরাও তা পছন্দ করে। যেমন: আবু হুরাইরা এবং আবু তুরাব।

২৩. ঈমানদার হওয়া সত্ত্বেও সে কটুভাষী হবে এবং অসৎ ও অন্যায় কাজের জন্য বিখ্যাত হবে এটা একজন ঈমানদারের জন্য অত্যন্ত লজ্জাজনক ব্যাপার। কোন কাফের যদি মানুষকে ঠাট্টা-বিদ্রুপ ও উপহাস করা কিংবা বেছে বেছে বিদ্রুপাত্মক নাম দেয়ার ব্যাপারে খুব খ্যাতি লাভ করে তাহলে তা মনুষ্যত্বের বিচারে যদিও সুখ্যাতি নয় তবুও অন্তত তার কুফরীর বিচারে তা মানায়। কিন্তু কেউ আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং আখেরাত

www.pathagar.com

বিশ্বাস করা সত্ত্বেও যদি এরূপ হীন বিশেষণে ভূষিত হয় তাহলে তার জন্য পানিতে ডুবে মরার শামিল।

২৪. একেবারেই ধারণা করতে নিষেধ করা হয়নি। বরং খুব বেশী ধারণার ভিত্তিতে কাজ করতে এবং সব রকম ধারণার অনুসরণ থেকে মানা করা হয়েছে। এর কারণ বলা হয়েছে এই যে, অনেক ধারণা গোনাহের পর্যায়ের পড়ে। এ নির্দেশটি বুঝার জন্য আমাদের বিশ্লেষণ করে দেখা উচিত ধারণা কত প্রকার এবং প্রত্যেক প্রকারের নৈতিক অবস্থা কি?

এক প্রকারের ধারণা হচ্ছে, যা নৈতিকতার দৃষ্টিতে অত্যন্ত পছন্দনীয় এবং দ্বীনের দৃষ্টিতেও কাম্য ও প্রশংসিত। যেমনঃ আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং ঈমানদারদের ব্যাপারে ভাল ধারণা পোষণ করা। তাছাড়া যাদের সাথে ব্যক্তির মেলামেশা ও উঠাবসা আছে এবং যাদের সম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষণের কোন যুক্তিসংগত কারণ নেই।

আরেক প্রকার ধারণা আছে যা বাদ দিয়ে বাস্তব জীবনে চলার কোন উপায় নেই। যেমন আদালতে বিচারকের সামনে যেসব সাক্ষ্য পেশ করা হয় তা যাঁচাই বাছাই করে নিশ্চিত প্রায় ধারণার ভিত্তিতে ফয়সালা করা ছাড়া আদালত চলতে পারে না। কারণ, বিচারকের পক্ষে ঘটনা সম্পর্কে সরাসরি জ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয়। আর সাক্ষ্যের ভিত্তিতে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা নিশ্চিত সত্য হয়না, বরং প্রায় নিশ্চিত ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়। যে ক্ষেত্রে কোন না কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ জরুরী হয়ে পড়ে, কিন্তু বাস্তব জ্ঞান লাভ বাস্তব হয় না। সে ক্ষেত্রে ধারণার ওপর ভিত্তি করে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা ছাড়া মানুষের জন্য আর কোন উপায় থাকে না।

তৃতীয় এক প্রকারের ধারণা আছে যা মূলতঃ খারাপ হলেও বৈধ প্রকৃতির। এ প্রকারের ধারণা গোনাহের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। যেমনঃ কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠির চরিত্র ও কাজ-কর্মে কিংবা তার দৈনন্দিন আচার-আচরণ ও চালচলনে এমন সুস্পষ্ট লক্ষণ ফুটে উঠে যার ভিত্তিতে সে আর ভাল ধারণার যোগ্য থাকে না। বরং তার প্রতি খারাপ ধারণা পোষণের একাধিক যুক্তিসংগত কারণ বিদ্যমান। এরূপ পরিস্থিতিতে শরীয়ত কখনো এ দাবী করে যে, সরলতা দেখিয়ে মানুষ তার প্রতি অবশ্যই ভাল ধারণা পোষণ করবে। তবে বৈধ খারাপ ধারণা পোষণের চূড়ান্তসীমা হচ্ছে তার সম্ভাব্য দুস্কৃতি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। নিছক ধারণার ভিত্তিতে আরো অগ্রসর হয়ে তার বিরুদ্ধে কোন তৎপরতা চালানো ঠিক নয়।

চতুর্থ আরেক প্রকারের ধারণা আছে যা মূলতঃ গোনাহ, সেটি হচ্ছে, বিনা কারণে কারো প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করা কিংবা অন্যদের ব্যাপারে মনস্থির করার বেলায় সবসময় খারাপ ধারণার ওপর ভিত্তি করেই শুরু করা কিংবা এমন লোকদের ব্যাপারে খারাপ ধারণা পোষণ করা যাদের বাহ্যিক অবস্থা তাদের সৎ ও শিষ্ট হওয়ার প্রমাণ দেয়। অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তি কোন কথা বা কাজে যদি ভাল ও মন্দের সমান সম্ভাবনা থাকে কিন্তু খারাপ ধারণার বশবর্তী হয়ে আমরা যদি তা খারাপ হিসেবেই ধরে নেই তাহলে তা গোনাহের কাজ বলে গণ্য হবে। যেমনঃ কোন সৎ ও ভদ্র লোক কোন মাহফিল থেকে

www.pathagar.com

উঠে যাওয়ার সময় নিজের জুতার পরিবর্তে অন্য কারো জুতা উঠিয়ে নেন আমরা যদি ধরে নেই যে, জুতা চুরি করার উদ্দেশ্যেই তিনি এ কাজ করেছেন। অথচ এ কাজটি ভুল করেও হতে পারে। কিন্তু ভাল সম্ভাবনার দিকটি বাদ দিয়ে খারাপ সম্ভাবনার দিকটি গ্রহণ করার কারণ খারাপ ধারণা ছাড়া আর কিছুই নয়।

এ বিশ্লেষণ থেকে একথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, ধারণা করা সর্বদা নিষিদ্ধ বিষয় নয়। বরং কোন কোন পরিস্থিতিতে তা পছন্দনীয়, কোন কোন পরিস্থিতিতে অপরিহার্য, কোন কোন পরিস্থিতিতে একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত জায়েয। কিন্তু ঐ সীমার বাইরে নাজায়েয এবং কোন কোন পরিস্থিতিতে একেবারেই নাজায়েয। তাই একথা বলা হয়নি যে, ধারণা বা খারাপ ধারণা করা থেকে একদম বিরত থাকো। বরং বলা হয়েছে, অধিকমাত্রায় ধারণা করা থেকে বিরত থাকো। তাছাড়া নির্দেশটির উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট করার জন্য আরো বলা হয়েছে, কোন কোন ধারণা গোনাহ। এ সতর্কীকরণ দ্বারা আপনা থেকেই বুঝা যায় যে, যখনই কোন ব্যক্তি ধারণার ভিত্তিতে কোন সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে কিংবা কোন পদক্ষেপ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে তখন তার ভালভাবে যাচাই বাছাই করে দেখা দরকার, যে ধারণা সে পোষণ করেছে তা গোনাহের অন্তর্ভুক্ত নয় তো? আসলেই কি এরূপ ধারণা পোষণের দরকার আছে? এরূপ ধারণা পোষণের জন্য তার কাছে যুক্তিসংগত কারণ আছে কি? সে ধারণার ভিত্তিতে সে যে কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করেছে তা কি বৈধ? যেসব ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে এতটুকু সাবধানতা তারা অবশ্যই অবলম্বন করবে। লাগামহীন ধারণা পোষণ কেবল তাদেরই কাজ যারা আল্লাহর ভয় থেকে মুক্ত এবং আখেরাতের জবাবদিহি সম্পর্কে উদাসীন।

২৫. অর্থাৎ মানুষের গোপন বিষয় তালাশ করোনা। একজন আরেকজনের দোষ খুঁজে বেড়িও না। অন্যদের অবস্থা ও ব্যাপার স্যাপার অনুসন্ধান করে বেড়াবে না। খারাপ ধারণা বশবর্তী হয়ে এ আচরণ করা হোক কিংবা অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে কাউকে ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য করা হোক অথবা শুধু নিজের কৌতুহল ও ঔৎসুক্য নিবারণের জন্য করা হোক শরীয়াতের দৃষ্টিতে সর্বাবস্থায় নিষিদ্ধ। অন্যদের যেসব বিষয় লোকচক্ষুর অন্তরালে আছে তা খোঁজাখুঁজি করা এবং কার কি দোষ-ত্রুটি আছে ও কার কি কি দূর্বলতা গোপন আছে পর্দার অন্তরালে উঁকি দিয়ে তা জানার চেষ্টা করা কোন মু'মিনের কাজ নয়। মানুষের ব্যক্তিগত চিঠিপত্র পড়া, দু'জনের কথোপকথন কান পেতে শোনা, প্রতিবেশীর ঘরে উঁকি দেয়া এবং বিভিন্ন পন্থায় অন্যদের পারিবারিক জীবন কিংবা তাদের ব্যক্তিগত বিষয়াদি খোঁজ করে বেড়ানো একটি বড় অনৈতিক কাজ। এর দ্বারা নানা রকম ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি হয়। এ কারণে একবার নবী (সা) তাঁর খোতবায় দোষ অন্বেষণকারীদের সম্পর্কে বলেছেন:

يا معشر من آمن بلسانه و لم يدخل الإيمان في قلبه ، ، ولا تتبعوا عوراتهم ، فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته ، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته) رواه أبو داود

www.pathagar.com

"হে সেই সব লোকজন, যারা মুখে ঈমান এনেছো কিন্তু এখনো ঈমান তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করেনি, তোমরা মুসলমানদের গোপনীয় বিষয় খুঁজে বেড়িও না। যে ব্যক্তি মুসলমানদের দোষ-ত্রুটি তালাশ করে বেড়াবে আল্লাহ তার দোষ-ত্রুটির অন্বেষণে লেগে যাবেন। আর আল্লাহ যার ত্রুটি তালাশ করেন তাকে তার ঘরের মধ্যে লাঞ্ছিত করে ছাড়েন"। (আবু দাউদ)

হযরত মুয়াবিয়া (রা) বলেন, আমি নিজে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ

أنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم

"তুমি যদি মানুষের গোপনীয় বিষয় জানার জন্য পেছনে লাগো। তাহলে তা তাদের জন্য বিপর্যয় সৃষ্টি করবে কিংবা অন্তত বিপর্যয়ের দ্বার প্রান্তে পৌঁছে দেবে"। (আবু দাউদ)

অপর এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

إذا ظننتم فلا تحققوا (أحكام القرآن – للجصاص)

"তোমাদের মনে করো সম্পর্কে সন্দেহ হলে, অন্বেষণ করো না"। (আহকামুল কুরআন-জাসাস)

অপর একটি হাদীসে নবী (সা) বলেছেনঃ

من رأى عورة فسترها كان كمن أحيا موؤودة من قبرها– الحاكم (الجصاص)

"কেউ যদি কারো গোপন দোষ-ত্রুটি দেখে ফেলে এবং তা গোপন রাখে তাহলে সে যেন একজন জীবন্ত পুঁতে ফেলা মেয়ে সন্তানকে জীবন দান করলো"। (আল জাসাস)।

দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান না করার এ নির্দেশ শুধু ব্যক্তির জন্যই নয়, বরং ইসলামী সরকারের জন্যেও। ইসলামী শরীয়ত নাহী আনিল মুনকারের (মন্দ কাজের প্রতিরোধ) যে দায়িত্ব সরকারের ওপর ন্যস্ত করেছে তার দাবী এ নয় যে, সে একটি গোয়েন্দা চক্র কায়েম করে মানুষের গোপন দোষ-ত্রুটিসমূহ খুঁজে খুঁজে বের করবে এবং তাদেরকে শাস্তি প্রদান করবে। বরং যেসব অসৎ প্রবণতা ও দোষ-ত্রুটি প্রকাশ হয়ে পড়বে কেবল তার বিরুদ্ধেই তার শক্তি প্রয়োগ করা উচিত। গোপনীয় দোষ-ত্রুটি ও খারাপ চালচলন সংশোধনের উপায় গোয়েন্দাগিরি নয়। বরং শিক্ষা, ওয়াজ-নসীহত, জনসাধারণের সামগ্রিক প্রশিক্ষণ এবং একটি পবিত্র সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টির চেষ্টা করাই তার একমাত্র উপায়। এ ক্ষেত্রে হযরত উমরের (রা) এ ঘটনা অতীব শিক্ষাপ্রদ। "একবার রাতের বেলা তিনি এক ব্যক্তির কণ্ঠ শুনতে পেলেন। সে গান গাইতেছিল। তাঁর সন্দেহ হলো। তিনি প্রাচীরে উঠে দেখলেন সেখানে শরাব প্রস্তুত, তার সাথে এক নারীও। তিনি চিৎকার করে বললেনঃ ওরে আল্লাহর দুশমন, তুই কি মনে করেছিস যে, তুই আল্লাহর নাফরমানী করবি আর তিনি তোর গোপনীয় বিষয় প্রকাশ করবেন না? জবাবে সে বললোঃ আমীরুল মু'মিনীন, তাড়াহুড়ো করবেন না। আমি যদি একটি গোনাহ করে থাকি তবে আপনি তিনটি গোনাহ করেছেন। আল্লাহ দোষ-ত্রুটি খুঁজে বেড়াতে নিষেধ

www.pathagar.com

করেছেন। কিন্তু আপনি দোষ-ত্রুটি খুঁজেছেন। আল্লাহ আদেশ দিয়েছেন, দরজা দিয়ে ঘরে প্রবেশ করো। কিন্তু আপনি প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে ঘরে প্রবেশ করেছেন। আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন, নিজের ঘর ছাড়া অনুমতি না নিয়ে অন্যের ঘরে প্রবেশ করো না। কিন্তু আমার অনুমতি ছাড়াই আপনি আমার ঘরে পদার্পণ করেছেন। এ জবাব শুনে হযরত উমর (রা) নিজের ভুল স্বীকার করলেন এবং তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করলেন না। তবে তিনি তার কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নিলেন যে, সে কল্যাণ ও সুকৃতির পথ অনুসরণ করবে। (মাকারিমুল আখলাক-আবু বকর মুহাম্মাদ ইবনে জা'ফর আলী খারায়েতী) এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, খুঁজে খুঁজে মানুষের গোপনীয় দোষ-ত্রুটি বের করা এবং তারপর তাদেরকে পাকড়াও করা শুধু ব্যক্তির জন্যই নয়, ইসলামী সরকারের জন্যও জায়েয নয়। একটি হাদীসেও একথা উল্লিখিত হয়েছে। উক্ত হাদীসে নবী (সা) বলেছেন:

إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم (أبو داؤد)

"শাসকরা যখন সন্দেহের বশে মানুষের দোষ অনুসন্ধান করতে শুরু করে তখন তাদের চরিত্র নষ্ট করে দেয়"। (আবু দাউদ)

তবে কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে যদি খোঁজ-খবর নেয়া ও অনুসন্ধান করা একান্তই প্রয়োজন হয়ে পড়ে, তবে সেটা এ নির্দেশের আওতাভুক্ত নয়। যেমনঃ কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর আচার-আচরণে বিদ্রোহের কিছুটা লক্ষণ সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে। ফলে তারা কোন অপরাধ সংঘটিত করতে যাচ্ছে বলে আশংকা সৃষ্টি হলে সরকার তাদের ব্যাপারে অনুসন্ধান চালাতে পারে। অথবা কোন ব্যক্তিকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়া হয় বা তার সাথে ব্যবসায়িক লেনদেন করতে চায় তাহলে তার ব্যাপারে নিশ্চিত হবার জন্য সে তার সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে ও খোঁজ-খবর নিতে পারে।

২৬. গীবতের সংজ্ঞা হচ্ছে, "কোন ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে তার সম্পর্কে কারো এমন কথা বলা যা শুনলে সে অপছন্দ করবে"। খোদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে গীবতের এ সংজ্ঞা বর্ণিত হয়েছে। মুসলমি, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী এবং আরো অনেক হাদীস বর্ণনাকারী হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। ঐ হাদীসে নবী (সা) গীবতের যে সংজ্ঞা বর্ণনা করেছেন তা হচ্ছেঃ

ذكرك أخاك بما يكره- قيل: افرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته -

"গীবত হচ্ছে, তুমি এমনভাবে তোমার ভাইয়ের কথা বললে যা তার কাছে অপছন্দীয়। প্রশ্ন করা হলো, আমি যা বলছি তা যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে সত্যিই থেকে থাকে তাহলে আপনার মত কি? তিনি বললেনঃ তুমি যা বলছো তা যদি তার মধ্যে থাকে তাহলেই তো তুমি তার গীবত করলে। আর তা যদি না থাকে তাহলে অপবাদ আরোপ করলে"। ইমাম মালেক (র) তাঁর মুয়াত্তা গ্রন্থে হযরত মুত্তালিব ইবনে আবদুল্লাহ থেকে এ বিষয়ে আরও একটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন যার ভাষা নিম্নরূপঃ

www.pathagar.com

أن رجلا سأل رسول الله عليه و سلم ما الغيبة ؟ فقال أن تذكر من المرء ما يكره أن يسمع – فقال يا رسول الله و إن كان حقا ؟ قال إذا قلت باطلا فذلك البهتان –

"এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলো, গীবত কাকে বলে? তিনি বললেনঃ কারো সম্পর্কে তোমার এমন কথা বলা যা তার পছন্দ নয়। সে বললোঃ হে আল্লাহর রাসূল, যদি আমার কথা সত্য হয়? তিনি জবাব দিলেনঃ তোমার কথা মিথ্যা হলে তো সেটা অপবাদ"।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এসব বাণী থেকে প্রমাণিত হয় যে, কারো বিরুদ্ধে তার অনুপস্থিতিতে মিথ্যা অভিযোগ করাই অপবাদ। আর তার সত্য দোষত্রুটি বর্ণনা করা গীবত। এ কাজ স্পষ্ট বক্তব্যের মাধ্যমে করা হোক বা ইশারা ইঙ্গিতের মাধ্যমে করা হোক সর্বাবস্থায় হারাম। অনুরূপভাবে এ কাজ ব্যক্তির জীবদ্দশায় করা হোক বা মৃত্যুর পরে করা হোক উভয় অবস্থায়ই তা সমানভাবে হারাম। আবু দাউদের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, মায়েয ইবনে মালেক আসলামীর বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অপরাধে 'রজম' করার শাস্তি কার্যকর করার পর নবী (সা) পথে চলতে চলতে শুনলেন এক ব্যক্তি তার সংগীকে বলছেঃ এ লোকটার ব্যাপারটাই দেখো, আল্লাহ তার অপরাধ আড়াল করে দিয়েছিলেন। কিন্তু যতক্ষণ না তাকে কুকুরের মত হত্যা করা হয়েছে ততক্ষণ তার প্রবৃত্তি তার পিছু ছাড়েনি। সামনে কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে একটি গাধার গলিত মৃতদেহ দৃষ্টিগোচর হলো। নবী (সা) সেখানে থেমে গেলেন এবং ঐ দু'ব্যক্তিকে ডেকে বললেনঃ "তোমরা দু'জন ওখানে গিয়ে গাধার ঐ মৃত দেহটা আহার করো"। তারা দু'জনে বললোঃ হে আল্লাহর রাসূল, কেউ কি তা খেতে পারে? নবী (সা) বললেনঃ

فما قلتما من عرض أخيكما أنفا أشد من أكل منه

"তোমরা এইমাত্র তোমাদের ভাইয়ের সম্মান ও মর্যাদার ওপর যেভাবে আক্রমণ চালাচ্ছিলে তা গাধার এ মৃতদেহ খাওয়ার চেয়ে অনেক বেশী নোংরা কাজ"।

যেসব ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে বা তার মৃত্যুর পর তার মন্দ দিকগুলো বর্ণনা করার এমন কোন প্রয়োজন দেখা দেয় যা শরীয়তের দৃষ্টিতে সঠিক এবং গীবত ছাড়া ঐ প্রয়োজন পূরণ হতে পারে, আর ঐ প্রয়োজন পূরণের জন্য গীবত না করা হলে তার চেয়েও অধিক মন্দ কাজ অপরিহার্য হয়ে পড়ে এমন ক্ষেত্রসমূহ গীবত হারাম হওয়া সম্পর্কিত নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত নয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ব্যতিক্রমকে মূলনীতি হিসেবে এভাবে বর্ণনা করেছেনঃ

إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق (أبو داؤد)

"কোন মুসলমানের মান-মর্যাদার ওপর অন্যায়ভাবে আক্রমণ করা জঘণ্যতম জুলুম"।

এ বাণীতে "অন্যায়ভাবে" কথাটি বলে শর্তযুক্ত করাতে বুঝা যায় যে, ন্যায়ভাবে এরূপ করা জায়েজ। নবীর (সা) নিজের কর্মপদ্ধতির মধ্যে এমন কয়েকটি নজীর দেখতে পাই

www.pathagar.com

যা থেকে জানা যায় ন্যায়ভাবে বলতে কি বুঝানো হয়েছে এবং কি রকম পরিস্থিতিতে প্রয়োজনে গীবত করা জায়েজ হতে পারে।

একবার এক বেদুঈন এসে নবীর (সা) পিছনে নামাযে শামিল হলো এবং নামায শেষ হওয়া মাত্রই একথা বলে প্রস্থান করলো যে, হে আল্লাহ! আমার ওপর রহম করো এবং মুহাম্মাদের ওপর রহম করো। আমাদের দু'জন ছাড়া আর কাউকে এ রহমতের মধ্যে শরীক করো না। নবী (সা) সাহাবীদের বললেনঃ

أتقولون هو أضل أم بعيره؟ ألم تسمعوا إلى ما قال

"তোমরা কি বলো, এ লোকটাই বেশী বেকুফ, না তার উট? তোমরা কি শুননি সে কি বলেছিলো? (আবু দাউদ)

নবীকে (সা) তাঁর অনুপস্থিতিতেই একথা বলতে হয়েছে। কারণ সালাম ফেরানো মাত্রই সে চলে গিয়েছিল। নবীর উপস্থিতিতেই সে একটি ভুল কথা বলে ফেলেছিলো। তাই এ ব্যাপারে তাঁর নিশ্চুপ থাকা কাউকে এ ভ্রান্তিতে ফেলতে পারতো যে, সময় বিশেষে এরূপ কথা বলা হয় তো জায়েয। তাই নবী (সা) কর্তৃক এ কথার প্রতিবাদ করা জরুরী হয়ে পড়েছিলো।

ফাতেমা বিনতে কায়েস নামক এক মহিলাকে দু'ব্যক্তি বিয়ের প্রস্তাব দেন। একজন হযরত মুয়াবিয়া (রা) অপরজন আবুল জাহম (রা)। ফাতেমা বিনতে কায়েস নবীর (সা) কাছে এসে পরামর্শ চাইলে তিনি বললেনঃ মুয়াবিয়া গরীব আর আবুল জাহম স্ত্রীদের বেদম প্রহার করে থাকে। (বুখারী ও মুসলিম) এখানে একজন নারীর ভবিষ্যত জীবনের প্রশ্ন জড়িত ছিল। সে নবীর (সা) কাছে এ ব্যাপারে পরামর্শ চেয়েছিল। এমতাবস্থায় উভয় ব্যক্তির যে দূর্বলতা ও দোষ-ত্রুটি তাঁর জানা ছিল তা তাকে জানিয়ে দেয়া তিনি জরুরী মনে করলেন।

একদিন নবী (সা) হযরত আয়েশার (রা) ঘরে ছিলেন। এক ব্যক্তি এসে সাক্ষাতের অনুমতি প্রার্থনা করলে তিনি বললেনঃ এ ব্যক্তি তার গোত্রের অত্যন্ত খারাপ লোক। এরপর তিনি বাইরে গেলে এবং তার সাথে অত্যন্ত সৌজন্যের সাথে কথাবার্তা বললেন। নবী (সা) ঘরে ফিরে আসলে হযরত আয়েশা (রা) বললেনঃ আপনি তো তার সাথে ভালোভাবে কথাবার্তা বললেন। অথচ যাওয়ার সময় আপনি তার সম্পর্কে ঐ কথা বলেছিলেন। জবাবে নবী (সা) বললেনঃ

إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه (تركه) الناس اتقاء فحشه

"যে ব্যক্তির কটু বাক্যের ভয়ে লোকজন তার সাথে উঠাবসা পরিত্যাগ করে কিয়ামতের দিন সে হবে আল্লাহ তা'আলার কাছে জঘন্যতম ব্যক্তি"। (বুখারীও মুসলিম)

এ ঘটনা সম্পর্কে যদি চিন্তা করে তাহলে বুঝতে পারবেন ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষণ করা সত্ত্বেও নবী (সা) তার সাথে সুন্দরভাবে কথাবার্তা বলেছেন এ জন্য যে, নবীর (সা) উত্তম স্বভাব এটিই দাবী করে। কিন্তু সাথে সাথে তিনি আশংকা করলেনঃ লোকটির সাথে তাঁকে দয়া ও সৌজন্য প্রকাশ করতে দেখে তার পরিবারের

www.pathagar.com

লোকজন তাঁকে তার বন্ধু বলে মনে করে বসতে পারে। তাহলে পরে কোন সময় সে এর সুযোগ নিয়ে কোন অবৈধ সুবিধা অর্জন করতে পারে। তাই তিনি হযরত আয়েশাকে সতর্ক করে দিলেন যে, সে তার গোত্রের জঘণ্যতম মানুষ।

এক সময় হযরত আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা বিনতে উতবা এসে নবীকে (সা) বললো, "আবু সুফিয়ান একজন কৃপণ লোক। আমার ও আমার সন্তানের প্রয়োজন পূরণের জন্য যথেষ্ট হতে পারে এমন অর্থকড়ি সে দেয় না"। (বুখারী ও মুসলিম) স্বামীর অনুপস্থিতিতে স্ত্রীর পক্ষে থেকে স্বামীর এ ধরনের অভিযোগ যদিও গীবতের পর্যায়ে পড়ে কিন্তু নবী (সা) তা বৈধ করে দিয়েছেন। কারণ জুলুমের প্রতিকার করতে পারে এমন ব্যক্তির কাছে জুলুমের অভিযোগ নিয়ে যাওয়ার অধিকার মজলুমের আছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতের এসব দৃষ্টান্তের আলোকে ফকীহ ও হাদীস বিশারদগণ এ বিধি প্রণয়ন করেছেন যে, গীবত কেবল তখনই বৈধ যখন একটি সঙ্গত (অর্থাৎ শরীয়াতের দৃষ্টিতে সঙ্গত) কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তার প্রয়োজন পড়ে এবং ঐ প্রয়োজন গীবত ছাড়া পূরণ হতে পারে না। সুতরাং এ বিধির ওপর ভিত্তি করে আলেমগণ নিম্নরূপ গীবতকে বৈধ বলে ঘোষণা করেছেন:

এক: যে ব্যক্তি জুলুমের প্রতিকারের জন্য কিছু করতে পারে বলে আশা করা যায় এমন ব্যক্তির কাছে জালেমের বিরুদ্ধে মজলুমের ফরিয়াদ।

দুই: সংশোধনের উদ্দেশ্যে এমন ব্যক্তিদের কাছে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর অপকর্মের কথা বলা যারা তার প্রতিকার করতে পারবেন বলে আশা করা যায়।

তিন: ফতোয়া চাওয়ার উদ্দেশ্যে কোন মুফতির কাছে প্রকৃত ঘটনা বর্ণনার সময় যদি কোন ব্যক্তির ভ্রান্তকাজ-কর্মের উল্লেখ করা প্রয়োজন হয়।

চার: মানুষকে কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের অপকর্মের ক্ষতি থেকে রক্ষা করার জন্য সাবধান করে দেয়া। যেমন: হাদীস বর্ণনাকারী, সাক্ষী এবং গ্রন্থ প্রণেতাদের দূর্বলতা ও ক্রটি-বিচ্যুতি বর্ণনা করা সর্বসম্মত মতে প্রচারণা শুধু জায়েযই নয়, বরং ওয়াজিব। কেননা, এ ছাড়া শরীয়াতকে ভুল রেওয়ায়াতের প্রচারণা ও বিস্তার থেকে, আদালতসমূহকে বেইনসাফী থেকে এবং জনসাধারণ ও শিক্ষার্থীদেরকে গোমরাহী থেকে রক্ষা করা সম্ভব নয়। অথবা উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, কোন ব্যক্তি কারো সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করতে আগ্রহী কিংবা কারো বাড়ীর পাশে বাড়ী খরিদ করতে চায় অথবা কারো সাথে অংশীদারী কারবার করতে চায় অথবা কারো কাছে আমানত রাখতে চায় সে আপনার কাছে পরামর্শ চাইলে তাকে সে ব্যক্তির দোষ-ক্রটি ও ভাল-মন্দ সম্পর্কে অবহিত করা আপনার জন্য ওয়াজিব যাতে না জানার কারণে সে প্রতারিত না হয়।

পাঁচ: যেসব লোক গোনাহ ও পাপকার্যের বিস্তার ঘটাচ্ছে অথবা বিদআত ও গোমরাহীর প্রচার চালাচ্ছে অথবা আল্লাহর বান্দাদেরকে ইসলাম বিরোধী কর্মকান্ড ও জুলুম-

www.pathagar.com

নির্যাতনের মধ্যে নিক্ষেপ করেছে তাদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে সোচ্চার হওয়া এবং তাদের দুষ্কর্ম ও অপকীর্তির সমালোচনা করা।

ছয়ঃ যেসব লোক কোন মন্দ নাম বা উপাধিতে এতই বিখ্যাত হয়েছে যে, ঐ নাম ও উপাধি ছাড়া অন্য কোন নাম বা উপাধি দ্বারা তাদেরকে আর চেনা যায় না তাদের মর্যাদাহানির উদ্দেশ্যে নয়, বরং পরিচয় দানের জন্য ঐ নাম ও উপাধি ব্যবহার করা। (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, ফাতহুল বারী, ১০ম খন্ড, পৃষ্ঠা, ৩৬২;শরহে মুসলিম-নববী, বাবঃ তাহরীমুল গীবাত। রিয়াদুস সালেহীন, বাবঃ মা ইউবাহু মিনাল গীবাত। আহকামুল কুরআন-জাসাস। রুহুল মা'আনী -লা ইয়াগতাব বা'দুকুম বা'দান-আয়াতের তাফসীর)।

এ ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রগুলো ছাড়া অসাক্ষাতে কারো নিন্দাবাদ একেবারেই হারাম। এ নিন্দাবাদ সত্য ও বাস্তব ভিত্তিক হলে তা গীবত, মিথ্যা হলে অপবাদ এবং দু'জনের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে হলে চোগলখুরী। ইসলামী শরীয়াত এ তিনটি জিনিসকেই হারাম করে দিয়েছেন। ইসলামী সমাজে প্রত্যেক মুসলমানদের কর্তব্য হচ্ছে যদি তার সামনে অন্য কোন ব্যক্তির ওপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা হতে থাকে তাহলে সে যেন চুপ করে তা না শোনে বরং তার প্রতিবাদ করে। আর যদি কোন বৈধ শরয়ী প্রয়োজন ছাড়া কারো সত্যিকার দোষ-ত্রুটিও বর্ণনা করা হতে থাকে তাহলে এ কাজে লিপ্ত ব্যক্তিদেরকে আল্লাহর ভয় করতে এবং এ গোনাহ থেকে বিরত থাকতে উপদেশ দিতে হবে।

নবী (সা) বলেছেনঃ

ما من امرئ يخذل امرأ مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته وما من امرئ ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب نصرته – (أبو داؤد)

"যদি কোন ব্যক্তি এমন পরিস্থিতিতে কোন মুসলমানকে সাহায্য না করে যেখানে তাকে লাঞ্ছিত করা হচ্ছে এবং তার মান-ইজ্জতের ওপর হামলা করা হচ্ছে তাহলে আল্লাহ তা'আলাও তাকে সেসব ক্ষেত্রে সাহায্য করবেন না যেখানে সে তার সাহায্যের প্রত্যাশা করে। আর যদি কোন ব্যক্তি এমন পরিস্থিতিতে কোন মুসলমানকে সাহায্য করে যখন তার মান-ইজ্জতের ওপর হামলা করা হচ্ছে এবং তাকে লাঞ্ছিত ও হেয় করা হচ্ছে তাহলে মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ তাকে এমন পরিস্থিতিতে সাহায্য করবেন যখন সে আল্লাহর সাহায্যের প্রত্যাশী হবে"। (আবু দাউদ)।

গীবতকারী ব্যক্তি যখনই উপলব্ধি করবে যে, সে এ গোনাহ করছে অথবা করে ফেলেছে তখন তার প্রথম কর্তব্য হলো আল্লাহর কাছে তাওবা করা এবং এ হারাম কাজ থেকে বিরত থাকা। এরপর তার ওপর দ্বিতীয় যে কর্তব্য বর্তায় তা হচ্ছে, যতদূর সম্ভব এ গোনাহের ক্ষতিপূরণ করা। সে যদি কোন মৃত ব্যক্তির গীবত করে থাকে তাহলে সে

www.pathagar.com

ব্যক্তির মাগফিরাতের জন্য অধিক মাত্রায় দোয়া করবে। যদি কোন জীবিত ব্যক্তির গীবত করে থাকে এবং তা অসত্যও হয় তাহলে যাদের সাক্ষাতে সে এ অপবাদ আরোপ করেছিল তাদের সাক্ষাতেই তা প্রত্যাহার করবে। আর যদি সত্য ও বাস্তব বিষয়ে গীবত করে থাকে তাঁহলে ভবিষ্যতে আর কখনো তার নিন্দাবাদ করবে না। তাছাড়া যার নিন্দাবাদ করেছিল তার কাছে মাফ চেয়ে নেবে।

একদল আলেমের মতে, যার গীবত করা হয়েছে সে যদি এ বিষয়ে অবহিত হয়ে থাকে, কেবল তখনই ক্ষমা চাওয়া উচিত। অন্যথায় যদি অবহিত না থাকে এবং গীবতকারী তার কাছে গিয়ে বলে, আমি তোমার গীবত করেছিলাম তাহলে তা তার জন্য মনোকষ্টের কারণ হবে।

২৭. এ আয়াতাংশে আল্লাহ তা'আলা গীবতকে মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার সাথে তুলনা করে এ কাজের চরম ঘৃণিত হওয়ার ধারণা দিয়েছেন। মৃতের গোশত খাওয়া এমনিতেই ঘৃণার ব্যাপার। সে গোশতও যখন অন্য কোন জন্তুর না হয়ে মানুষের হয়, আর সে মানুষটিও নিজের আপন ভাই হয় তাহলে তো কোন কথাই নেই। তারপর এ উপমাকে প্রশ্নের আকারে পেশ করে আরো অধিক কার্যকর বানিয়ে দেয়া হয়েছে যাতে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের বিবেকের কাছে প্রশ্ন করে নিজেই এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে যে, সে কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে প্রস্তুত আছে? সে যদি তা খেতে রাজি না হয় এবং তার প্রবৃত্তি এতে ঘৃণাবোধ করে তাহলে সে কিভাবে এ কাজ পছন্দ করতে পারে যে, সে তার কোন মু'মিন ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার মান মর্যাদার ওপর হামলা চালাবে যেখানে সে তা প্রতিরোধ করতে পারে না, এমনকি সে জানেও না যে, তাকে বে-ইজ্জতি করা হচ্ছে। এ আয়াতাংশ থেকে একথাও জানা গেল যে, গীবত হারাম হওয়ার মূল কারণ যার গীবত করা হয়েছে তার মনোকষ্ট নয়। বরং কোন ব্যক্তির অসাক্ষাতে তার নিন্দাবাদ করা আদতেই হারাম, চাই সে এ সম্পর্কে অবহিত হোক বা না হোক কিংবা এ কাজ দ্বারা সে কষ্ট পেয়ে থাকুক বা না থাকুক। সবারই জানা কথা, মৃত ব্যক্তির গোশত খাওয়া এ জন্য হারাম নয় যে, তাতে মৃত ব্যক্তির কষ্ট হয়। মৃত্যুর পর কে তার লাশ ছিঁড়ে খাবলে খাচ্ছে তা মৃত ব্যক্তির জানার কথা নয়। কিন্তু সেটা আদতেই অত্যন্ত ঘৃণিত কাজ। অনুরূপ, যার গীবত করা হয়েছে, কোনভাবে যদি তার কাছে খবর না পৌঁছে তাহলে কোথায় কোন ব্যক্তি কখন কাদের সামনে তার মান-ইজ্জতের ওপর হামলা করেছিল এবং তার ফলস্বরূপ কার কার দৃষ্টিতে সে নীচ ও হীন সাব্যস্ত হয়েছিল, তা সে সারা জীবনেও জানতে পারবে না। না জানার কারণে এ গীবত দ্বারা সে আদৌ কোন কষ্ট পাবে না। কিন্তু এতে অবশ্যই তার মর্যাদাহানি হবে। তাই ধরণ ও প্রকৃতির দিক থেকে কাজটি মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া থেকে ভিন্ন কিছু নয়।

২৮. মুসলিম সমাজকে বিভিন্ন অকল্যাণ ও অনাচার থেকে রক্ষা করার জন্য যেসব পথনির্দেশের প্রয়োজন ছিল পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে ঈমানদারদের উদ্দেশ্য করে সেসব পথনির্দেশনা দেয়া হয়েছিল। এখন এ আয়াতে গোটা মানব জাতিকে উদ্দেশ্য করে

www.pathagar.com

একটি বিরাট গোমরাহীর সংশোধন করা হচ্ছে যা আবহমান কাল ধরে বিশ্বব্যাপী বিপর্যয় সৃষ্টির কারণ হিসেবে বিদ্যমান রয়েছে।

অর্থাৎ বংশ, বর্ণ, ভাষা, দেশ এবং জাতীয়তার গোঁড়ামী ও সংকীর্ণতা। প্রাচীনতম যুগ থেকে আজ পর্যন্ত প্রত্যেক যুগে মানুষ সাধারণত মানবতাকে উপেক্ষা করে তাদের চারপাশে কিছু ছোট ছোট বৃত্ত টেনেছে। এ বৃত্তের মধ্যে জন্মগ্রহণকারীদের সে তার আপনজন এবং বাইরে জন্মগ্রহণকারীদের পর বলে মনে করেছে। কোন যৌক্তিক বা নৈতিক ভিত্তির ওপর নির্ভর করে এ বৃত্ত টানা হয়নি বরং টানা হয়েছে জন্মের ভিত্তিতে যা একটি অনিচ্ছাকৃত ব্যাপার মাত্র। কোথাও এর ভিত্তি একই খান্দান, গোত্র ও গোষ্ঠিতে জন্মগ্রহণ করা এবং কোথাও একই ভৌগলিক এলাকায় কিংবা এক বিশেষ বর্ণ অথবা একটি বিশেষ ভাষাভাষী জাতির মধ্যে জন্মগ্রহণ করা। তাছাড়া এসব ভিত্তির ওপর নির্ভর করে আপন ও পরের বিভেদ রেখা টানা হয়েছে। এ মানদন্ডে যাদেরকে আপন বলে মনে করা হয়েছে পরদের তুলনায় তাদের কেবল অধিক ভালবাসা বা সহযোগিতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং এ বিভেদনীতি ঘৃণা, শত্রুতা, তাচ্ছিল্য ও অবমাননা এবং জুলুম ও নির্যাতনের জঘণ্যতম রূপ পরিগ্রহ করেছে। এর সমর্থনে দর্শন রচনা করা হয়েছে। মত ও বিশ্বাস আবিষ্কার করা হয়েছে। আইন তৈরী করা হয়েছে। নৈতিক নীতিমালা রচনা করা হয়েছে। বিভিন্ন জাতি ও রাষ্ট্র এটিকে তাদের স্থায়ী ও স্বতন্ত্র বিধান হিসেবে গ্রহণ করে বাস্তবে অনুসরণ করেছে। এর ভিত্তিতেই ইহুদীরা নিজেদেরকে আল্লাহর মনোনীত সৃষ্টি বলে মনে করেছে এবং তাদের ধর্মীয় বিধি-বিধানে পর্যন্ত অইসরাঈলীদের অধিকার ও মর্যদা ইসরাঈলীদের চেয়ে নিম্ন পর্যায়ে রেখেছে। এ ভেদনীতিই হিন্দুদের মধ্যে বর্ণাশ্রমের জন্ম দিয়েছে যার ভিত্তিতে ব্রাহ্মনদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। উঁচু বর্ণের লোকদের তুলনায় সমস্ত মানুষকে নীচ ও অপবিত্র ঠাওরানো হয়েছে এবং শূদ্রদের চরম লাঞ্ছনার গভীর খাদে নিক্ষেপ করা হয়েছে। কালো ও সাদার মধ্যে পার্থক্য টেনে আফ্রিকা ও আমেরিকায় কৃষ্ণাংগদের ওপর যে অত্যাচার চালানো হয়েছে তা ইতিহাসের পাতায় অনুসন্ধান করার প্রয়োজন নেই বরং আজ এ শতাব্দীতেই প্রতিটি মানুষ তার নিজ চোখে দেখতে পারে। ইউরোপের মানুষ আমেরিকা মহাদেশে প্রবেশ করে রেড ইন্ডিয়ান জাতি গোষ্ঠির সাথে যে আচরণ করেছে এবং এশিয়া ও আফ্রিকার দূর্বল জাতিসমূহের ওপর আধিপত্য কায়েম করে তাদের সাথে যে ব্যবহার করেছে তার গভীরেও এ ধ্যান-ধারণাই কার্যকর ছিল যে, নিজের দেশ ও জাতির গন্ডির বাইরে জন্মগ্রহণকারীদের জান-মাল ও সম্ভ্রম নষ্ট করা তাদের জন্য বৈধ। তাদেরকে লুট করা, ক্রীতদাস বানানো এবং প্রয়োজনে পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার অধিকার তাদের আছে। পাশ্চাত্য জাতিসমূহের জাতিপূজা এক জাতিকে অন্যান্য জাতিসমূহের জন্য যেভাবে পশুতে পরিণত করেছে তার জঘণ্যতম দৃষ্টান্ত নিকট অতীতে সংঘটিত যুদ্ধসমূহেই দেখা গিয়েছে এবং আজও দেখা যাচ্ছে। বিশেষ করে নাৎসী জার্মানদের গোষ্ঠী দর্শন ও নরডিক প্রজাতির শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা বিগত মহাযুদ্ধে যে ভয়াবহ ফল দেখিয়েছে তা স্মরণ রাখলে যে কোন ব্যক্তি অতি সহজেই অনুমান করতে পারবে

www.pathagar.com

যে, তা কত বড় এবং ধ্বংসাত্মক গোমরাহী। এ গোমারাহীর সংশোধনের জন্যই কুরআনের এ আয়াত নাযিল হয়েছে।

এ ছোট্ট আয়াতটিতে আল্লাহ তা'আলা সমস্ত মানুষকে সম্বোধন করে তিনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক সত্য বর্ণনা করেছেন:

এক: তোমাদের সবার মূল উৎস এক। একমাত্র পুরুষ এবং একমাত্র নারী থেকে তোমাদের গোটা জাতি অস্তিত্ব লাভ করেছে। বর্তমানে পৃথিবীতে তোমাদের যত বংশধারা দেখা যায় প্রকৃতপক্ষে তা একটি মাত্র প্রাথমিক বংশধারার বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা যা একজন মা ও একজন বাপ থেকে শুরু হয়েছিল। এ সৃষ্টি ধারার মধ্যে কোথাও এ বিভেদ এবং উঁচু নীচুর কোন ভিত্তি বর্তমান নেই। অথচ তোমরা এ ভ্রান্ত ধারণায় নিমজ্জিত আছো। একই আল্লাহ তোমাদের স্রষ্টা। এমন নয় যে, বিভিন্ন মানুষকে ভিন্ন ভিন্ন খোদা সৃষ্টি করেছেন। একই সৃষ্টি উপকরণ দ্বারা তোমরা সৃষ্টি হয়েছো। এমন নয় যে, কিছু সংখ্যক মানুষ কোন পবিত্র বা মূল্যবান উপাদানের দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে এবং অপর কিছু সংখ্যক কোন অপবিত্র বা নিকৃষ্ট উপাদানের দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে। একই নিয়মে তোমরা জন্মলাভ করেছো। এমনও নয় যে, বিভিন্ন মানুষের জন্মলাভের নিয়ম-পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন। তাছাড়া তোমরা একই পিতা-মাতার সন্তান। এমনটিও নয় যে, সৃষ্টির প্রথম দিককার মানব- দম্পতির সংখ্যা ছিল অনেক এবং তাদের থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ আলাদা আলাদা জন্মলাভ করেছে।

দুই: মূল উৎসের দিক দিয়ে এক হওয়া সত্ত্বেও তোমাদের বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত হওয়া ছিল একটি স্বাভাবিক ব্যাপার। একথা স্পষ্ট যে, সমগ্র বিশ্বে গোটা মানব সমাজের একটি মাত্র বংশধারা আদৌ হতে পারতো না। বংশ বৃদ্ধির সাথে সাথে বিভিন্ন খান্দান ও বংশধারার সৃষ্টি হওয়া এবং তারপর খান্দানের সমন্বয়ে গোত্র ও জাতিসমূহের পত্তন হওয়া অপরিহার্য ছিল। অনুরূপ পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বসতি স্থাপনের পর বর্ণ, দেহাকৃতি, ভাষা এবং জীবন যাপন রীতিও অবশ্যম্ভাবীরূপে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে যাওয়ার কথা। একই ভু-খন্ডের বসবাসকারীরা পরস্পর ঘনিষ্ঠ এবং দূর-দূরান্তের ভু-খন্ডে বসবাসকারীদের মধ্যে পরস্পর ব্যবধান সৃষ্টি হওয়ার কথা। কিন্তু প্রকৃতিগত এ পার্থক্য ও ভিন্নতার দাবী এ নয় যে, এর ভিত্তিতে উঁচু ও নীচু, ইতর ও ভদ্র, এবং শ্রেষ্ঠ ও নিকৃষ্ট হওয়ার ভেদাভেদ সৃষ্টি হবে, একটি বংশধারা আরেকটি বংশধারার ওপর কৌলিন্যের দাবী করবে, এক বর্ণের লোক অন্য বর্ণের লোকদের হেয় ও নীচ মনে করবে, এক জাতি অন্য জাতির ওপর নিজের শ্রেষ্ঠত্ব ও আভিজাত্য কায়েম করবে এবং মানবাধিকারের ক্ষেত্রে এক জাতি অন্য জাতির ওপর অগ্রাধিকার লাভ করবে। যে কারণে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ মানব গোষ্ঠীসমূহকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রের আকারে বিন্যস্ত করেছিলেন তা হচ্ছে, তাদের মধ্যে পারস্পরিক জানা শোনা ও সহযোগিতার জন্য এটাই ছিল স্বাভাবিক উপায়। এ পদ্ধতিতে একটি পরিবার, একটি প্রজাতি একটি গোত্র এবং একটি জাতির লোক মিলে একটি সম্মিলিত সমাজ গড়তে এবং জীবনের বিভিন্ন ব্যাপারে

www.pathagar.com

একে অপরের সাহায্যকারী হতে পারতো। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি প্রকৃতি যেসব জিনিসকে পারস্পরিক পরিচয়ের উপায় বানিয়েছিল শুধু শয়তানী ও মুর্খতা সে জিনিসকে গর্ব ও ঘৃণার উপকরণ বানিয়ে নিয়েছে এবং বিষয়টিকে অত্যাচার ও সীমালংঘনের পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছে।

তিন: মানুষের মধ্যে মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের বুনিয়াদ যদি কিছু থেকে থাকে এবং হতে পারে তাহলে তাহচ্ছে নৈতিক মর্যাদা। জন্মগতভাবে সমস্ত মানুষ সমান। কেননা, তাদের সৃষ্টিকর্তা এক, তাদের সৃষ্টির উপাদান ও সৃষ্টির নিয়ম-পদ্ধতিও এক এবং তাদের সবার বংশধারা একই পিতা-মাতা পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে। তাছাড়া কোন ব্যক্তির কোন বিশেষ দেশ, জাতি অথবা জাতি-গোষ্ঠীতে জন্মলাভ করা একটি কাকতালীয় ব্যাপার মাত্র। এতে তার ইচ্ছা, পছন্দ বা চেষ্টা-সাধনার কোন দখল নেই। একদিক দিয়ে কোন ব্যক্তির অন্য কোন ব্যক্তির ওপর মর্যাদা লাভের কোন যুক্তিসংগত কারণ নেই। যে মূল জিনিসের ভিত্তিতে এক ব্যক্তি অপর সব ব্যক্তিদের ওপর মর্যাদা লাভ করতে পারে তা হচ্ছে, সে অন্য সবার তুলনায় অধিক আল্লাহ ভীরু, মন্দ ও অকল্যাণ থেকে দূরে অবস্থানকারী এবং নেকী ও পবিত্রতার পথ অনুগমনকারী। এরূপ ব্যক্তি যে কোন বংশ, যে কোন জাতি এবং যে কোন দেশেরই হোক না কেন সে তার ব্যক্তিগত গুণাবলীর কারণে সম্মান ও মর্যদার পাত্র। যার অবস্থা এর বিপরীত সর্বাবস্থায়ই সে একজন নিকৃষ্টতর মানুষ। সে কৃষ্ণাঙ্গ হোক বা শ্বেতাঙ্গ হোক এবং প্রাচ্যে জন্মলাভ করে থাকুক বা পাশ্চাত্যে তাতে কিছু এসে যায় না।

এ সত্য কথাগুলোই যা কুরআনের একটি ছোট্ট আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা তাঁর বিভিন্ন বক্তৃতা ও উক্তিতে আরো স্পষ্ট করে বর্ণনা করেছেন। মক্কা বিজয়ের সময় কা'বা তাওয়াফের পর তিনি যে বক্তৃতা করেছিলেন তাতে বলেছিলেন:

الحمد لله الذي أذهب عنكم عيبة الجاهلية و تكبرها – يا أيها الناس ، الناس رجلان ، بر تقي كريم على الله ، و فاجر شقي هين على الله – الناس كلهم بنو آدم و خلق الله آدم من تراب (البيهقي في شعب الإيمان – و الترمذي)

"সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি তোমাদের থেকে জাহেলিয়াতের দোষ-ত্রুটি ও অহংকার দূর করে দিয়েছেন। হে লোকেরা! সমস্ত মানুষ দু'ভাগে বিভক্ত। **এক:** নেক্কার ও পরহেজগার-যারা আল্লাহর দৃষ্টিতে মর্যাদার অধিকারী। **দুই:** পাপী ও দূরাচার যারা আল্লাহর দৃষ্টিতে নিকৃষ্ট। অন্যথায়, সমস্ত মানুষই আদমের সন্তান। আর আদম মাটির সৃষ্টি"। (বায়হাকী -ফী শুআবিল ঈমান, তিরমিযী)

বিদায় হজ্জের সময় আইয়ামে তাশরীকের মাঝামাঝি সময়ে নবী (সা) বক্তৃতা করেছিলেন। তাতে তিনি বলেছিলেন:

www.pathagar.com

يا أيها الناس ، إن ربكم واحد - لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأسود على أحمر ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم- ألا هل بَلَّغتُ ؟ قالوا بلى يا رسول الله ، قال فليبلغ الشاهد الغائب (البيهقي)

"হে লোকজন! সাবধান! তোমাদের আল্লাহ একজন। কোন অনারবের ওপর কোন আরবের ও কোন আরবের ওপর কোন অনারবের কোন কৃষ্ণাঙ্গের ওপর শ্বেতাঙ্গের ও কোন শ্বেতাঙ্গের ওপর কৃষ্ণাঙ্গের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই, আল্লাহভীতি ছাড়া। তোমাদের মধ্যে যে সবচেয়ে বেশী আল্লাহভীরু সে-ই আল্লাহর কাছে সর্বাধিক মর্যাদাবান। বলো, আমি কি তোমাদের কাছে আল্লাহর বাণী পৌঁছিয়ে দিয়েছি? সবাই বললোঃ হ্যাঁ, হে আল্লাহর রসূল (সাঃ)। তিনি বললেন, তাহলে যারা এখানে উপস্থিত আছে তারা যেন অনুপস্থিত লোকদের কাছে এ বাণী পৌঁছে দেয়"। (বায়হাকী)

একটি হাদীসে নবী (সা) বলেছেনঃ

"তোমরা সবাই আদমের সন্তান। আর আদমকে মাটি দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছিল। লোকজন তাদের বাপদাদার নাম নিয়ে গর্ব করা থেকে বিরত হোক। তা না হলে আল্লাহর দৃষ্টিতে তারা নগণ্য কীট থেকেও নীচ বলে গণ্য হবে"। (বাযাযার)

আর একটি হাদীসে তিনি বলেছেনঃ

"আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তোমাদের বংশ ও আভিজাত্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন না। তোমাদের মধ্যে যে বেশী আল্লাহভীরু সে-ই আল্লাহর কাছে সর্বাধিক মর্যাদার অধিকারী"। (ইবনে জারীর)

আরো একটি হাদীসের ভাষা হচ্ছেঃ

"আল্লাহ তা'আলা তোমাদের চেহারা-আকৃতি ও সম্পদ দেখেন না, বরং তিনি তোমাদের অন্তর ও কাজ-কর্ম দেখেন"। (মুসলিম ও ইবনে মাজাহ)

এসব শিক্ষা কেবল কথার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। বরং সে শিক্ষা অনুসারে ইসলাম ঈমানদারদের একটি বিশ্বভ্রাতৃত্ব বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত করে দেখিয়ে দিয়েছে। যেখানে বর্ণ, বংশ, ভাষা, দেশ ও জাতীয়তার কোন ভেদাভেদ নেই, যেখানে উঁচু নীচু, ছুত-ছাত এবং বিভেদ ও পক্ষপাতিত্বের কোন স্থান নেই এবং যেকোন জাতি, গোষ্ঠী ও দেশেরই হোক না কেন সেখানে সমস্ত মানুষ সম্পূর্ণ সমান অধিকার নিয়ে শরীক হতে পারে এবং হয়েছে। ইসলামের বিরোধীদেরও একথা স্বীকার করতে হয়েছে যে, মানবিক সাম্য ও ঐক্যের নীতিমালাকে মুসলিম সমাজে যেভাবে সফলতার সাথে বাস্তব রূপদান করা হয়েছে বিশ্বের আর কোন ধর্ম ও আদর্শে কখনো তার কোন নজির পরিলক্ষিত হয়নি। একমাত্র ইসলাম সেই আদর্শ যা বিশ্বের সমগ্র অঞ্চলে ও আনাচে কানাচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অসংখ্য জাতিগোষ্ঠীকে মিলিয়ে একটি জাতি বানিয়ে দিয়েছে। এ পর্যায়ে একটি ভ্রান্ত ধারণা দূর করাও অত্যন্ত জরুরী। বিয়ে-শাদীর ব্যাপারে ইসলামী আইন 'কুফ' বা

www.pathagar.com

'সমবংশ' হওয়ার প্রতি যে গুরুত্ব আরোপ করে, কিছু লোক তার অর্থ গ্রহণ করে এই যে, কিছুসংখ্যক জ্ঞাতি গোষ্ঠী আছে কুলীন ও অভিজাত এবং কিছু সংখ্যক ইতর ও নীচ। তাদের পরস্পরের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক আপত্তিজনক। প্রকৃতপক্ষে এটি একটি ভ্রান্ত ধারণা। ইসলামী আইন অনুসারে প্রত্যেক মুসলমান পুরুষেরর প্রত্যেক মুসলমান নারীর সাথে বিয়ে হতে পারে। তবে দাম্পত্য জীবনের সফলতা স্বামী-স্ত্রীর অভ্যাস, আচার-আচরণ, জীবন যাপন পদ্ধতি, পারিবারিক ও বংশগত ঐতিহ্য এবং আর্থিক ও সামাজিক পরিবেশের ক্ষেত্রে সর্বাধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ার ওপর নির্ভর করে যাতে তারা পরস্পরের সাথে ভালভাবে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। 'কুফু' বা সমবংশ হওয়ার মূল লক্ষ্য এটিই। যেখানে পুরুষ ও নারীর মধ্যে এদিক দিয়ে অনেক বেশী দূরত্ব হবে সেখানে জীবনব্যাপী বিস্তৃত বন্ধুত্বের সম্পর্ক বনিবনার আশা কমই করা যায়। তাই ইসলামী আইন এ রকম দাম্পত্য বন্ধনকে পছন্দ করে না। এখানে আশরাফ ও আতরাফের কোন প্রশ্নই নেই। বরং উভয়ের অবস্থার মধ্যে যদি স্পষ্ট পার্থক্য ও ভিন্নতা থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে বৈবাহিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হলে দাম্পত্য জীবন ব্যর্থ হওয়ার অধিক সম্ভাবনা থাকে।

২৯. অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে কে গুণাবলীর দিক দিয়ে উঁচু মর্যাদা সম্পন্ন মানুষ আর কে নীচু মর্যাদার মানুষ তা আল্লাহই ভাল জানেন। মানুষ নিজেরা নিজেদের উঁচু নীচুর যে মানদন্ড বানিয়ে রেখেছে তা আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। হতে পারে দুনিয়াতে যাকে অনেক উঁচু মর্যাদার মানুষ মনে করা হতো আল্লাহর চূড়ান্ত ফয়সালায় সে অতি নীচুস্তরের মানুষ হিসেবে সাব্যস্ত হবে এবং যাকে এখানে অতি নগণ্য মনে করা হয়েছে সেখানে সে অনেক উঁচু মর্যাদা লাভ করবে। আসল গুরুত্ব দুনিয়ার সম্মান ও লাঞ্ছনার নয়, বরং কেউ আল্লাহর কাছে যে সম্মান ও লাঞ্ছনা লাভ করবে তার। তাই যেসব গুণাবলী আল্লাহর কাছে মর্যাদা লাভের উপযুক্ত বানাতে পারে নিজের মধ্যে সেসব বাস্তব গুণাবলী সৃষ্টির জন্য মানুষের সমস্ত চিন্তা নিয়োজিত হওয়া উচিত।

৩০. এর অর্থ বেদুঈন নয়। বরং এখানে কতিপয় বিশেষ বেদুঈন গোষ্ঠীর উল্লেখ করা হচ্ছে যারা ইসলামের ক্রমবর্ধমান শক্তি দেখে এই ভেবে মুসলমান হয়ে যায় যে, মুসলমানদের আঘাত থেকেও নিরাপদ থাকবে এবং ইসলামী বিজয় থেকে সুবিধাও ভোগ করবে। এসব লোক প্রকৃতপক্ষে সরল মনে ঈমান গ্রহণ করেনি। শুধু ঈমানের মৌখিক অঙ্গীকার করে তারা উদ্দেশ্যমূলকভাবে নিজেদেরকে মুসলমানদের অন্তরভুক্ত করে নিয়েছিল। তাদের এ গোপন মানসিক অবস্থা তখনই ফাঁস হয়ে যেতো যখন তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে সে নানা রকমের দাবী-দাওয়া পেশ করতো এবং এমনভাবে নিজেদের অধিকার ফলাতো যে, ইসলাম গ্রহণ করে তারা যেন রাসূলের (সা) মস্তবড় উপকার সাধন করেছে। বিভিন্ন রেওয়ায়াতে কয়েকটি গোষ্ঠির এ আচরণের উল্লেখ আছে। যেমনঃ মুযাইনা, জুহাইনা, আসলাম, আশজা, গিফার, ইত্যাদি গোত্রসমূহ। বিশেষ করে বনী আসাদ ইবনে খুযায়মা গোত্র সম্পর্কে ইবনে আব্বাস এবং

www.pathagar.com

সাঈদ ইবনে জুবায়ের বর্ণনা করেছেন যে, একবার দুর্ভিক্ষের সময় তারা মদিনায় এসে আর্থিক সাহায্য দাবী করে বারবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে লাগলো: আমরা যুদ্ধ-বিগ্রহ ছাড়াই মুসলমান হয়েছি, অমুক ও অমুক গোত্র যেমন যুদ্ধ করেছে আমরা আপনার বিরুদ্ধে তেমন যুদ্ধ করিনি। একথা বলার পেছনে তাদের পরিষ্কার উদ্দেশ্য ছিল এই যে, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করা এবং ইসলাম গ্রহণ করা যেন তাদের একটি বড় দান। তাই রাসূল ও ঈমানদারদের কাছে এর বিনিময় তাদের পাওয়া উচিত। মদীনার আশেপাশের বেদুঈন গোষ্ঠিসমূহের এ আচরণ ও কর্মনীতি সম্পর্কে এ আয়াতগুলোতে সমালোচনা ও পর্যালোচনা করা হয়েছে। এ সমালোচনা ও পর্যালোচনার সাথে সূরা তাওবার ৯০ থেকে ১১০ আয়াত এবং সূরা ফাতহের ১১ থেকে ১৭ আয়াত মিলিয়ে পড়লে এ বিষয়টি আরো ভালভাবে উপলব্ধি করা যেতে পারে।

৩১.এর আরেকটি অনুবাদ হতে পারে, "বলো, আমরা মুসলমান হয়ে গিয়েছি" এ আয়াতাংশ থেকে কোন কোন লোক এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যে, কুরআন মজীদের ভাষায় "মু'মিন' ও 'মুসলিম' দু'টি বিপরীত অর্থ জ্ঞাপক পরিভাষা। মু'মিন সে ব্যক্তি যে সরল মনে ঈমান আনয়ন করেছে এবং মুসলিম সে ব্যক্তি যে ঈমান ছাড়াই বাহ্যিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করেছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ ধারণা একেবারেই ভ্রান্ত। এখানে অবশ্য ঈমান শব্দটি আন্তরিক বিশ্বাস এবং ইসলাম কেবল বাহ্যিক আনুগত্য বুঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবে এমনটি বুঝে নেয়া ঠিক নয় যে, এ দুটি শব্দ কুরআন মজীদের দুটি স্থায়ী ও বিপরীত অর্থজ্ঞাপক পরিভাষা। কুরআনের যেসব আয়াতে ইসলাম ও মুসলিম শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। তা বিশ্লেষণ করলে একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা মানব জাতির জন্য যে জীবন বিধান নাযিল করেছেন কুরআনের পরিভাষায় তার নাম ইসলাম। ঈমান ও আনুগত্য উভয়টি এর অন্তর্ভুক্ত। আর মুসলিম সে ব্যক্তি যে সরল মনে মেনে নেয় এবং কার্যত আনুগত্য করে। প্রমাণ স্বরূপ নিম্নে বর্ণিত আয়াতগুলো দেখুন:

"নিশ্চিতভাবেই আল্লাহর মনোনীত দ্বীন ইসলাম"। (আলে ইমরান, ১৯)

"যে ইসলাম ছাড়া অন্য কোন জীবন ব্যবস্থা চায় তার সেই জীবন ব্যবস্থা কখনো গ্রহণ করা হবে না"। (আলে ইমরান, ৮৫)।

"আমি তোমাদের জীবন বিধান হিসেবে ইসলামকে মনোনীত করেছি"। (আল মায়েদা, ৩)

"আল্লাহ যাকে হিদায়াত দান করতে চান তার হৃদয়-মনকে ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দেন"। (আনআম, ১২৫)

"হে নবী! বলে দাও, আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যাতে আমি সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী হই"। (আনআম, ১৪)

www.pathagar.com

"এরপর তারা যদি ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে হিদায়াত প্রাপ্ত হলো"। (আলে ইমরান, ২০)

"সমস্ত নবী, যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তাওরাত অনুসারে ফায়সালা করতেন"। (আল মায়েদা, ৪৪)।

এসব আয়াতে এবং এ ধরনের আরো বহু আয়াতে ইসলাম গ্রহণের অর্থ কি ঈমান বিহীন আনুগত্য করা? একইভাবে 'মুসলিম' শব্দটি যে অর্থে বারবার ব্যবহার করা হয়েছে তার জন্য নমুনা হিসেবে নিম্ন বর্ণিত আয়াতসমূহ দেখুন:

"হে ঈমান গ্রহণকারীগণ! আল্লাহকে ভয় করার মত ভয় করো। আর মুসলিম হওয়ার আগেই যেন তোমাদের মৃত্যু না আসে"। (আলে ইমরান, ১০২)।

"তিনি এর পূর্বেও তোমাদের নামকরণ করেছিলেন মুসলিম। তাছাড়া এ কিতাবেও"। (আল হাজ্ব, ৭৮)

"ইবরাহীম ইহুদী বা খৃস্টান কোনটাই ছিলেন না। তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ মুসলিম"। (আলে ইমরান, ৬৭)

"কা'বা ঘর নির্মাণের সময় হযরত ইবরাহীম ও ইসমাঈলের দোয়া) হে আমাদের রব, আমাদের দু'জনকেই তোমার অনুগত বানাও এবং আমাদের বংশ থেকে এমন একটি উম্মত সৃষ্টি করো যারা তোমার অনুগত হবে"। (আল বাকারা, ১২৮)।
[নিজের সন্তাদেরকে হযরত ইয়াকূবের (আ) অসীয়ত] হে আমার সন্তানেরা, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য এ জীবন বিধানকেই মনোনীত করেছেন। অতএব, মুসলিম হওয়ার আগে যেন তোমাদের মৃত্যু না আসে"। (আল বাকারা, ১৩২)।

এসব আয়াত পাঠ করে এমন ধারণা কে করতে পারে যে, এতে উল্লিখিত মুসলিম শব্দের দ্বারা এমন লোককে বুঝানো হয়েছে যে বাহ্যত ইসলাম গ্রহণ করলেও আন্তরিকভাবে তা মানে না? সুতরাং কুরআনের পরিভাষা অনুসারে ইসলাম অর্থ ঈমানহীন আনুগত্য এবং কুরআনের ভাষায় কেবল বাহ্যিকভাবে ইসলাম গ্রহণকারীকেই মুসলিম বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে এরূপ দাবী করাও চরম ভুল। অনুরূপভাবে এ দাবী করাও ভুল যে, কুরআন মজীদে উল্লিখিত ঈমান ও মু'মিন শব্দ দু'টি নি:সন্দেহে এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। তবে এমন অনেক স্থানও আছে যেখানে এ শব্দ ঈমানের বাহ্যিক স্বীকৃতি বুঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে। যারা মৌখিক স্বীকারোক্তির মাধ্যমে মুসলমানের দলে শামিল হয়েছে। (يا ايها الذين امنوا) বলে তাদেরকেই সম্বোধন করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে তারা সত্যিকার মু'মিন, না দূর্বল ঈমানের অধিকারী না মুনাফিক তা বিচার করা হয়নি। এর বহুসংখ্যক উদাহরণের মধ্য থেকে মাত্র কয়েকটির জন্য দেখুন, আলে ইমরান, আয়াত, ১৫৬; আন নিসা, ১৩৬; আল মায়েদা, ৫৪; আল আনফাল, ২০ থেকে ২৭; আত তাওবা, ৩৮; আল হাদীদ, ২৮; আস -সফ, ২০।

www.pathagar.com

১২ রামাদান

বিষয়ঃ আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল আর সূদকে হারাম করেছেন

সূরা বাক্বারাহঃ ২৭৫-২৮১

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (275) يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ (276) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ (277) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (278) فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ (279) وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (280) وَاتَّقُواْ يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ (281)

২৭৫) কিন্তু যারা সুদ খায় [৩১৫] তাদের অবস্থা হয় ঠিক সেই লোকটির মতো যাকে শয়তান স্পর্শ করে পাগল করে দিয়েছে। [৩১৬] তাদের এই অবস্থায় উপনীত হবার কারণ হচ্ছে এই যে, তারা বলেঃ "ব্যবসা তো সুদেরই মতো"। [৩১৭] অথচ আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করে দিয়েছেন এবং সুদকে করেছেন হারাম। [৩১৮] কাজেই যে ব্যক্তির কাছে তার রবের পক্ষ থেকে এই নসীহত পৌঁছে যায় এবং ভবিষ্যতে সুদখোরী থেকে সে বিরত হয়, সে ক্ষেত্রে যা কিছু সে খেয়েছে তাতো খেয়ে ফেলেছেই এবং এ ব্যাপারটি আল্লাহর কাছে সোপর্দ হয়ে গেছে। [৩১৯] আর এই নির্দেশের পরও যে ব্যক্তি আবার এই কাজ করে, সে জাহান্নামের অধিবাসী। সেখানে সে থাকবে চিরকাল।

২৭৬) আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দানকে বর্ধিত ও বিকশিত করেন। [৩২০] আর আল্লাহ অকৃতজ্ঞ দুষ্কৃতকারীকে পছন্দ করেন না। [৩২১]

২৭৭) অবশ্যই যারা ঈমান আনে, সৎকাজ করে, নামায কায়েম করে ও যাকাত দেয়, তাদের প্রতিদান নিঃসন্দেহে তাদের রবের কাছে আছে এবং তাদের কোন ভয় ও মর্মজ্বালাও নেই। [৩২২]

২৭৮) হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় করো এবং লোকদের কাছে তোমাদের যে সুদ বাকি রয়ে গেছে তা ছেড়ে দাও, যদি যথার্থই তোমরা ঈমান এনে থাকো।

২৭৯) কিন্তু যদি তোমরা এমনটি না করো তাহলে জেনে রাখো, এটা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা। [৩২৩] এখনো তাওবা করে নাও

www.pathagar.com

(এবং সুদ ছেড়ে দাও) তাহলে তোমরা আসল মূলধনের অধিকারী হবে। তোমরা জুলুম করবে না এবং তোমাদের ওপর জুলুম করাও হবে না।

২৮০) তোমাদের ঋণগ্রহীতা অভাবী হলে সচ্ছলতা লাভ করা পর্যন্ত তাকে অবকাশ দাও। আর যদি সাদকা করে দাও, তাহলে এটা তোমাদের জন্য বেশী ভালো হবে, যদি তোমরা জানতে। [৩২৪]

২৮১) যেদিন তোমরা আল্লাহর দিকে ফিরে আসবে সেদিনের অপমান ও বিপদ থেকে বাঁচো। সেখানে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার উপার্জিত সৎকর্মের ও অপকর্মের পুরোপুরি প্রতিদান দেয়া হবে এবং কারো ওপর কোন জুলুম করা হবে না।

আয়াত সমূহের ব্যাখ্যা

৩১৫. মূল শব্দটি হচ্ছে 'রিবা'। আরবী ভাষায় এর অর্থ বৃদ্ধি। পারিভাষিক অর্থে আরবরা এ শব্দটি ব্যবহার করে এমন এক বর্ধিত অংকের অর্থের জন্য, যা ঋণদাতা ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে একটি স্থিরীকৃত হার অনুযায়ী মূল অর্থের বাইরে আদায় করে থাকে। আমাদের ভাষায় একেই বলা হয় সুদ। কুরআন নাযিলের সময় যেসব ধরনের সুদী লেনদেনের প্রচলন ছিল সেগুলোকে নিম্নোক্তভাবে উপস্থাপন করা যায়। যেমন, এক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তির হাতের কোন জিনিস বিক্রি করতো এবং দাম আদায়ের জন্য সময়সীমা নির্ধারণ করে দিতো। সময়সীমা অতিক্রম করার পর যদি দাম আদায় না হতো, তাহলে তাকে আবার বাড়তি সময় দিতো এবং দাম বাড়িয়ে দিতো। অথবা যেমন, একজন অন্য একজনকে ঋণ দিত। ঋণদাতার সাথে চুক্তি হতো, ওমুক সময়ের মধ্যে আসল থেকে এই পরিমাণ অর্থ বেশী দিতে হবে। অথবা যেমন, ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতার মধ্যে একটি বিশেষ সময়সীমার জন্য একটি বিশেষ হার স্থিরীকৃত হয়ে যেতো। ঐ সময়সীমার মধ্যে বর্ধিত অর্থসহ আসল অর্থ আদায় না হলে আগের থেকে বর্ধিত হারে অতিরিক্ত সময় দেয়া হত। এই ধরনের লেনদেনের ব্যাপারে এখানে বর্ণনা করা হয়েছে।

৩১৬. আরবরা পাগল ও দেওয়ানাকে বলতো 'মজনূন' (অর্থাৎ জিন বা প্রেতগ্রস্ত)। কোন ব্যক্তি পাগল হয়ে গেছে, একথা বলার প্রয়োজন দেখা দিলে তারা বলতো, ওমুককে জিনে ধরেছে। এই প্রবাদটি ব্যবহার করে কুরআন সুদখোরকে এমন এক ব্যক্তির সাথে তুলনা করেছে যার বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়ে গেছে। অর্থাৎ বুদ্ধিভ্রষ্ট ব্যক্তি যেমন ভারসাম্যহীন কথা বলতে ও কাজ করতে শুরু করে, অনুরূপভাবে সুদখোরও টাকার পেছনে পাগলের মতো ছুটে ভারসাম্যহীন কথা ও কাজের মহড়া দেয়। নিজের স্বার্থপর মনোবৃত্তির চাপে পাগলের মতো সে কোন কিছুরই পরোয়া করে না। তার সুদখোরীর কারণে কোন কোন পর্যায়ে মানবিক প্রেম-প্রীতি, ভ্রাতৃত্ব ও সহানুভূতির শিকড় কেটে গেলো, সামষ্টিক কল্যাণের ওপর কোন ধরণের ধ্বংসকর প্রভাব পড়লো এবং কতগুলো লোকের দূরবস্থার বিনিময়ে সে নিজের প্রাচুর্যের ব্যবস্থা করলো, এসব বিষয়ে তার কোন মাথা ব্যাথাই থাকে না। দুনিয়াতে তার এই পাগলপারা অবস্থা। আর যেহেতু মানুষকে আখেরাতের সেই অবস্থায় উঠানো হবে যে অবস্থায় সে এই দুনিয়ায় মারা গিয়েছিল,

www.pathagar.com

তাই কিয়ামতের দিন সুদখোর ব্যক্তি একজন পাগল ও বুদ্ধিভ্রষ্ট লোকের চেহারায় আত্মপ্রকাশ করবে।

৩১৭. অর্থাৎ তাদের মতবাদের গলদ হচ্ছে এই যে, ব্যবসায়ে যে মূলধন খাটানো হয়, তার ওপর যে মুনাফা আসে সেই মুনাফালব্ধ অর্থ ও সুদের মধ্যে তারা কোন পার্থক্য করে না। এই উভয় অর্থকে একই পর্যায়ভূক্ত মনে করে তারা যুক্তি পেশ করে থাকে যে, ব্যবসায়ে খাটানো অর্থের মুনাফা যখন বৈধ তখন এই ঋণবাবদ প্রদত্ত অর্থের মুনাফা অবৈধ হবে কেন? বর্তমান যুগের সুদখোররাও সুদের স্বপক্ষে এই একই যুক্তি পেশ করে থাকে। তারা বলে, এক ব্যক্তি যে অর্থ থেকে লাভবান হতে পারতো, তাকে সে ঋণ বাবদ দ্বিতীয় ব্যক্তির হাতে তুলে দিচ্ছে। আর ঐ দ্বিতীয় ব্যক্তি নিঃসন্দেহে তা থেকে লাভবানই হচ্ছে। তাহলে এ ক্ষেত্রে ঋণদাতার যে অর্থ থেকে ঋণগ্রহীতা লাভবান হচ্ছে তার একটি অংশ সে ঋণদাতাকে দেবে না কেন? কিন্তু তারা একথাটি চিন্তা করে না যে, দুনিয়ায় যত ধরনের কারবার আছে, ব্যবসায়-বাণিজ্য, শিল, কারিগরী, কৃষি যা ই হোক না কেন, যেখানে মানুষ কেবলমাত্র শ্রম খাটায় অথবা শ্রম ও অর্থ উভয়টিই খাটায়, সেখানে কোন একটি কারবার এমন নেই যাতে মানুষকে ক্ষতির ঝুঁকি (Risk) নিতে হয় না। একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ মুনাফা বাবদ অর্জিত হবার গ্যারান্টিও কোথাও থাকে না। তাহলে সারা দুনিয়ার সমস্ত ব্যবসায় সংগঠনের মধ্যে একমাত্র ঋণদাতা পুঁজিপতি বা কেন ক্ষতির ঝুঁকিমুক্ত থেকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ মুনাফা লাভের হকদার হবে। অলাভজনক উদ্দেশ্যে ঋণ গ্রহণ করার বিষয়টি কিছুক্ষণের জন্য না হয় দূরে সরিয়ে রাখুন এবং সুদের হারের কম বেশীর বিষয়টিও স্থগিত রাখুন। লাভজনক ও উৎপাদনশীল ঋণের ব্যাপারেই আসা যাক এবং হারও ধরা যাক কম। প্রশ্ন হচ্ছে, যারা রাতদিন নিজেদের কারবারে সময়, শ্রম, যোগ্যতা ও পুঁজি খাটিয়ে চলছে এবং যাদের প্রচেষ্টা ও সাধনার ওপরই এই কারবার ফলপ্রসূ হওয়া নির্ভর করছে তাদের জন্য একটি নির্দিষ্ট অংকের মুনাফা হাসিল করতে থাকবে, এটি কোন ধরণের বুদ্ধিসম্মত ও যুক্তিসংগত কথা, ন্যায়, ইনসাফ ও অর্থনীতির কোন মানদন্ডের বিচারে একে ন্যায়সংগত বলা যেতে পারে। আবার এক ব্যক্তি একজন কারখানাদারকে বিশ বছরের জন্য একটি নির্দিষ্ট অংকের অর্থ ঋণ দিল এবং ঋণ দেয়ার সময়ই সেখানে স্থিরীকৃত হলো যে, আজ থেকেই সে বছরের শতকরা পাঁচ টাকা হিসেবে নিজের মুনাফা গ্রহনের অধিকারী হবে। অথচ কেউ জানে না, এই কারখানা যে পণ্য উৎপাদন করছে আগামী বিশ বছরে বাজারে তার দামের মধ্যে কি পরিমাণ ওঠানামা হবে? এ পদ্ধতি কেমন করে সঠিক হতে পারে? একটি জাতির সকল শ্রেণী একটি যুদ্ধে বিপদ, ক্ষতি ও ত্যাগ স্বীকার করবে কিন্তু সমগ্র জাতির মধ্যে একমাত্র ঋণদাতা পুঁজিপতি গোষ্ঠীই তাদের জাতিকে প্রদত্ত যুদ্ধঋণের সুদ উসূল করতে থাকবে শত শত বছর পরও, এটাকে কেমন করে সঠিক ও ন্যায়সংগত বলা যেতে পারে?

৩১৮. ব্যবসা ও সুদের মধ্যে নীতিগত পার্থক্য রয়েছে। এই পার্থক্যের কারণে উভয়ের অর্থনৈতিক ও নৈতিক মর্যাদা একই পর্যায়ভুক্ত হতে পারে না। এই পার্থক্য নিম্নরূপঃ

www.pathagar.com

(ক) ব্যবসায়ে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে মুনাফার সমান বিনিময় হয়। কারণ বিক্রেতার কাছ থেকে একটি পণ্য কিনে ক্রেতা তা থেকে মুনাফা অর্জন করে। অন্যদিকে ক্রেতার জন্য ঐ পণ্যটি যোগাড় করার ব্যাপারে বিক্রেতা নিজের যে বুদ্ধি শ্রম ও সময় ব্যয় করেছিল তার মূল্য গ্রহন করে। বিপরীতপক্ষে সুদী লেনদেনের ব্যাপারে মুনাফার সমান বিনিময় হয়না। সুদ গ্রহণকারী অর্থের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ গ্রহণ করে। এটি তার জন্য নিশ্চিতভাবে লাভজনক। কিন্তু অন্যদিকে সুদ প্রদানকারী কেবলমাত্র 'সময়' লাভ করে, যার লাভজনক হওয়া নিশ্চিত নয়। নিজের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যয় করার জন্য যদি সে ঐ ঋণ বাবদ অর্থ গ্রহণ করে থাকে, তাহলে নিঃসন্দেহে বলা যায়, ঐ 'সময়' তার জন্য যেমন লাভ আনবে তেমনি ক্ষতিও আনবে, দু'টোরই সম্ভাবনা সমান। কাজেই সুদের ব্যাপারটির ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয় একটি দলের লাভ ও অন্য দলের লোকসানের ওপর অথবা একটি দলের নিশ্চিত ও নির্ধারিত লাভ ও অন্য দলের অনিশ্চিত ও অনির্ধারিত লাভের ওপর।

(খ) ব্যবসায়ে বিক্রেতা ক্রেতার কাছ থেকে যত বেশী লাভ গ্রহণ করুক না কেন, সে মাত্র একবারই তা গ্রহণ করে। কিন্তু সুদের ক্ষেত্রে অর্থ প্রদানকারী নিজের অর্থের জন্য অনবরত মুনাফা নিতে থাকে। আবার সময়ের গতির সাথে সাথে তার মুনাফাও বেড়ে যেতে থাকে। ঋণগ্রহীতা তার অর্থ থেকে যতই লাভবান হোক না কেন তা একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকে। কিন্তু ঋণদাতা এই লাভ থেকে যে মুনাফা অর্জন করে তার কোন সীমা নেই। এমনও হতে পারে, সে ঋণগ্রহীতার সমস্ত উপার্জন, তার সমস্ত অর্থনৈতিক উপকরণ এমনকি তার পরনের কাপড়-চোপড় ও ঘরের বাসন-কোসনও উদরস্থ করে ফেলতে পারে এবং এরপরও তার দাবী অপূর্ণ থেকে যাবে।

(গ) ব্যবসায়ে পণ্যের সাথে তার মূল্যের বিনিময় হবার সাথে সাথেই লেনদেন শেষ হয়ে যায়। এরপর ক্রেতাকে আর কোন জিনিস বিক্রেতার হাতে ফেরত দিতে হয় না। গৃহ, জমি বা মালপত্রের ভাড়ার ব্যাপারে আসল যে বস্তুটি যার ব্যবহারের জন্য মূল্য দিতে হয়, তা ব্যয়িত হয় না বরং অবিকৃত থাকে।

৩১৯. একথা বলা হয়নি যে, যা কিছু সে খেয়ে ফেলেছে, আল্লাহ তা মাফ করে দেবেন। বরং বলা হচ্ছে তার ব্যাপারটি আল্লাহর হাতে থাকছে। এই বাক্য থেকে জানা যায়, "যা কিছু সে খেয়েছে তাতো খেয়ে ফেলেছেই" বাক্যের অর্থ এ নয় যে, যা কিছু ইতিপূর্বে খেয়ে ফেলেছে তা মাফ করে দেয়া হয়েছে বরং এখানে শুধুমাত্র আইনগত সুবিধের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ ইতিপূর্বে যে সুদ সে খেয়ে ফেলেছে আইনগতভাবে তা ফেরত দেয়ার দাবী করা হবে না। কারণ তা ফেরত দেয়ার দাবী করা হলে মামলা-মোকদ্দামার এমন একটা ধারাবাহিকতা চক্র শুরু হয়ে যাবে যা আর শেষ হবে না। তবে সুদী কারবারের মাধ্যমে যে ব্যক্তি অর্থ-সম্পদ সংগ্রহ করেছে নৈতিক দিক দিয়ে তার অপবিত্রতা পূর্ববত প্রতিষ্ঠিত থাকবে। যদি তার মনে যথার্থই আল্লাহর ভীতি স্থান লাভ করে থাকে এবং ইসলাম গ্রহণ করার পর তার অর্থনৈতিক ও নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি যদি সত্যিই পরিবর্তিত হয়ে গিয়ে থাকে,তাহলে সে নিজেই এই হারাম পথে উপার্জিত ধন-

www.pathagar.com

সম্পদ নিজের জন্য ব্যয় করা থেকে বিরত থাকবে এবং যাদের অর্থ-সম্পদ তার কাছে আছে তাদের সন্ধান লাভ করার জন্য নিজস্ব পর্যায়ে যথাসাধ্য প্রচেষ্টা চালাতে থাকবে। হকদারদের সন্ধান পাবার পর তাদের হক ফিরিয়ে দেবে। আর যেসব হকদারের সন্ধান পাবে না তাদের সম্পদগুলো সমাজসেবা ও জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করার ব্যবস্থা করবে। এই কার্যক্রম তাকে আল্লাহর শাস্তি থেকে বাঁচাতে সাহায্য করবে। তবে যে ব্যক্তি তার পূর্বেকার সুদলব্ধ অর্থ যথারীতি ভোগ করতে থাকে, সে যদি তার এই হারাম খাওয়ার শাস্তি লাভ করেই যায়, তাহলে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই।

৩২০. এই আয়াতে এমন একটি অকাট্য সত্যের ঘোষণা দেয়া হয়েছে, যা নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে যেমন সত্য তেমনি অর্থনৈতিক ও তামাদ্দুনিক দিক দিয়েও সত্য। যদিও আপাতদৃষ্টিতে দেখা যায়, সুদের মাধ্যমে অর্থ বৃদ্ধি হচ্ছে এবং দান-খয়রাতের মাধ্যমে অর্থ-সম্পদ কমে যাচ্ছে তবুও আসল ব্যাপার এর সম্পূর্ণ বিপরীত। আল্লাহর প্রাকৃতিক বিধান হচ্ছে এই যে, সুদ নৈতিক, আধ্যাত্মিক, অর্থনৈতিক ও তামাদ্দুনিক উন্নতির কেবল প্রতিবন্ধকতাই নয় বরং অবনতির সহায়ক। বিপরীত পক্ষে দান-খয়রাতের (করয-ই-হাসানা বা উত্তম ঋণ) মাধ্যমে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বৃত্তি এবং তামাদ্দুন ও অর্থনীতি সবকিছুই উন্নতি ও বিকাশ লাভ করে।

নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে বিচার করলে একথা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, সুদ আসলে স্বার্থপরতা, কৃপণতা, সংকীর্ণতা, নির্মমতা ইত্যাকার অসৎ গুনাবলীর ফল এবং এই গুণগুলোই সে মানুষের মধ্যে বিকশিত করে। অন্যদিকে দানশীলতা, সহানুভূতি, উদারতা ও মহানুভবতা ইত্যাকার গুণাবলীই দান-খয়রাতের জন্ম দেয় এবং দান-খয়রাতের মাধ্যমে আর নিয়মিত দান-খয়রাত করতে থাকলে এই গুণগুলো মানুষের মধ্যে লালিত ও বিকশিত হতে থাকে। এমন কে আছে যে, এই উভয় ধরনের নৈতিক গুণাবলীর মধ্য থেকে প্রথমগুলোকে নিকৃষ্ট ও শেষের গুলোকে উৎকৃষ্ট বলবে না ?

তামাদ্দুনিক দিক দিয়ে বিচার করলে প্রত্যেক ব্যক্তি নি:সন্দেহে একথা বুঝতে সক্ষম হবে যে, যে সমাজের লোকেরা পরস্পরের সাথে স্বার্থবাদী আচরণ করে, নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থ ও লাভ ছাড়া নি:স্বার্থভাবে অন্যের কোন কাজ করে না, একজনের প্রয়োজন ও অভাবকে অন্যজন নিজের মুনাফা অর্জনের সুযোগ মনে করে তা থেকে পুরোপুরি লাভবান হয় এবং ধনীদের স্বার্থ সাধারণ মানুষের স্বার্থের বিপরীত মেরুতে অবস্থান করে, সে সমাজ কখনো শক্তিশালী হতে পারে না। সে সমাজের লোকদের মধ্যে পারস্পরিক প্রীতির সম্পর্কের পরিবর্তে হিংসা, বিদ্বেষ, নিষ্ঠুরতা ও অনাগ্রহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে। আর বিভিন্ন অংশ হামেশা বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্যের দিকে এগিয়ে যাবে। অন্যান্য কারণগুলো যদি এই অবস্থার সহায়ক হয়ে দাঁড়ায় তাহলে এহেন সমাজের বিভিন্ন অংশের পরস্পরের সাথে সংঘাতে লিপ্ত হয়ে যাওয়াটাও মোটেই কঠিন ব্যাপার নয়। অন্যদিকে যে সমাজের সামষ্টিক ব্যবস্থাপনা পরস্পরের প্রতি সাহায্য-সহানুভূতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত যার সদস্যরা পরস্পরের সাথে ঔদার্যপূর্ণ আচরণ করে, যেখানে প্রত্যেক ব্যক্তি অন্যের প্রয়োজন ও অভাবের সময় আন্তরিকতার সাথে ও প্রশস্ত মনে

www.pathagar.com

সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় এবং একজন সামর্থবান ও সক্ষম ব্যক্তি তার একজন অক্ষম ও অসমর্থ ভাইকে সাহায্য অথবা কমপক্ষে ন্যায়সংগত সহায়তার নীতি অবলম্বন করে, সেখানে স্বাভাবিক ভাবেই পারস্পরিক প্রীতি, কল্যাণাকাংখা ও আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে। এ ধরনের সমাজে অংশগুলো একটি অন্যটির সাথে সংযুক্ত ও সম্পর্কিত থাকবে। সেখানে আভ্যন্তরীণ কোন্দল, বিরোধ ও সংঘাত মাথাচাড়া দিয়ে ওঠার কোন সুযোগই পাবে না। পারস্পরিক শুভেচ্ছা ও সাহায্য সহযোগীতার কারণে সেখানে উন্নিতর গতিধারা প্রথম ধরনের সমাজের তুলনায় অনেক বেশী দ্রুত হবে।এবার অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বিচার করা যাক। অর্থনৈতিক বিচারে সুদী লেনদেন দুই ধরনের হয়।

এক: অভাবীরা নিজেদের ব্যক্তিগত ব্যয়ভার বহন করার জন্য বাধ্য হয়ে যে ঋণ গ্রহণ করে।

দুই: পেশাদার লোকেরা নিজেদের ব্যবসায়-বাণিজ্য, শিল, কারিগরী, কৃষি ইত্যাদিতে বিনিয়োগ করার জন্য যে ঋণ গ্রহণ করে। এর মধ্যে প্রথম ধরনের ঋণটি সম্পর্কে সবাই জানে, এর ওপর সুদ আদায় করার পদ্ধতি মারাত্মক ধ্বংসকর। দুনিয়ায় এমন কোন দেশ নেই যেখানে মহাজনরা ও মহাজনী সংস্থাগুলো এই পদ্ধতিতে গরীব, শ্রমিক, মজুর, কৃষক ও স্বল্প আয়ের লোকদের রক্ত চুষে চলছে না। সুদের কারণে এই ধরণের ঋণ আদায় করা তাদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন বরং অনেক সময় অসম্ভব হয়ে পড়ে। তারপর এক ঋণ আদায় করার জন্য দ্বিতীয় ঋণ এবং তারপর তৃতীয় ঋণ, এভাবে ঋণের পর ঋণ নিতে থাকে। ঋণের মূল অংকের তুলনায় কয়েকগুণ বেশী সুদ আদায় করার পরও মূল অংক যেখানকার সেখানেই থেকে যায়। শ্রমিকদের আয়ের বৃহত্তম অংশ মহাজনের পেটে যায়। তার নিজের মাথার ঘাম পায়ে ফেলে উপার্জিত অর্থ দিনান্তে তার নিজের ও সন্তান-পরিজনদের পেটের আহার যোগাতে সক্ষম হয় না। এ অবস্থায় কাজের প্রতি শ্রমিক ও কর্মচারীদের আগ্রহ ধীরে ধীরে কমে যেতে থাকে এবং একদিন তা শূণ্যের পর্যায়ে এসে দাঁড়ায়। কারণ তাদের মেহনতের ফল যদি অন্যেরা নিয়ে যেতে থাকে, তাহলে তারা কোনদিন মন দিয়ে ও আন্তরিকতার সাথে কাজ করতে পারে না। তারপর সুদী ঋণের জালে আবদ্ধ লোকেরা সর্বক্ষণ এমন দুর্ভাবনা ও পেরেশানির মধ্যে জীবন কাটায় এবং অভাবের কারণে তাদের জন্য সঠিক খাদ্য ও চিকিৎসা এমনই দুর্লভ হয়ে পড়ে, যার ফলে তাদের স্বাস্থ্য কখনো ভালো থাকে না। প্রায়ই তারা রোগ-পীড়ায় জর্জরিত থাকে। এভাবে সুদী ঋণের নীট ফল এই দাঁড়ায়: গুটিকয় লোক লাখো লোকের রক্ত চুষে মোটা হতে থাকে কিন্তু সামগ্রিকভাবে সমগ্র জাতির অর্থ উৎপাদন সম্ভাব্য পরিমাণ থেকে অনেক কমে যায়। পরিণামে এর ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ত চোষারাও নিস্কৃতি পায় না। কারণ তাদের স্বার্থান্ধতায় সাধারণ দরিদ্র শ্রেণীকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে। ধনিক সমাজের বিরুদ্ধে তাদের মনে ক্ষোভ, ঘৃণা ও ক্রোধ লালিত হতে থাকে। তারপর একদিন কোন বিপ্লবের তরঙ্গে ক্ষোভের আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ ঘটে। তখন এই জালেম ধনিক সমাজকে তাদের অর্থ-সম্পদের সাথে সাথে প্রাণ সম্পদও বিসর্জন দিতে হয়।

www.pathagar.com

আর দ্বিতীয় ধরনের সুদী ঋণ সম্পর্কে বলা যায়, ব্যবসায় খাটাবার জন্য একটি নির্দিষ্ট সুদের হারে এই ঋণ গ্রহণ করার ফলে যে অসংখ্য ক্ষতি হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি এখানে বিবৃত করছিঃ

এক: যে কাজটি প্রচলিত সুদের হারের সমান লাভ উৎপাদনে সক্ষম নয়, তা দেশ ও জাতির জন্য যতই প্রয়োজনীয় ও উপকারী হোক না কেন,তাতে খাটাবার জন্য অর্থ পাওয়া যায় না। আবার দেশের সমস্ত অর্থনৈতিক উপকরণ একযোগে এমন সব কাজের দিকে দৌড়ে আসে, যেগুলো বাজারে প্রচলিত সুদের হারের সমান বা তার চাইতে বেশী উৎপাদন করতে পারে, সামগ্রিক দিক দিয়ে তাদের প্রয়োজন বা উপকারী ক্ষমতা অনেক কম অথবা একবারে শূন্যের কোঠায় থাকলেও।

দুই: ব্যবসায়, শিল বা কৃষি সংক্রান্ত যেসব কাজের জন্য সুদে টাকা পাওয়া যায়, তাদের কোন একটিতেও এ ধরনের কোন গ্যারান্টি নেই যে,সব সময় সব অবস্থায় তার মুনাফা একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ যেন শতকরা পাঁচ, ছয় বা দশ অথবা তার ওপরে থাকবে এবং এর নীচে কখনো নামবে না। মুনাফার এই হারের গ্যারান্টি তো দূরের থাক সেখানে অবশ্যই মুনাফা হবে, কখনো লোকসান হবে না, এর কোন নিশ্চয়তা নেই। কাজেই যে ব্যবসায়ে এমন ধরনের পুঁজি খাটানো হয় যাতে পুঁজিপতিকে একটি নির্ধারিত হার অনুযায়ী মুনাফা দেয়ার নিশ্চয়তা দান করা হয়ে তাকে, তা কখনো ক্ষতি ও আশংকা মুক্ত হতে পারে না।

তিন: যেহেতু মূল ঋণদাতা ব্যবসায়ের লাভ লোকসানে অংশীদার হয় না, কেবলমাত্র মুনাফার অংশীদার হয় এবং তাও আবার একটি নির্দিষ্ট হারে মুনাফার নিশ্চয়তা দেয়ার ভিত্তিতে মূলধন দেয়, তাই ব্যবসায়ের ভালো-মন্দের ব্যাপারে তার কোন আগ্রহ থাকে না। সে চরম স্বার্থপরতা সহকারে কেবলমাত্র নিজের মুনাফার ওপর নজর রাখে। যখনই বাজারে সামান্য মন্দাভাব দেখা দেয়ার আশংকা হয় তখনই সে সবার আগে নিজের টাকাটা টেনে নেয়ার চিন্তা করে। এভাবে কখনো কখনো নিছক তার স্বার্থপরতা সুলভ আশংকার কারণে সত্যি সত্যিই বাজারে মন্দাভাব সৃষ্টি হয়। কখনো অন্য কোন কারণে বাজারে মন্দাভাব সৃষ্টি হয়ে গেলে পুঁজিপতির স্বার্থপরতা তাকে কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিয়ে চূড়ান্ত ধ্বংসের সূচনা করে।

সুদের এ তিনটি ক্ষতি অত্যন্ত সুস্পষ্ট। অর্থনীতির সাথে সামান্যতম সম্পর্ক রাখে এমন কোন ব্যক্তি এগুলো অস্বীকার করতে পারবেন না। এরপর একথা মেনে নেয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই যে, যথার্থই সুদ অর্থনৈতিক সম্পদ বাড়ায় না বরং কমায়।

এবার দান-খয়রাতের অর্থনৈতিক প্রভাব ও ফলাফলের কথায় আসা যাক। সমাজের সচ্ছল লোকেরা যদি নিজেদের অবস্থা ও মর্যাদা অনুসারে নিঃসংকোচে নিজের ও নিজের পরিবার পরিজনদের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনে নেয় এরপর তাদের কাছে যে পরিমণ টাকা উদ্বৃত্ত থাকে তা গরীবদের মধ্যে বিলি করে দেয়,যাতে তারাও নিজেদের প্রয়োজনের জিনিসপত্র কিনতে পারে, তারপরও যে টাকা বাড়তি থেকে যায় তা ব্যবসায়ীদের বিনা সুদে ঋণ দেয় অথবা অংশীদারী নীতির ভিত্তিতে তাদের সাথে লাভ লোকসানের শরীক হয়ে যায় অথবা সমাজ ও সমষ্টির সেবায় বিনিয়োগ করার জন্য

www.pathagar.com

সরকারের হাতে সোপর্দ করে দেয়, তাহলে এহেন সমাজে শিল, বাণিজ্য, কৃষি ইত্যাদি চরম উন্নতি লাভ করবে, সমাজের সাধারণ লোকদের সচ্ছলতা বেড়ে যেতে থাকবে এবং সুদী অর্থ ব্যবস্থা ভিত্তিক সমাজের তুলনায় সেখানে সামগ্রিকভাবে অর্থ উৎপাদন কয়েকগুণ বেড়ে যাবে, একথা যে কেউ সামান্য চিন্তা-ভাবনা করলে সহজেই বুঝতে পারবে।

৩২১. অর্থ বন্টনের ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি তার মৌলিক প্রয়োজনের চাইতে বেশী অংশ পেয়েছে একমাত্র সেই ব্যক্তিই সুদে টাকা খাটাতে পারে। কোন ব্যক্তি তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত এই যে অংশটা পায় কুরআনের পরিভাষায় একে বলা হয় আল্লাহর দান। আর আল্লাহর এই দানের জন্য তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পদ্ধতি হচ্ছে এই যে, আল্লাহ যেভাবে তাঁর বান্দাকে দান করেছেন বান্দাও ঠিক সেভাবে আল্লাহর অন্য বান্দাদেরকে তা দান করবে। যদি সে এমনটি না করে বরং এর বিপরীতপক্ষে আল্লাহর এই দানকে এমনভাবে ব্যবহার করে যার ফলে অর্থ বন্টনের ক্ষেত্রে আল্লাহর যেসব বান্দা প্রয়োজনের কম অংশ পেয়েছে তাদের এই কম অংশ থেকেও নিজের অর্থের জোরে এক একটি অংশ নিজের দিকে টেনে নিতে থাকে, তাহলে আসলে সে এক দিকে যেমন হবে অকৃতজ্ঞ তেমনি অন্য দিকে হবে জালেম, নিষ্ঠুর, শোষক ও দুশ্চরিত্র।

৩২২. এই রুকূ'তে মহান আল্লাহ বারবার দুই ধরনের লোকদের তুলনা করেছেন। এক ধরনের লোক হচ্ছে, স্বার্থপর, অর্থগৃধ্ন ও শাইলক প্রকৃতির, তারা আল্লাহ ও বান্দা উভয়ের অধিকারের পরোয়া না করে টাকা গুনতে থাকে, প্রত্যেকটি টাকা গুনে গুনে তার সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে থাকে এবং সপ্তাহ ও মাসের হিসেবে তা বাড়াবার ও এই বাড়তি টাকার হিসেব রাখার মধ্যে ডুবে থাকে।

দ্বিতীয় ধরনের লোক হচ্ছে, আল্লাহর অনুগত, দানশীল ও মানবতার প্রতি সহানুভূতিশীল। তারা আল্লাহ ও তাঁর বান্দার উভয়ের অধিকার সংরক্ষণের প্রতি নজর রাখে, নিজেদের পরিশ্রমলব্ধ অর্থ দিয়ে নিজেদের চাহিদাপূরণ করে এবং অন্যদের চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা করে। আর এই সংগে নিজেদের অর্থ ব্যাপকভাবে সৎকাজে ব্যয় করে। প্রথম ধরনের লোকদেরকে আল্লাহ মোটেই পছন্দ করেন না। এই ধরনের চরিত্র সম্পন্ন লোকদের সাহায্যে দুনিয়ায় কোন সৎ ও সুস্থ সমাজ গড়ে উঠতে পারে না। আখেরাতেও তারা দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণা, লাঞ্ছনা ও বিপদ-মুসিবত ছাড়া আর কিছুই পাবে না। বিপরীতপক্ষে দ্বিতীয় ধরনের চরিত্র সম্পন্ন লোকদেরকে আল্লাহ পছন্দ করেন। তাদের সাহায্যেই দুনিয়ায় সৎ ও সুস্থ সমাজ গড়ে ওঠে এবং আখেরাতে তারাই কল্যাণ ও সাফল্যের অধিকারী হয়।

৩২৩. এ আয়াতটি মক্কা বিজয়ের পর নাযিল হয়। বিষয়বস্তুর সাদৃশ্যের কারণে এটিকে এখানে সংযুক্ত করে দেয়া হয়েছে। ইতিপূর্বে সুদকে একটি অপছন্দনীয় বস্তু মনে করা হলেও আইনত তা রহিত করা হয়নি। এই আয়াতটি নাযিলের পর ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যে সুদী কারবার একটি ফৌজদারী অপরাধে পরিণত হয়। আরবের যেসব গোত্রে সুদের প্রচলন ছিল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের গভর্ণরের মাধ্যমে তাদেরকে জানিয়ে দেন যে, এখন থেকে যদি তারা সুদের কারবার বন্ধ না করে, তাহলে

www.pathagar.com

তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হবে। ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনে নাজরানের খৃষ্টানদের স্বায়ত্ব শাসনাধিকার দান করার সময় চুক্তিতে একথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়, যদি তোমরা সুদী কারবার করো তাহলে এই চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে এবং আমাদের ও তোমাদের মধ্যে যুদ্ধাবস্থা সৃষ্টি হয়ে যাবে। আয়াতের শেষের শব্দগুলোর কারণে হযরত ইবনে আব্বাস (রা), হাসান বাসরী, ইবনে সীরীন রুবাঈ' ইবনে আনাস প্রমুখ ফকীহগণ এই মত প্রকাশ করেন যে, যে ব্যক্তি দারুল ইসলামে সুদ খাবে তাকে তাওবা করতে বাধ্য করা হবে। আর যদি সে তাতে বিরত না হয়,তাহলে তাকে হত্যা করা হবে। অন্য ফকীহদের মতে, এহেন ব্যক্তিকে বন্দী করে রাখাই যথেষ্ট। সুদ খাওয়া পরিত্যাগ করার অংগীকার না করা পর্যন্ত তাকে কারারুদ্ধ করে রাখতে হবে।

৩২৪. এই আয়াতটি থেকে শরীয়তের এই বিধান গৃহীত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি ঋণ পরিশোধ করতে অক্ষম হয়ে পড়েছে ইসলামী আদালত তার ঋণদাতাদের বাধ্য করবে, যাতে তারা তাকে 'সময়' দেয় এবং কোন কোন অবস্থায় আদালত তার সমস্ত দেনা বা তার আংশিক মাফ করে দেয়ারও ব্যবস্থা করবে। হাদীসে বর্ণিত হয়েছেঃ "এক ব্যক্তির ব্যবসায়ে লোকসান হতে থাকে। তার ওপর দেনার বোঝা অনেক বেশী বেড়ে যায়। ব্যাপারটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত গড়ায়। তিনি লোকদের কাছে ঐ ব্যক্তিকে সাহায্য করার আবেদন জানান। অনেকে তাকে আর্থিক সাহায্য দান করে কিন্তু এরপরও তার দেনা পরিশোধ হয় না। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার ঋণদাতাদের বলেন, যা কিছু তোমরা পেয়েছো তাই নিয়ে তাকে রেহাই দাও। এর বেশী তার কাছ থেকে তোমাদের জন্য আদায় করিয়ে দেয়া সম্ভব নয়। ফকীহগণ এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, এক ব্যক্তির থাকার ঘর, খাবার বাসনপত্র, পরার কাপড়-চোপড় এবং যেসব যন্ত্রপাতি দিয়ে সে রুজি-রোজগার করে, সেগুলো কোন অবস্থাতেই ক্রোক করা যেতে পারে না"। (মুসলিম)

www.pathagar.com

১৩ রামাদান
বিষয়: মুনাফিকের পরিচয় ও আচরণ
সূরা বাক্বারাহ : ০৮-২০

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ (8) يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلاَّ أَنفُسَهُم وَمَا يَشْعُرُونَ (9) فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضاً وَلَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ (10) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ قَالُواْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ (11) أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لاَّ يَشْعُرُونَ (12) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُواْ كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُواْ أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاء أَلا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاء وَلَكِن لاَّ يَعْلَمُونَ (13) وَإِذَا لَقُواْ الَّذِينَ آمَنُواْ قَالُواْ آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُواْ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُونَ (14) اللَّهُ يَسْتَهْزِىءُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ (15) أُوْلَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُاْ الضَّلاَلَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ (16) مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَاراً فَلَمَّا أَضَاءتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لاَّ يُبْصِرُونَ (17) صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لاَ يَرْجِعُونَ (18) أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاء فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِم مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ (19) يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشَوْاْ فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُواْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (20)

৮) কিছু লোক এমনও আছে যারা বলে, আমরা আল্লাহর ওপর ও আখেরাতের দিনের ওপর ঈমান এনেছি, অথচ আসলে তারা মু'মিন নয়।

৯) তারা আল্লাহর সাথে ও যারা ঈমান এনেছে তাদের সাথে ধোঁকাবাজি করেছে। কিন্তু আসলে তারা নিজেদেরকেই প্রতারণা করছে, তবে তারা এ ব্যাপারে সচেতন নয়। [১১]

১০) তাদের হৃদয়ে আছে একটি রোগ, আল্লাহ সে রোগ আরো বেশী বাড়িয়ে দিয়েছেন, [১২] আর যে মিথ্যা তারা বলে তার বিনিময়ে তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

১১) যখনই তাদের বলা হয়েছে, যমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করোনা, তারা একথাই বলেছে, আমরা তো সংশোধনকারী মাত্র।

১২) সাবধান ! এরাই ফাসাদ সৃষ্টিকারী, তবে তারা এ ব্যাপারে সচেতন নয়।

www.pathagar.com

১৩) আর যখন তাদের বলা হয়েছে, অন্য লোকেরা যেভাবে ঈমান এনেছে তোমরাও সেভাবে ঈমান আনো [১৩] তখন তারা এ জবাবই দিয়েছে- আমরা কি ঈমান আনবো নির্বোধদের মতো? [১৪] সাবধান! আসলে এরাই নির্বোধ, কিন্তু এরা জানে না।

১৪) যখন এরা মু'মিনদের সাথে মিলিত হয়, তখন বলে: "আমরা ঈমান এনেছি" আবার যখন নিরিবিলিতে নিজেদের শয়তানদের [১৫] সাথে মিলিত হয় তখন বলে: "আমরা তো আসলে তোমাদের সাথেই আছি আর ওদের সাথে তো নিছক তামাশা করছি"।

১৫) আল্লাহ এদের সাথে তামাশা করছেন, এদের রশি দীর্ঘায়িত বা ঢিল দিয়ে যাচ্ছেন এবং এরা নিজেদের আল্লাহদ্রোহিতার মধ্যে অন্ধের মতো পথ হাতড়ে মরছে।

১৬) এরাই হিদায়াতের বিনিময়ে গোমরাহী কিনে নিয়েছে, কিন্তু এ সওদাটি তাদের জন্য লাভজনক নয় এবং এরা মোটেই সঠিক পথে অবস্থান করছে না।

১৭) এদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে, যেমন এক ব্যক্তি আগুন জ্বালালো এবং যখনই সেই আগুন চারপাশ আলোকিত করলো তখন আল্লাহ তাদের দৃষ্টিশক্তি ছিনিয়ে নিলেন এবং তাদের ছেড়ে দিলেন এমন অবস্থায় যখন অন্ধকারের মধ্যে তারা কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না। [১৬]

১৮) তারা কালা, বোবা, অন্ধ। [১৭] তারা আর ফিরে আসবে না।

১৯) অথবা এদের দৃষ্টান্ত এমন যে, আকাশ থেকে মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। তার সাথে আছে অন্ধকার মেঘমালা, বজ্রের গর্জন ও বিদ্যুৎ চমক। বজ্রপাতের আওয়াজ শুনে নিজেদের প্রাণের ভয়ে এরা কানে আঙুল ঢুকিয়ে দেয়। আল্লাহ এ সত্য অস্বীকার কারীদেরকে সবদিক দিয়ে ঘিরে রেখেছেন। [১৮]

২০) বিদ্যুৎ চমকে তাদের অবস্থা এই দাঁড়িয়েছে যেন বিদ্যুৎ শিগ্‌গির তাদের দৃষ্টিশক্তি ছিনিয়ে নেবে। যখন সামান্য একটু আলো তারা অনুভব করে তখন তার মধ্যে তারা কিছুদূর চলে এবং যখন তাদের ওপর অন্ধকার ছেয়ে যায় তারা দাঁড়িয়ে পড়ে। [১৯] আল্লাহ চাইলে তাদের শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি একেবারেই কেড়ে নিতে পারতেন। [২০] নিঃসন্দেহে তিনি সবকিছুর ওপর শক্তিশালী।

আয়াত সমূহের ব্যাখ্যা

১১. অর্থাৎ তাদের মুনাফেকী কার্যকলাপ তাদের জন্য লাভজনক হবে- এ ভুল ধারণায় তারা নিমজ্জিত রয়েছে। অথচ এসব তাদেরকে দুনিয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত করবে এবং আখেরাতেও। একজন মুনাফিক কয়েকদিনের জন্য দুনিয়ায় মানুষকে ধোকা দিতে পারে কিন্তু সবসময়ের জন্য তার এই ধোঁকাবাজি চলতে পারে না। অবশেষে একদিন তার মুনাফিকীর গোমর ফাঁক হয়ে যাবেই। তখন সমাজে তার সামান্যতম মর্যাদাও খতম

www.pathagar.com

হয়ে যাবে। আর আখেরাতের ব্যাপারে বলা যায়, সেখানে তো ঈমানের মৌখিক দাবীর কোন মূল্যই থাকবে না যদি আমল দেখা যায় তার বিপরীত।

১২. মুনাফিকীকেই এখানে রোগ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। আর আল্লাহ্ এ রোগ আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন, একথার অর্থ হচ্ছে এই যে, তিনি কালবিলম্ব না করে ঘটনাস্থলেই মুনাফিকদেরকে তাদের মুনাফিকী কার্যকলাপের শাস্তি দেন না বরং তাদেরকে ঢিল দিতে থাকেন। এর ফলে মুনাফিকরা নিজেদের কলা-কৌশলগুলোকে আপাত দৃষ্টিতে সফল হতে দেখে আরো বেশী ও পূর্ণ মুনাফিকী কার্যকলাপে লিপ্ত হতে থাকে।

১৩. অর্থাৎ তোমাদের এলাকার অন্যান্য লোকেরা যেমন সাচ্চা দিলে ও সরল অন্ত:করণে মুসলমান হয়েছে তোমরাও যদি ইসলাম গ্রহণ করতে চাও তাহলে তেমনি নিষ্ঠা সহকারে সাচ্চা দিলে গ্রহণ করো।

১৪ . যারা সাচ্চা দিলে নিষ্ঠা সহকারে ইসলাম গ্রহণ করে নিজেদেরকে উৎপীড়ন, নির্যাতন, কষ্ট ও বিপদের মুখে নিক্ষেপ করেছিল তাদেরকে তারা নির্বোধ মনে করতো। তাদের মতে নিছক সত্য ও ন্যায়ের জন্য সারা দেশের জনসমাজের শত্রুতার মুখোমুখি হওয়া নিরেট বোকামি ছাড়া আর কিছুই নয়। তারা মনে করতো, হক ও বাতিলের বিতর্কে না পড়ে সব ব্যাপারেই কেবলমাত্র নিজের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ।

১৫ . আরবী ভাষায় সীমালংঘনকারী, দাম্ভিক ও স্বৈরাচারীকে শয়তান বলা হয়। মানুষ ও জ্বিন উভয়ের জন্য এ শব্দটি ব্যবহার করা হয়। কুরআনের অধিকাংশ জায়গায় এ শব্দটি জ্বিনদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হলেও কোন কোন জায়গায় আবার শয়তান প্রকৃতির মানুষদের জন্যও ব্যবহার করা হয়েছে। পূর্বাপর আলোচনার প্রেক্ষাপটে এসব ক্ষেত্রে কোথায় শয়তান শব্দটি জ্বিনদের জন্য এবং কোথায় মানুষদের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে তা সহজেই জানা যায়। তবে আমাদের আলোচ্য স্থানে শয়তান শব্দটিকে বহুবচনে 'শায়াতীন' হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে এবং এখানে 'শায়াতীন' বলতে মুশরিকদের বড় বড় সরদারদেরকে বুঝানো হয়েছে। এ সরদাররা তখন ইসলামের বিরোধিতার ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিচ্ছিল।

১৬. যখন আল্লাহর এক বান্দা আলো জ্বালালেন এবং হককে বাতিল থেকে, সত্যকে মিথ্যা থেকে ও সরল সোজা পথকে ভুল পথ থেকে ছেঁটে সুস্পষ্টরূপে আলাদা করে ফেললেন তখন চক্ষুষমান ব্যক্তিদের কাছে সত্য উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো সুস্পষ্ট দিবালোকের মতো। কিন্তু প্রবৃত্তি পূজার অন্ধ মুনাফিকরা এ আলোয় কিছুই দেখতে পেলো না।

"আল্লাহ তাদের দৃষ্টিশক্তি ছিনিয়ে নিলেন"- বাক্যের কারণে কেউ যেন এ ভুল ধারণা পোষণ না করেন যে, তাদের অন্ধকারে হাতড়ে মরার জন্য তারা নিজেরা দায়ী নয়। যে

www.pathagar.com

ব্যক্তি নিজে হক ও সত্যের প্রত্যাশী নয়, নিজেই হিদায়াতের পরিবর্তে গোমরাহীকে নিজের বুকে আঁকড়ে ধরে এবং সত্যের আলোকোজ্জ্বল চেহারা দেখার আগ্রহ যার মোটেই নেই, আল্লাহ তারই দৃষ্টিশক্তি ছিনিয়ে নেন। সত্যের আলো থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে সে নিজেই যখন বাতিলের অন্ধকারে হাতড়ে মরতে চায় তখন আল্লাহও তাকে তারই সুযোগ দেন।

১৭. হক কথা শোনার ব্যাপারে বধির, হক কথা বলার ক্ষেত্রে বোবা এবং হক ও সত্য দেখার প্রশ্নে অন্ধ।

১৮. কানে আঙ্গুল ঢুকিয়ে দিয়ে এরা ধ্বংসের হাত থেকে বেঁচে যাবে- এ ধারণায় কিছুক্ষণের জন্য ডুবে যেতে পারে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এভাবে তারা বাঁচতে পারবে না। কারণ আল্লাহ তাঁর সমগ্র শক্তি দিয়ে তাদেরকে ঘিরে রেখেছেন।

১৯. প্রথম দৃষ্টান্তটি ছিল এমন সব মুনাফিকদের যারা মানসিক দিক দিয়ে ঈমান ও ইসলামকে পুরোপুরি অস্বীকার করতো কিন্তু কোন স্বার্থ ও সুবিধা লাভের উদ্দেশ্যে মুসলমান হয়ে গিয়েছিল। আর এ দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটি হচ্ছে সন্দেহ, সংশয় ও দ্বিধার শিকার এবং দুর্বল ঈমানের অধিকারীদের। এরা কিছুটা সত্য স্বীকার করে নিয়েছিল। কিন্তু সে জন্য বিপদ-মুসিবত, কষ্ট-নির্যাতন সহ্য করতে তারা প্রস্তুত ছিলনা। এ দৃষ্টান্তে বৃষ্টি বলতে ইসলামকে বুঝানো হয়েছে। ইসলাম বিশ্ব-মানবতার জন্য একটি রহমতরূপে আবির্ভূত হয়েছে। অন্ধকার মেঘমালা , বিদ্যুৎ চমক ও বজ্রের গর্জন বলে এখানে সেই ব্যাপক দুঃখ-কষ্ট, বিপদ-আপদ ও সংকটের কথা বুঝানো হয়েছে ইসলামী আন্দোলনের মোকাবিলায় জাহেলী শক্তির প্রবল বিরোধিতার মুখে যেগুলো একের পর এক সামনে আসছিল। দৃষ্টান্তের শেষ অংশে এক অভিনব পদ্ধতিতে মুনাফিকদের এ অবস্থার নকশা আঁকা হয়েছে। অর্থাৎ ব্যাপারটি একটু সহজ হয়ে গেলে তারা চলতে থাকে আবার সমস্যা-সংকটের জট পাকিয়ে গেলে অথবা তাদের প্রবৃত্তি বিরোধী হয়ে পড়লে বা জাহেলী স্বার্থে আঘাত পড়লে তারা সটান দাঁড়িয়ে যায়।

২০. অর্থাৎ যেভাবে প্রথম ধরনের মুনাফিকদের দৃষ্টিশক্তি সম্পূর্ণরূপে ছিনিয়ে নিয়েছিলেন সেভাবে আল্লাহ তাদেরকেও হক ও সত্যের ব্যাপারে কানা ও কালায় পরিণত করতে পারতেন। কিন্তু যে ব্যক্তি কিছুটা দেখতে ও শুনতে চায় তাকে ততটুকুও দেখতে শুনতে না দেয়া আল্লাহর রীতি নয়। যতটুকু হক দেখতে শুনতে তারা প্রস্তুত ছিল, আল্লাহ ততটুকু শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি তাদের আয়ত্বাধীনে রেখেছিলেন।

www.pathagar.com

১৪ রামাদান

বিষয়: জ্ঞান (ইলম)

সূরা আল আলাক: ২৪-২৭

بسم الله الرحمن الرحيم

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (1) خَلَقَ الإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ (2) اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ (3) الَّذِي
عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (4) عَلَّمَ الإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (5) كَلاَّ إِنَّ الإِنسَانَ لَيَطْغَى (6) أَن رَّآهُ اسْتَغْنَى
(7) إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى (8) أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى (9) عَبْدًا إِذَا صَلَّى (10) أَرَأَيْتَ إِن
كَانَ عَلَى الْهُدَى (11) أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى (12) أَرَأَيْتَ إِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى (13) أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ
اللَّهَ يَرَى (14) كَلاَّ لَئِن لَّمْ يَنتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ (15) نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ (16) فَلْيَدْعُ
نَادِيَه (17) سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ (18) كَلاَّ لا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ (19)

১) (হে নবী), পড়ো [১] তোমার রবের নামে,[২] যিনি সৃষ্টি করেছেন। [৩] ২) জমাট বাঁধা রক্তের দলা থেকে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন।[৪] ৩) পড়ো, এবং তোমার রব বড় মেহেরবান, ৪) যিনি কলমের সাহায্যে জ্ঞান শিখিয়েছেন। [৫] ৫) মানুষকে এমন জ্ঞান দিয়েছেন, যা সে জানতো না। [৬] ৬) কখনই নয়, [৭] মানুষ সীমালঙ্ঘন করে। ৭) কারণ সে নিজেকে দেখে অভাবমুক্ত।[৮]

৮) (অথচ) নিশ্চিতভাবেই তোমার রবের দিকেই ফিরে আসতে হবে। [৯] ৯) তুমি কি দেখেছো সেই ব্যক্তিকে ১০) যে এক বান্দাকে নিষেধ করে যখন সে নামায পড়ে।[১০] ১১) তুমি কি মনে করো, যদি (সেই বান্দা) সঠিক পথে থাকে ১২) অথবা তাকওয়ার নির্দেশ দেয়? ১৩) তুমি কি মনে করো, যদি (এই নিষেধকারী সত্যের প্রতি) মিথ্যা আরোপ করে এবং মুখ ফিরিয়ে নেয় ? ১৪) সে কি জানে না, আল্লাহ দেখছেন? [১১] ১৫) কখনই নয়, [১২] যদি সে বিরত না হয় তাহলে আমি তার কপালের দিকের চুল ধরে তাকে টানবো, ১৬) সেই কপালের চুল (ওয়ালা) যে মিথ্যুক ও কঠিন অপরাধকারী। [১৩] ১৭) সে তার সমর্থক দলকে ডেকে নিক[১৪] ১৮) আমি ডেকে নিই আযাবের ফেরেশতাদেরকে। [১৫] ১৯) কখনই নয়, তার কথা মেনে নিয়ো না, তুমি সিজদা করো এবং (তোমার রবের) নৈকট্য অর্জন করো।[১৬]

আয়াত সমূহের ব্যাখ্যা

১. ইতোপূর্বে ভূমিকায় বলে এসেছি, ফেরেশতা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন, পড়ো। তিনি জবাবে দিলেন, আমি পড়া জানি না। এ থেকে জানা যায়, ফেরেশতা অহীর এই শব্দগুলো লিখিত আকারে তাঁর সামনে পেশ করেছিলেন

www.pathagar.com

এবং তাঁকে সেগুলো পড়তে বলেছিলেন। কারণ ফেরেশতার কথার অর্থ যদি এই হতো, আমি বলতে থাকি এবং আপনি পড়তে থাকুন তাহলে আমি পড়া জানি না একথা বলা তাঁর প্রয়োজন হতো না।

২. অর্থাৎ তোমার রবের নাম নিয়ে পড়ো। অন্য কথায়, বিস্‌মিল্লাহ্‌ বলো এবং পড়ো। এ থেকে একথাও জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই অহী আসার আগে একমাত্র আল্লাহকেই জানতেন ও মানতেন। এ জন্যই তাঁর রবকে, একথা বলার প্রয়োজন হয়নি বরং বলতে হয়েছে, তোমার রবের নাম নিয়ে পড়ো।

৩. শুধু বলা হয়েছে, "সৃষ্টি করেছেন"। কাকে সৃষ্টি করেছেন তা বলা হয়নি। এ থেকে আপনা আপনিই এ অর্থ বের হয়ে আসে, সেই রবের নাম নিয়ে পড়ো যিনি স্রষ্টা, যিনি সমগ্র বিশ্ব-জাহান এবং বিশ্ব-জাহানের প্রতিটি জিনিস সৃষ্টি করেছেন।

৪. সাধারণভাবে বিশ্ব-জাহানের সৃষ্টির কথা বলার পর বিশেষ করে মানুষের কথা বলা হয়েছে যে, মহান আল্লাহ কেমন হীন অবস্থা থেকে তার সৃষ্টি পর্ব শুরু করে তাকে পূর্ণাঙ্গ মানুষে রূপান্তরিত করেছেন। আরবী আলাক হচ্ছে আলাকাহ শব্দের বহুবচন। এর মানে জমাট বাঁধা রক্ত। গর্ভ সঞ্চারের পর প্রথম কয়েক দিনের মধ্যে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় এটি হচ্ছে সেই প্রাথমিক অবস্থা। তারপর তা গোশতের আকৃতি ধারণ করে। এরপর পর্যায়ক্রমে মানুষের আকৃতি লাভের কার্যক্রম শুরু হয়। (বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল হজ্জ ৫ আয়াত, ৫ থেকে ৭ টীকা)

৫. অর্থাৎ তাঁর অশেষ মেহেরবানী। এই হীনতম অবস্থা থেকে শুরু করে তিনি মানুষকে জ্ঞানের অধিকারী করেছেন এটি সৃষ্টির সবচেয়ে বড় গুণ হিসেবে স্বীকৃত। আর তিনি মানুষকে কেবল জ্ঞানের অধিকারীই করেননি, কলম ব্যবহার করে তাকে লেখার কৌশল শিখিয়েছেন। এর ফলে কলম জ্ঞানের ব্যাপক প্রসার, উন্নতি এবং বংশানুক্রমিক প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণের মাধ্যমে পরিণত হয়েছে। যদি তিনি ইলহামী চেতনার সাহায্যে মানুষকে কসম ব্যবহার করার ও লেখার কৌশল না শেখাতেন তাহলে মানুষের জ্ঞানগত যোগ্যতা স্তব্ধ ও পঙ্গু হয়ে যেতো। তার বিকশিত ও সম্প্রসারিত হবার এবং বংশানুক্রমিক অগ্রগতি তথা এক বংশের জ্ঞান আর এক বংশে পৌঁছে যাবার এবং সামনের দিকে আরো উন্নতি ও অগ্রগতি লাভ করার সুযোগই তিরোহিত হতো।

৬. অর্থাৎ মানুষ আসলে ছিল সম্পূর্ণ জ্ঞানহীন। আল্লাহর কাছ থেকে সে যা কিছু জ্ঞান লাভ করেছে। আল্লাহ যে পর্যায়ে মানুষের জন্য জ্ঞানের দরজা যতটুকু খুলতে চেয়েছেন ততটুকুই তার জন্য খুলে গিয়েছে। আয়াতুল কুরসীতে একথাটি এভাবে বলা হয়েছে : "আর লোকেরা তাঁর জ্ঞান থেকে তিনি যতটুকু চান তার বেশী কিছুই আয়ত্ব করতে পারে না"। (আল বাকারাহ ২৫৫) যেসব জিনিসকে মানুষ নিজের তাত্বিক আবিষ্কার বলে মনে করে সেগুলো আসলে প্রথমে তার জ্ঞানের আওতায় ছিল না। আল্লাহ যখন চেয়েছেন তখনই তার জ্ঞান তাকে দিয়েছে। মানুষ কোনক্রমেই অনুভব করতে পারেনি যে, আল্লাহ তাকে এ জ্ঞান দান করছেন।

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর সর্বপ্রথম যে আয়াতগুলো নাযিল হয়েছিল সেগুলোর আলোচনা এখান পর্যন্ত শেষ। যেমন হযরত আয়েশার (রা) হাদীস থেকে জানা যায়ঃ এই প্রথম অভিজ্ঞতাটি খুব বেশী কঠিন ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চাইতে বেশী বরদাশত করতে পারতেন না। তাই তখন কেবল এতটুকু বলাই যথেষ্ট মনে করা হয়েছে যে, তিনি যে রবকে প্রথম থেকে জানেন ও মানেন তিনি সরাসরি তাঁকে সম্বোধন করছেন। তাঁর পক্ষ থেকে অহীর সিলসিলা শুরু হয়ে গেছে এবং তাঁকে তিনি নিজের নবী বানিয়ে নিয়েছেন। এর বেশ কিছুকাল পরে সূরা আল মুদ্দাস্‌সিরের প্রথম দিকের আয়াতগুলো নাযিল হয়। সেখানে তাঁকে বলা হয়েছে, নবুওয়াত লাভ করার পর এখন কি কি কাজ করতে হবে। (আরও ব্যাখ্যার জন্য পড়ুন তাফহীমুল কুরআন সূরা আল মুদ্দাস্‌সিরের ভূমিকা)।

৭. অর্থাৎ যে মেহেরবান আল্লাহ এত বড় মেহেরবানী করেছেন তাঁর মোকাবেলায় মূর্খতার বশবর্তী হয়ে কখনো এমন কর্মনীতি অবলম্বন করা উচিত নয় যা সামনের দিকে বর্ণনা করা হচ্ছে।

৮. অর্থাৎ দুনিয়ায় ধন-দৌলত, সম্মান-প্রতিপত্তি যা কিছু সে চাইতো তার সবই সে লাভ করেছে এ দৃশ্য দেখে সে কৃতজ্ঞ হবার পরিবর্তে বরং বিদ্রোহের পথ অবলম্বন করেছে এবং সীমালংঘন করতে শুরু করেছে।

৯. অর্থাৎ দুনিয়ায় সে যা ই কিছু অর্জন করে থাকুক না কেন এবং তার ভিত্তিতে অহংকার ও বিদ্রোহ করে ফিরুক না কেন, অবশেষে তাকে তোমার রবের কাছেই ফিরে যেতে হবে। তখন এই মনোভাব ও কর্মনীতির পরিণাম সে জানতে পারবে।

১০. বান্দা বলতে এখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বুঝানো হয়েছে। এ পদ্ধতিতে কুরআনের কয়েক জায়গায় তাঁর উল্লেখ করা হয়েছে। যেমনঃ

"পবিত্র সেই সত্তা, যিনি তাঁর বান্দাকে নিয়ে গিয়েছেন এক রাতে মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসার দিকে"। (বনি ইসরাঈল ১)

"সমস্ত প্রশংসা সেই সত্তার যিনি তাঁর বান্দার ওপর নাযিল করেছেন কিতাব"। (আল কাহফ ১)

"আর আল্লাহর বান্দা যখন তাকে ডাকার জন্য দাঁড়ালো তখন লোকেরা তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য তৈরি হলো"। (আল জ্বিন ১৯)

এ থেকে জানা যায়, এটা ভালোবাসার একটা বিশেষ ধরনের প্রকাশভঙ্গি। এ পদ্ধতিতে আল্লাহ তাঁর কিতাবে তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা উল্লেখ করেছেন। এ ছাড়াও এ থেকে জানা যায়, মহান আল্লাহ নবুওয়াতের দায়িত্বে নিযুক্ত করার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নামায পড়ার পদ্ধতি শিখিয়ে দিয়েছিলেন। কুরআনের কোথাও এই পদ্ধতির কথা বলা হয়নি। কোথাও বলা হয়নি, হে নবী ! তুমি এভাবে নামায পড়ো। কাজেই কুরআনের যে অহী লিখিত হয়েছে কেবলমাত্র এই অহীটুকুই যে রাসূলের (সা) ওপর নাযিল হতো না,এটি তার আর একটি

www.pathagar.com

প্রমাণ। বরং এরপরও অহীর মাধ্যমে আরো এমন সব বিষয়ের তালিম দেয়া হতো যা কুরআনে লিখিত হয়নি।

১১. বাহ্যত মনে হয়, এখানে প্রত্যেকটি ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তিকে সম্বোধন করা হয়েছে। তাকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে, তুমি কি সেই ব্যক্তির কর্মকলাপ দেখেছো যে আল্লাহর এক বান্দাকে ইবাদত করা থেকে বিরত রাখছে? যদি সেই বান্দা সঠিক পথে থাকে অথবা মানুষকে আল্লাহর ভয় দেখায় এবং খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করে, আর এই ইবাদতে বাধা প্রদানকারী সত্যের প্রতি মিথ্যা আরোপ করে এবং তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে তার এই তৎপরতা সম্পর্কে তুমি কি মনে করো। যে ব্যক্তি এই কর্মনীতি অবলম্বন করেছে সে যদি জানতো, যে বান্দা নেকীর কাজ করে আল্লাহ তাকেও দেখেন আবার যে সত্যের প্রতি মিথ্যা আরোপ করে এবং তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে সচেষ্ট তাকেও দেখেন, তাহলে সে কি এই কর্মনীতি অবলম্বন করতে পারতো? আল্লাহ জালেমের জুলুম দেখছেন এবং মজলুমের মজলুমীও দেখছেন। তাঁর এই দেখা এ বিষয়টিকে অবশ্যম্ভাবী করে তুলেছে যে, তিনি জালেমের শাস্তি দেবেন এবং মজলুমের ফরিয়াদ শুনবেন।

১২. অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি নামায পড়েন তাহলে এই ব্যক্তি নিজের পায়ের চাপে তার ঘাড় পিষে ফেলবে বলে যে হুমকি দিচ্ছে তা কখনো সম্ভবপর হবে না। সে কখনো এমনটি করতে পারবে না।

১৩. কপালের দিক বলে এখানে যার কপাল তাকে বুঝানো হয়েছে।

১৪. যেমন ভূমিকায় আমরা বলেছি, আবু জেহেলের হুমকির জবাবে যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ধমক দিয়েছিলেন তখন সে বলেছিল, হে মুহাম্মাদ! তুমি কিসের জোরে আমাকে ভয় দেখাচ্ছো? আল্লাহর কসম, এই উপত্যকায় আমার সমর্থকের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী। তার এই কথায় এখানে বলা হচ্ছে: নাও, এখন তাহলে তোমার সেই সমর্থকদের ডেকে নাও।

১৫. মূলে 'যাবানিয়াহ' (আরবী الزبانية) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কাতাদাহর ব্যাখ্যা অনুযায়ী এটি আরবী ভাষায় পুলিশের প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আর "যাবান" শব্দের আসল মানে হচ্ছে, ধাক্কা দেয়া। রাজা বাদশাহদের দরবারে লাঠিদারী সুবেদার থাকতো। তাদের কাজ হতো যার প্রতি বাদশাহ নারাজ হতেন তাকে ধাক্কা দিয়ে দরবার থেকে বের করে দেয়া। কাজেই এখানে আল্লাহর বাণীর অর্থ হচ্ছে, সে তার সমর্থকদেরকে ডেকে আনুক, আর আমি আমার পুলিশ বাহিনী তথা আযাবের ফেরেশতাদেরকে ডেকে আনি। এই আযাবের ফেরেশতারা তার সমর্থকদেরকে ঠান্ডা করে দিক।

www.pathagar.com

১৫ রামাদান

বিষয়: আল্লাহর দ্বীনকে বিজয় করার প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা

সূরা নিসা: ৭১-৭৯

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ خُذُواْ حِذْرَكُمْ فَانفِرُواْ ثُبَاتٍ أَوِ انفِرُواْ جَمِيعًا (71) وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن
لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا (72) وَلَئِنْ
أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ الله لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ
فَوْزًا عَظِيمًا (73) فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلْ
فِي سَبِيلِ اللّهِ فَيُقْتَلْ أَو يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (74) وَمَا لَكُمْ لاَ تُقَاتِلُونَ فِي
سَبِيلِ اللّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ
هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا (75)
الَّذِينَ آمَنُواْ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُواْ
أَوْلِيَاء الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا (76) أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّواْ
أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ
النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُواْ رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ
قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدَّنْيَا قَلِيلٌ وَالآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَى وَلاَ تُظْلَمُونَ فَتِيلاً (77) أَيْنَمَا تَكُونُواْ
يُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُواْ هَذِهِ مِنْ عِندِ اللّهِ
وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُواْ هَذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلًّ مِّنْ عِندِ اللّهِ فَمَا لِهَؤُلاء الْقَوْمِ لاَ يَكَادُونَ
يَفْقَهُونَ حَدِيثًا (78)

৭১) হে ঈমানদারগণ! মোকাবিলা করার জন্য সর্বক্ষণ প্রস্তুত থাকো। [১০১] তারপর সুযোগ পেলে পৃথক পৃথক বাহিনীতে বিভক্ত হয়ে বের হয়ে পড়ো অথবা এক সাথে। ৭২) হ্যাঁ, তোমাদের কেউ কেউ এমনও আছে যে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে গড়িমসি করে। [১০২] যদি তোমাদের ওপর কোন মুসিবত এসে পড়ে তাহলে সে বলে আল্লাহ আমার প্রতি বড়ই অনুগ্রহ করেছেন, আমি তাদের সাথে যাইনি। ৭৩) আর যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করা হয়, তাহলে সে বলে এবং এমনভাবে বলে যেন তোমাদের ও তার মধ্যে কোন প্রীতির সম্পর্ক ছিলনা, হায়! যদি আমিও তাদের সাথে থাকতাম তাহলে বিরাট সাফল্য লাভ করতাম। ৭৪) (এই ধরনের লোকদের জানা উচিত) আল্লাহর পথে তাদের লড়াই করা উচিত যারা আখেরাতের বিনিময়ে দুনিয়ার জীবন বিকিয়ে দেয়। [১০৩] তারপর যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে লড়বে এবং মারা যাবে অথবা

www.pathagar.com

বিজয়ী হবে তাকে নিশ্চয়ই আমি মহাপুরস্কার দান করবো। ৭৫) তোমাদের কী হলো, তোমরা আল্লাহর পথে অসহায় নর-নারী ও শিশুদের জন্য লড়ছনা, যারা দুর্বলতার কারণে নির্যাতিত হচ্ছে? তারা ফরিয়াদ করছে, হে আমাদের রব! এই জনপদ থেকে আমাদের বের করে নিয়ে যাও, যার অধিবাসীরা জালেম এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের কোন বন্ধু, অভিভাবক ও সাহায্যকারী তৈরী করে দাও। [১০৪] ৭৬) যারা ঈমানের পথ অবলম্বন করেছে তারা লড়াই করে আল্লাহর পথে এবং যারা কুফরীর পথ অবলম্বন করেছে তারা লড়াই করে তাগুতের পথে। [১০৫] কাজেই শয়তানের সহযোগীদের সাথে লড়ো এবং নিশ্চিত জেনে রাখো, শয়তানের কৌশল আসলে নিতান্তই দুর্বল। [১০৬] ৭৭) তোমরা কি তাদেরকেও দেখেছো, যাদেরকে বলা হয়েছিল, তোমাদের হাত গুটিয়ে রাখো এবং নামায কায়েম করো ও যাকাত দাও? এখন তাদেরকে যুদ্ধের হুকুম দেয়ায় তাদের একটি দলের অবস্থা এই দাঁড়িয়েছে যে, তারা মানুষকে এমন ভয় করেছে যেমন আল্লাহকে ভয় করা উচিত অথবা তার চেয়েও বেশী। [১০৭] তারা বলছে: হে আমাদের রব! আমাদের জন্য এই যুদ্ধের হুকুমনামা কেন লিখে দিলে? আমাদের আরো কিছু সময় অবকাশ দিলে না কেন? তাদেরকে বলো: দুনিয়ার জীবন ও সম্পদ অতি সামান্য এবং একজন আল্লাহর ভয়ে ভীত মানুষের জন্য আখেরাতই উত্তম। আর তোমাদের ওপর এক চুল পরিমাণও জুলুম করা হবে না। [১০৮] ৭৮) আর মৃত্যু, সে তোমরা যেখানেই থাকো না কেন সেখানে তোমাদের নাগাল পাবেই, তোমরা কোন মজবুত প্রসাদে অবস্থান করলেও। যদি তাদের কোন কল্যাণ হয় তাহলে তারা বলে, এতো আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়েছে। আর কোন ক্ষতি হলে বলে, এটা হয়েছে তোমার বদৌলতে। [১০৯] বলে দাও, সবকিছুই হয় আল্লাহর পক্ষ থেকে। লোকদের কী হয়েছে, কোন কথাই তারা বোঝে না।

আয়াত সমূহের ব্যাখ্যা

১০১. উল্লেখ্য এ ভাষণটি এমন এক সময় নাযিল হয়েছিল যখন ওহুদ যুদ্ধের পরাজয়ের পর মদীনার পার্শ্ববর্তী এলাকার গোত্রগুলোর সাহস বেড়ে গিয়েছিল এবং বিপদ আপদ চতুর্দিক থেকে মুসলমানদেরকে ঘিরে ফেলেছিল। সে সময় প্রায় প্রতিদিনই নানান ধরনের দুঃসংবাদ আসতো। অমুক গোত্র বিরূপ হয়ে গেছে। মুসলমানদের সাথে এক নাগাড়ে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছিল। তাদের প্রচারকদেরকে দ্বীন প্রচারের উদ্দেশ্যে দাওয়াত দিয়ে ধোঁকা দিয়ে হত্যা করা হতো। মদীনার বাইরে তাদের জানমালের কোন নিরাপত্তা ছিল না। এ অবস্থায় এসব বিপদের ঢেউয়ের আঘাতে যাতে ইসলামের তরী ডুবে না যায় সেজন্য মুসলমানদের পক্ষ থেকে একটি জোরদার প্রচেষ্টা ও জীবন উৎসর্গকারী সংগ্রাম পরিচালনার প্রয়োজন ছিল।

১০২. এর এক অর্থ এও হতে পারে যে, নিজে তো গড়িমসি করেই এমন কি অন্যদেরকে ও হিম্মতহারা করে দেয়, তাদের বুকে ভয় ঢুকিয়ে দেয় এবং জিহাদ বন্ধ

www.pathagar.com

করার জন্য এমন ধরনের কথা বলতে থাকে যার ফলে তারা নিজেদের জায়গায় চুপচাপ বসে থাকে।

১০৩. অর্থাৎ আল্লাহর পথে লড়াই করা দুনিয়ার লাভ ও দুনিয়ার স্বার্থ পূজারী লোকদের কাজ নয়। এটা এমন এক ধরনের লোকের কাজ যারা কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য কাজ করে, যারা আল্লাহ ও আখেরাতের ওপর পূর্ণ আস্থা রাখে এবং নিজেদের পার্থিব প্রাচূর্য ও সমৃদ্ধির সমস্ত সম্ভাবনা ও সব ধরনের পার্থিব স্বার্থ একমাত্র আল্লাহর জন্য ত্যাগ করতে প্রস্তুত হয়ে যায়। তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হয়, তাদের রব যেন তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান এবং এই দুনিয়ায় তাদের ত্যাগ কুরবানী বিফল হয়ে গেলেও আখেরাতেও যেন বিফল না যায়।

১০৪. এখানে এমন সব মজলুম শিশু, নারী ও পুরুষদের দিকে ইংগিত করা হয়েছে, যারা মক্কায় ও আরবের অন্যান্য গোত্রের মধ্যে ইসলাম গ্রহণ করেছিল কিন্তু তাদের হিজরত করার শক্তি ছিল না এবং নিজেদেরকে কাফেরদের জুলুম-নির্যাতন থেকে রক্ষা করার ক্ষমতাও ছিল না। এদের ওপর বিভিন্ন প্রকার জুলুম চালানো হচ্ছিল। কেউ এসে তাদেরকে এই জুলুমের সাগর থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবে, এই ছিল তাদের দোয়া ও প্রত্যাশা।

১০৫. এটি আল্লাহর একটি দ্ব্যর্থহীন ফয়সালা। আল্লাহর পৃথিবীতে একমাত্র আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে লড়াই করা হচ্ছে ঈমানদারদের কাজ। যথার্থ ও সত্যিকার মুমিন এই কাজ থেকে কখনো বিরত থাকবে না। আর আল্লাহর পৃথিবীতে আল্লাহ বিরোধী ও আল্লাহদ্রোহীদের রাজত্ব ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য তাগুতের পথে লড়াই করা হচ্ছে কাফেরদের কাজ। কোন ঈমানদার ব্যক্তি এ কাজ করতে পারে না।

১০৬. অর্থাৎ আপাত দৃষ্টিতে শয়তান ও তার সাথীরা বিরাট প্রস্তুতি নিয়ে এগিয়ে আসে এবং জবরদস্তিমূলক কৌশল অবলম্বন করে কিন্তু তাদের প্রস্তুতি ও কৌশল দেখে ঈমানদারদের ভীত হওয়া উচিত নয়। অবশ্যই তাদের সকল প্রস্তুতি ও কৌশল ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে।

১০৭. এই আয়াতটির তিনটি অর্থ হয়। এই তিনটি অর্থই তাদের নিজস্ব পরিসরে যথার্থ ও নির্ভুল:

এর একটি অর্থ হচ্ছে: প্রথমে লোকেরা নিজেরাই যুদ্ধ করার জন্য অস্থির হয়ে পড়েছিল। বারবার বলতো: আমাদের ওপর জুলুম করা হচ্ছে। নিপীড়ন নির্যাতন চালানো হচ্ছে। মারপিট করা হচ্ছে। গালি গালাজ করা হচ্ছে। আমরা আর কতদিন সবর করবো। আমাদের মোকাবিলা করার অনুমতি দেয়া হোক। সে সময় তাদেরকে বলা হতো, সবর করো এবং নামায ও যাকাতের মাধ্যমে নিজেদের সংশোধন করতে থাকো। তখন এই সবর ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন করার হুকুম পালন করা তাদের জন্য বড়ই কষ্টকর হতো।

www.pathagar.com

কিন্তু এখন লড়াই করার হুকুম দেবার পর সেই লড়াইয়ের দাবীদারদের একটি দল শত্রুদের সংখ্যা ও যুদ্ধের বিপদ দেখে আতংকিত হয়ে পড়েছিল।

দ্বিতীয় অর্থটি হচ্ছেঃ যতদিন নামায, রোযা এবং এই ধরনের নির্ঝঞ্ঝাট ও ঝুঁকিহীন কাজের হুকুম ছিল এবং যুদ্ধ করে প্রাণ দান করার প্রশ্ন সামনে আসেনি ততদিন এরা খাঁটি দ্বীনদার ও ঈমানদার ছিল। কিন্তু এখন সত্যের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করার কাজ শুরু হতেই এরা ভীত ও আতংকিত হয়ে পড়েছে।

এর তৃতীয় অর্থটি হচ্ছেঃ প্রথমে তো লুটপাট করার ও নিজের স্বার্থোদ্ধারের লড়াই চালিয়ে যাবার জন্য তাদের তরবারী সবসময় কোষমুক্ত থাকতো এবং রাতদিন যুদ্ধ-বিগ্রহই ছিল তাদের কাজ। সে সময় তাদেরকে রক্তপাত থেকে বিরত রাখার জন্য নামায ও যাকাতের মাধ্যমে নফসের সংশোধন করার হুকুম দেয়া হয়েছিল। আর এখন আল্লাহর জন্য তলোয়ার ওঠাবার হুকুম দেবার পর দেখা যাচ্ছে, যারা স্বার্থোদ্ধারের লড়াইয়ের ক্ষেত্রে সিংহ ছিল আল্লাহর জন্য লড়াইয়ের ক্ষেত্রে তারা হয়ে গেছে বুজদিল কাপুরুষ। নফস ও শয়তানের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য যে হাতে ইতিপূর্বে তরবারী ঝলসে উঠেছিল, আল্লাহর পথে তরবারী চালাবার প্রশ্নে সে হাত নিস্তেজ হয়ে পড়েছে।

এ তিনটি অর্থই বিভিন্ন ধরনের লোকদের আচরণের সাথে খাপ খেয়ে যায়। এখানে আয়াতের মধ্যে এমন ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যা একই সাথে এই তিনটি অর্থই প্রকাশ করতে সক্ষম।

১০৮. অর্থাৎ যখন তোমরা আল্লাহর দ্বীনের খেদমত করবে এবং পথে প্রাণপাত পরিশ্রম করতে থাকবে তখন আল্লাহর কাছে তোমাদের প্রতিদান নষ্ট হয়ে যাওয়ার কোন সম্ভাবনাই নেই।

১০৯. অর্থাৎ যখন বিজয় ও সাফল্য আসে তখন তাকে আল্লাহর অনুগ্রহ গণ্য করে থাকো এবং একথা ভুলে যাও যে, আল্লাহ তাঁর নবীর মাধ্যমেই এই অনুগ্রহ করেছেন। কিন্তু নিজেদের দুর্বলতা ও ভুলের জন্য কোথাও পরাজয় বরণ করে থাকলে এবং সামনে এগিয়ে যাওয়া পা পিছিয়ে আসতে থাকলে তখন নবীর ঘাড়েই সব দোষ চাপিয়ে দিয়ে নিজেরা দায়মুক্ত হতে চাও।

www.pathagar.com

১৬ রামাদান

বিষয়: দাওয়াত

সূরা হামীম সিজদাহ: ২৪-২৭

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ (33) وَلا
تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ
حَمِيمٌ (34) وَمَا يُلَقَّاهَا إِلاَّ الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلاَّ ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ (35) وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ
مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (36)

৩৩) সেই ব্যক্তির কথার চেয়ে আর কার কথা উত্তম হবে যে আল্লাহর দিকে ডাকলো, সৎ কাজ করলো এবং ঘোষণা করলো আমি মুসলমান।[৩৬]

৩৪) হে নবী, সৎ কাজ ও অসৎ কাজ সমান নয়। তুমি অসৎ কাজকে সেই নেকী দ্বারা নিবৃত্ত করো যা সবচেয়ে ভাল। তাহলে দেখবে যার সাথে তোমার শত্রুতা ছিল সে অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে গিয়েছে।[৩৭]

৩৫) ধৈর্যশীল ছাড়া এ গুণ আর কারো ভাগ্যে জোটে না।[৩৮] এবং অতি ভাগ্যবান ছাড়া এ মর্যাদা আর কেউ লাভ করতে পারে না।[৩৯]

৩৬) যদি তোমরা শয়তানের পক্ষ থেকে কোন প্ররোচনা আঁচ করতে পার তাহলে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করো[৪০] তিনি সব কিছু শোনেন এবং জানেন।[৪১]

আয়াত সমূহের ব্যাখ্যা

৩৬. মু'মিনদের সান্ত্বনা দেয়া এবং মনোবল সৃষ্টির পর এখন তাদেরকে তাদের আসল কাজের প্রতি উৎসাহিত করা হচ্ছে। আগের আয়াতে তাদের বলা হয়েছিলো, আল্লাহর বন্দেগীর ওপর দৃঢ়পদ হওয়া এবং এই পথ গ্রহণ করার পর পুনরায় তা থেকে বিচ্যুত না হওয়াটাই এমন একটা মৌলিক নেকী যা মানুষকে ফেরেশতার বন্ধু এবং জান্নাতের উপযুক্ত বানায়। এখন তাদের বলা হচ্ছে, এর পরবর্তী স্তর হচ্ছে, তোমরা নিজে নেক কাজ করো, অন্যদেরকে আল্লাহর বন্দেগীর দিকে ডাকো এবং ইসলামের ঘোষণা দেয়াই যেখানে নিজের জন্য বিপদাপদ ও দুঃখ-মুসিবতকে আহ্বান জানানোর শামিল এমন কঠিন পরিবেশেও দৃঢ়ভাবে ঘেষণা করো, আমি মুসলমান। মানুষের জন্য এর চেয়ে উঁচুস্তর আর নেই। এ কথার গুরুত্ব পুরোপুরি উপলব্ধি করার জন্য যে পরিস্থিতিতে তা বলা হয়েছে তার প্রতি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। সে সময় অবস্থা ছিল এই যে, যে ব্যক্তিই মুসলমান হওয়ার কথা প্রকাশ করতো সে হঠাৎ করেই অনুভব করতো যেন হিংস্র শ্বাপদ ভরা জংগলে পা দিয়েছে যেখানে সবাই তাকে ছিঁড়ে ফেঁড়ে খাওয়ার জন্য ছুটে আসছে। যে ব্যক্তি আরো একটু অগ্রসর হয়ে ইসলাম প্রচারের জন্য মুখ খুলেছে সে যেন তাকে ছিঁড়ে ফেঁড়ে খাওয়ার জন্য হিংস্র পশুকূলকে আহ্বান জানিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে বলা হয়েছে, কোন ব্যক্তির আল্লাহকে রব হিসেবে স্বীকার করে সোজা পথ গ্রহণ করা এবং তা থেকে বিচ্যুত না হওয়া নিঃসন্দেহে বড় ও মৌলিক কাজ।

www.pathagar.com

কিন্তু আমি মুসলমান বলে কোন ব্যক্তির ঘোষণা করা পরিণামের পরোয়া না করে সৃষ্টিকে আল্লাহর বন্দেগীর দিকে আহবান জানানো এবং কেউ যাতে ইসলাম ও তার ঝান্ডাবাহীদের দোষারোপ ও নিন্দাবাদ করার সুযোগ না পায় এ কাজ করতে গিয়ে নিজের তৎপরতাকে সেভাবে পবিত্র রাখা হচ্ছে পূর্ণ মাত্রার নেকী।

৩৭. এ কথার অর্থও পুরোপুরি বুঝার জন্য যে অবস্থায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ও তাঁর মাধ্যমে তাঁর অনুসারীদেরকে এ নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো তা বিবেচনায় থাকা দরকার। তখন অবস্থা ছিল এই যে, চরম হঠকারিতা এবং আক্রমণাত্মক বিরোধিতার মাধ্যমে ইসলামী আন্দোলনের মোকাবিলা করা হচ্ছিলো যেখানে নৈতিকতা, মানবতা এবং ভদ্রতার সমস্ত সীমা লংঘন করা হয়েছিলো। নবী (সা) ও তাঁর সংগী সাথীদের বিরুদ্ধে সব রকমের মিথ্যা আরোপ করা হচ্ছিলো। তাঁকে বদনাম করা এবং তাঁর সম্পর্কে লোকের মনে খারাপ ধারণা সৃষ্টি করে দেয়ার জন্য সব রকমের দুষ্টবুদ্ধি ও কৌশল কাজে লাগানো হচ্ছিলো। তাঁর বিরুদ্ধে নানা রকমের অপবাদ আরোপ করা হচ্ছিলো এবং শত্রুতামূলক প্রচারণার জন্য পুরো একদল লোক তাঁর বিরুদ্ধে মানুষের মনে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি করে যাচ্ছিলো। তাঁকে, তাঁর সঙ্গীদেরকে সর্ব প্রকার কষ্ট দেয়া হচ্ছিলো। তাতে অতিষ্ঠ হয়ে একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মুসলমান দেশ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিল। তাছাড়া তাঁর ইসলাম প্রচারের ধারাকে বাধাগ্রস্ত করার জন্য পরিকল্পনা মাফিক হৈ চৈ ও হট্টগোলকারী একদল লোককে সব সময় ওঁৎ পেতে থাকার জন্য তৈরী করা হয়েছিল। যখনই তিনি ন্যায় ও সত্যের দাওয়াত দেয়ার জন্য কথা বলতে শুরু করবেন তখনই তারা শোরগোল করবে এবং কেউ তাঁর কথা শুনতে পাবে না। এটা এমনই একটা নিরুৎসাহ ব্যঞ্জক পরিস্থিতি ছিল যে, বাহ্যিকভাবে আন্দোলনের সকল পথ রুদ্ধ বলে মনে হচ্ছিলো। বিরোধিতা নস্যাৎ করার জন্য সেই সময় নবীকে (সা) এসব পন্থা বলে দেয়া হয়েছিলো।

প্রথম কথা বলা হয়েছে, সৎকর্ম ও দুষ্কর্ম সমান নয়। অর্থাৎ তোমাদের বিরোধীরা যত ভয়ানক তুফানই সৃষ্টি করুক না কেন এবং তার মোকাবিলায় নেকীকে যত অক্ষম ও অসহায়ই মনে হোক না কেন দুষ্কর্মের নিজের মধ্যেই এমন দুর্বলতা আছে যা শেষ পর্যন্ত তাকে ব্যর্থ করে দেয়। কারণ, মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ ততক্ষণ পর্যন্ত তার স্বভাব প্রকৃতি দুষ্কর্মকে ঘৃণা না করে পারে না। দুষ্কর্মের সহযোগীই শুধু নয় তার ধ্বজাধারী পর্যন্ত মনে মনে জানে যে, সে মিথ্যাবাদী ও অত্যাচারী এবং সে তার উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য হঠকারিতা করছে। এ জিনিসটি অন্যদের মনে তার প্রতি সম্মানবোধ সৃষ্টি করা তো দূরের কথা নিজের কাছেই তাকে খাটো করে দেয়। এভাবে তার নিজের মনের মধ্যেই এক চোর জন্ম নেয়। শত্রুতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণের সময় এই চোর ভেতর থেকেই তার সংকল্প ও মনোবলের ওপর সংগোপনে হানা দিতে থাকে। এই দুষ্কর্মের মোকাবিলায় যে সৎ কর্মকে সম্পূর্ণ অক্ষম ও অসহায় বলে মনে হয় তা যদি ক্রমাগত তৎপরতা চালিয়ে যেতে থাকে তাহলে শেষ পর্যন্ত সে-ই বিজয়ী হয়। কারণ, প্রথমত সৎ কর্ম নিজেই একটি শক্তি যা হৃদয়-মনকে জয় করে এবং ব্যক্তি যতই শত্রুতাভাবাপন্ন হোক না কেন

www.pathagar.com

সে নিজের মনে তার জন্য সম্মানবোধ না করে পারে না। তাছাড়া নেকী ও দুষ্কর্ম যখন সামনা সামনি সংঘাতে লিপ্ত হয় এবং উভয়ের গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য পুরোপুরি উন্মোচিত হয় এমন পরিস্থিতিতে কিছুকাল সংঘাতে লিপ্ত থাকার পর এমন খুব কম লোকই থাকতে পারে যারা দুষ্কর্মের প্রতি ঘৃণা পোষণ করবে না এবং সৎ কর্মের প্রতি আকৃষ্ট হবে না।

দ্বিতীয় কথাটি বলা হয়েছে এই যে, দুষ্কর্মের মোকাবিলা শুধুমাত্র সৎ কর্ম দিয়ে নয়, অনেক উঁচুমানের সৎকর্ম দিয়ে করো। অর্থাৎ কেউ যদি তোমাদের সাথে খারাপ আচরণ করে আর তুমি তাকে ক্ষমা করে দাও তাহলে শুধু সৎকর্ম। উন্নত পর্যায়ের সৎকর্ম হচ্ছে, যে তোমার সাথে খারাপ আচরণ করবে সুযোগ পেলে তুমি তাঁর প্রতি অনুগ্রহ করো।

এর সুফল বলা হয়েছে এই যে, জঘন্যতম শত্রুও এভাবে অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে যাবে। কারণ, এটিই মানুষের প্রকৃতি। আপনি যদি গালির জবাব না দিয়ে চুপ থাকেন তাহলে নিঃসন্দেহে তা হবে একটি নেকী বা সৎকর্ম। অবশ্য তা গালি দাতার মুখ বন্ধ করতে পারবে না। কিন্তু গালির জবাবে আপনি যদি তার কল্যাণ কামনা করেন তাহলে চরম নির্লজ্জ শত্রুও লজ্জিত হবে এবং আর কখনো আপনার বিরুদ্ধে অশালীন কথা বলার জন্য মুখ খোলা তার জন্য কঠিন হবে। একজন লোক আপনার ক্ষতি করার কোন সুযোগই হাত ছাড়া হতে দেয় না। আপনি যদি তার অত্যাচার বরদাশত করে যেতে থাকেন তাহলে সে হয়তো তার দুষ্কর্মের ব্যাপারে আরো সাহসী হয়ে উঠবে। কিন্তু কোন পরিস্থিতিতে সে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তখন যদি আপনি তাকে রক্ষা করেন তাহলে আপনার একান্ত অনুগত হয়ে যাবে। কারণ ঐ সুকৃতির মোকাবিলায় কোন দুষ্কৃতিই টিকে থাকতে পারে না। তা সত্ত্বেও এই সাধারণ নিয়মকে এ অর্থে গ্রহণ করা ঠিক নয় যে, উন্নত পর্যায়ের সৎকর্মের মাধ্যমে সব রকমের শত্রুরা অনিবার্যরূপে অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে যাবে। পৃথিবীতে এমন জঘন্য মনের মানুষও আছে যে, তার অত্যাচার ক্ষমা করা ও দুষ্কৃতির জবাব অনুকম্পা ও সুকৃতির মাধ্যমে দেয়ার ব্যাপারে আপনি যতই তৎপর হোন না কেন তার বিচ্ছুর ন্যায় বিষাক্ত হুলের দংশনে কখনো ভাটা পড়বে না। তবে এ ধরনের মূর্তিমান খারাপ মানুষ প্রায় ততটাই বিরল যতটা বিরল মূর্তিমান ভাল মানুষ।

৩৮. অর্থাৎ এটা অত্যন্ত কার্যকর ব্যবস্থা হলেও তা কাজে লাগানো কোন ছেলেখেলা নয়। এ জন্য দরকার সাহসী লোকের। এ জন্য দরকার দৃঢ়সংকল্প, সাহস, অপরিসীম সহনশীলতা এবং চরম আত্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা। সাময়িকভাবে কেউ কোন দুষ্কর্মের মোকাবিলায় সৎকর্ম করতে পারে। এটা কোন অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। কিন্তু যে ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তিকে এমন সব বাতিলপন্থী দুষ্কৃতিকারীদের বিরুদ্ধে ন্যায় ও সত্যের জন্য লড়াই করতে হয় যারা নৈতিকতার যে কোন সীমালংঘন করতে দ্বিধা করে না এবং শক্তি ও ক্ষমতার নেশায় চুর হয়ে আছে সেখানে দুষ্কর্মের মোকাবিলা সৎকর্ম দিয়ে করে যাওয়া তাও আবার উঁচু মাত্রার সৎকর্ম দিয়ে এবং একবারও নিয়ন্ত্রণের বাগডোর হাত ছাড়া হতে না দেয়া কোন সাধারণ মানুষের কাজ নয়। কেবল সেই ব্যক্তিই এ কাজ করতে পারে যে বুঝে শুনে ন্যায় ও সত্যকে সমুন্নত করার জন্য কাজ করার দৃঢ়সংকল্প গ্রহণ করেছে, যে

www.pathagar.com

তার প্রবৃত্তিকে সম্পূর্ণরূপে জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিচার শক্তির অনুগত করে নিয়েছে এবং যার মধ্যে নেকী ও সততা এমন গভীরভাবে শিকড় গেড়ে বসেছে যে, বিরোধীদের কোন অপকর্ম ও নোংরামি তাকে তার উচ্চাসন থেকে নামিয়ে আনতে সফল হতে পারে না।

৩৯. এটা প্রকৃতির বিধান। অত্যন্ত উঁচু মর্যাদার মানুষই কেবল এসব গুণাবলীর অধিকারী হয়ে থাকে। আর যে ব্যক্তি এসব গুণাবলীর অধিকারী হয় দুনিয়ার কোন শক্তিই তাকে সাফল্যের মনযিলে মকসুদে পৌছা থেকে বিরত রাখতে পারে না। নীচ প্রকৃতির মানুষ তাদের হীন চক্রান্ত, জঘন্য কৌশল এবং কুৎসিত আচরণ দ্বারা তাকে পরাস্ত করবে তা কোনভাবেই সম্ভব নয়।

৪০. শয়তান যখন দেখে হক ও বাতিলের লড়াইয়ে ভদ্রতা ও শিষ্টাচার দ্বারা হীনতার এবং সুকৃতি দ্বারা দুস্কৃতির মোকাবিলা করা হচ্ছে তখন সে চরম অস্বস্তির মধ্যে পড়ে যায়। সে চায় কোনভাবে একবারের জন্য হলেও হকের জন্য সংগ্রামকারী বিশেষ করে তাদের বিশিষ্ট লোকজন ও নেতৃবৃন্দের দ্বারা এমন কোন ত্রুটি সংঘটিত করিয়ে দেয়া যাতে সাধারণ মানুষকে বলা যায়, দেখুন খারাপ কাজ এক তরফা হচ্ছে না। এক পক্ষ থেকে নীচ ও জঘন্য কাজ করা হচ্ছে বটে, কিন্তু অপর পক্ষের লোকেরাও খুব একটা উঁচু মর্যাদা সম্পন্ন মানুষ নয়, তারাও তো অমুক হীন আচরণ করেছে। এক পক্ষের অত্যাচার ও বাড়াবাড়ি এবং অপর পক্ষের জবাবী তৎপরতার মধ্যে ইনসাফের সাথে তুলনামূলক বিচারের যোগ্যতা সাধারণ মানুষের মধ্যে থাকে না। যতক্ষণ তারা দেখে বিরোধীরা সব রকমের জঘন্য আচরণ করছে কিন্তু এই লোকগুলো ভদ্রতা ও শিষ্টাচার এবং মর্যাদা নেকী ও সত্যবাদীতার পথ থেকে বিন্দুমাত্রও দূরে সরে যাচ্ছে না, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের ওপর তার গভীর প্রভাব পড়তে থাকে। কিন্তু যদি কোথাও তাদের পক্ষ থেকে কোন অযৌক্তিক বা তাদের মর্যাদার পরিপন্থী আচরণ হয়ে যায়, তা কোন বড় জালুমের প্রতিবাদে হলেও তাদের দৃষ্টিতে তারা উভয়েই সমান হয়ে যায় এবং বিরোধীরাও একটি শক্ত কথার জবাব হঠকারিতার সাহায্যে দেয়ার অজুহাত পেয়ে যায়। এ কারণে বলা হয়েছে, শয়তানের প্রতারণার ব্যাপারে সাবধান থাকো। সে অত্যন্ত দরদী ও সঙ্গকামী সেজে এই বলে তোমাদেরকে উত্তেজিত করবে যে, অমুক অত্যাচার কখনো বরদাশত করা উচিত নয়, অমুক কথার দাঁতভাঙ্গা জবাব দেয়া উচিত এবং এই আক্রমনের জবাবে লড়াই করা উচিত। তা না হলে তোমাদেরকে কাপুরুষ মনে করা হবে এবং তোমাদের আদৌ কোন প্রভাব থাকবে না এ ধরনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তোমারা যখন নিজেদের মধ্যে কোন অযথা উত্তেজনা অনুভব করবে তখন সাবধান হয়ে যাও। কারণ, তা শয়তানের প্ররোচনা। সে তোমাদের উত্তেজিত করে কোন ভুল সংঘটিত করাতে চায়। সাবধান হয়ে যাওয়ার পর মনে করো না আমি আমার মেজাজকে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে রাখছি, শয়তান আমাকে দিয়ে কোন ত্রুটি করাতে পারবে না। নিজের এই ইচ্ছা শক্তির বিভ্রম হবে শয়তানের আরেকটি বেশী ভয়ংকর হাতিয়ার। এর চেয়ে বরং আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা উচিত। কারণ তিনি যদি তাওফীক দান করেন ও রক্ষা করেন তবেই মানুষ ভুল-ত্রুটি থেকে রক্ষা পেতে পারে।

www.pathagar.com

ইমাম আহমদ তাঁর মুসনাদ গ্রন্থে হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে যে ঘটনা উদ্ধৃত করেছেন সেটি এ বিষয়ের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা। তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে একবার এক ব্যক্তি হযরত আবু বকর ছিদ্দীক (রা:) কে অকথ্য গালিগালাজ করতে থাকলো। হযরত আবু বকর চুপচাপ তার গালি শুনতে থাকলেন আর তাঁর দিকে চেয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুচকি হাসতে থাকলেন। অবশেষে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) ধৈর্য হারিয়ে ফেললেন এবং জবাবে তিনিও তাকে একটি কঠোর কথা বলে ফেললেন। তার মুখ থেকে সে কথাটি বের হওয়া মাত্র নবীর (সা) ওপর চরম বিরক্তি ভাব ছেয়ে গেল এবং ক্রমে তা তাঁর পবিত্র চেহারায় ফুটে উঠতে থাকলো। তিনি তখনই উঠে চলে গেলেন। হযরত আবু বকরও উঠে তাঁকে অনুসরণ করলেন এবং পথিমধ্যেই জিজ্ঞেস করলেন, ব্যাপার কি? সে যখন আমাকে গালি দিচ্ছিলো তখন আপনি চুপচাপ মুচকি হাসছিলেন। কিন্তু যখনই আমি তাকে জবাব দিলাম তখনই আপনি অসন্তুষ্ট হলেন? নবী (সা) বললেন: তুমি যতক্ষন চুপচাপ ছিলে ততক্ষন একজন ফেরেশতা তোমার সাথে ছিল এবং তোমার পক্ষ থেকে জবাব দিচ্ছিলো। কিন্তু যখন তুমি নিজেই জবাব দিলে তখন ফেরেশতার স্থানটি শয়তান দখল করে নিল। আমি তো শয়তানের সাথে বসতে পারি না।

৪১. বিরোধিতার তুফানের মুখে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করার পর যে জিনিসটি মু'মিনের হৃদয়ে ধৈর্য, প্রশান্তিও তৃপ্তির গভীর শীতলতা সৃষ্টি করে তা এই বিশ্বাসে যে আল্লাহ বিষয়টি সম্পর্কে অনবহিত নন। আমরা যা করছি তাও তিনি জানেন এবং আমাদের সাথে যা করা হচ্ছে তাও তিনি জানেন। আমাদের ও আমাদের বিরোধীদের সব কথাই তিনি শুনছেন এবং উভয়ের কর্মনীতি যা কিছুই হোক না কেন তা তিনি দেখছেন। এই আস্থার কারণেই মু'মিন বান্দা নিজের এবং ন্যায় ও সত্যের দুশমনের ব্যাপারটি আল্লাহর কাছে সোপর্দ করে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিন্ত হয়ে যান।

কুরআন মজীদে এই পঞ্চমবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ও তাঁর মাধ্যমে ঈমানদারদেরকে দ্বীন ইসলামের দাওয়াত এবং সমাজ সংস্কারের এ কৌশল শেখানো হয়েছে। এর পূর্বে আরো চারবার চারটি স্থানে এ কৌশল শেখানো হয়েছে। সে সম্পর্কে জানার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আ'রাফ, ১১০ থেকে ১১৪ আয়াত, টীকাসহ; সূরা আন নাহল, আয়াত ১২৫ থেকে ১২৭ টীকাসহ; সূরা আল মু'মিনুন, আয়াত ৯৬ টীকাসহ; সূরা আনকাবুত, আয়াত ৪৬ টীকাসহ।

www.pathagar.com

১৭ রামাদান

বিষয়: বদর যুদ্ধ

সূরা আল ইমরান: ২৪-২৭

وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (121) إِذْ هَمَّت طَّائِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلاَ وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (122) وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (123) إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَلاَثَةِ آلاَفٍ مِّنَ الْمَلآئِكَةِ مُنزَلِينَ (124) بَلَى إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلاَفٍ مِّنَ الْمَلآئِكَةِ مُسَوِّمِينَ (125) وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلاَّ بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (126) لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُواْ خَآئِبِينَ (127) لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ (128) وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاء وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاء وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (129)

১২১) (হে নবী![৯৪] মুসলমানদের সামনে সে সময়ের কথা বর্ণনা করো) যখন তুমি অতি প্রত্যুষে নিজের ঘর থেকে বের হয়েছিল এবং (ওহুদের ময়দানে) মুসলমানদেরকে যুদ্ধের জন্য বিভিন্ন স্থানে নিযুক্ত করেছিলে। আল্লাহ সমস্ত কথা শুনেন এবং তিনি সবকিছু ভালো করে জানেন।

১২২) স্মরণ করো, যখন তোমাদের দুটি দল কাপুরুষতার প্রদর্শনী করতে উদ্যোগী হয়েছিল,[৯৫] অথচ আল্লাহ তাদের সাহায্যের জন্য বর্তমান ছিলেন এবং মু'মিনদের আল্লাহরই ওপর ভরসা করা উচিত।

১২৩) এর আগে তোমরা অনেক দুর্বল ছিলে। কাজেই আল্লাহর না-শোকরী করা থেকে তোমাদের দূরে থাকা উচিত, আশা করা যায় এবার তোমরা শোকর গুজার হবে।

১২৪) স্মরণ করো যখন তুমি মু'মিনদের বলছিলে: আল্লাহ তাঁর তিন হাজার ফেরেশতা নামিয়ে দিয়ে তোমাদের সাহায্য করবেন, এটা কি তোমাদের জন্য যথেষ্ট নয়?[৯৬]

১২৫) অবশ্যই, যদি তোমরা সবর করো এবং আল্লাহকে ভয় করে কাজ করতে থাকো, তাহলে যে মুহূর্তে দুশমন তোমাদের ওপর চড়াও হবে ঠিক তখনি তোমাদের রব (তিন হাজার নয়) পাচঁ হাজার চিহ্নযুক্ত ফেরেশতা দিয়ে তোমাদের সাহায্য করবেন।

www.pathagar.com

১২৬) একথা আল্লাহ তোমাদের এ জন্য জানিয়ে দিলেন যে, তোমরা এতে খুশী হবে এবং তোমাদের মন আশ্বস্ত হবে। বিজয় ও সাহায্য সবকিছুই আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে। তিনি প্রবল পরাক্রান্তও মহাজ্ঞানী।

১২৭) (আর এ সাহায্য তিনি তোমাদের এ জন্য দেবেন) যাতে কুফরীর পথ অবলম্বনকারীদের একটি বাহু কেটে দেবার অথবা তাদের এমন লাঞ্ছনাপূর্ণ পরাজয় দান করার ফলে তারা নিরাশ হয়ে পশ্চাদপসরণ করবে।

১২৮) (হে নবী!) চূড়ান্তফায়সালা করার ক্ষমতায় তোমার কোন অংশ নেই। এটা আল্লাহর ক্ষমতার-ইখতিয়ারভুক্ত, তিনি চাইলে তাদের মাফ করে দেবেন। আবার চাইলে তাদের শাস্তি দেবেন। কারণ তারা জালেম।

১২৯) পৃথিবী ও আকাশে যা কিছু আছে সমস্তই আল্লাহর মালিকানাধীন। যাকে চান মাফ করে দেন এবং যাকে চান শাস্তি দেন। তিনি ক্ষমাশীল ও করুণাময়। ৯৭

আয়াত সমূহের ব্যাখ্যা

৯৪. এখান থেকে চতুর্থ ভাষণ শুরু হচ্ছে। ওহুদ যুদ্ধের পর এটি নাযিল হয়। এখানে ওহুদ যুদ্ধের ওপর মন্তব্য করা হয়েছে। আগের ভাষণটি শেষ করার সময় বলা হয়েছিল, "যদি তোমরা সবর করো এবং আল্লাহকে ভয় করে কাজ করতে থাকো, তাহলে তোমাদের বিরুদ্ধে তাদের কোন কৌশল কার্যকর হতে পারবেনা"। এখন যেহেতু ওহুদ যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয়ের কারণেই দেখা যাচ্ছে তাদের মধ্যে সবরের অভাব ছিল এবং কোন কোন মুসলমানের এমন কিছু ভুল হয়ে গিয়েছিল যা ছিল আল্লাহভীতি বিরোধী, তাই তাদের এই দুর্বলতা সম্পর্কে সতর্কবাণী সম্বলিত এ ভাষণটি উপরোক্ত ভাষণের শেষ বাক্যটির পরপরই তার সাথে বসিয়ে দেয়া হয়েছে।

এ ভাষণটির বর্ণনাভঙ্গি বড়ই বৈশিষ্ট্যময়। ওহুদ যুদ্ধের প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা চিহ্নিত করা হয়েছে এবং তার প্রত্যেকটির ওপর পৃথক পৃথকভাবে কয়েকটি মাপাজোখা শব্দ সমন্বিত ভারসাম্যপূর্ণ বাক্যের মাধ্যমে শিক্ষণীয় মন্তব্য করা হয়েছে। এগুলো বুঝতে হলে সংশ্লিষ্ট ঘটণাগুলোর পটভূমি জানা একান্ত অপরিহার্য।

তৃতীয় হিজরীর শাওয়াল মাসের শুরুতে মক্কার কুরাইশরা প্রায় তিন হাজার সৈন্য নিয়ে মদীনা আক্রমণ করে। সংখ্যায় বেশী হবার পরও অস্ত্রশস্ত্রও তাদের কাছে ছিল মুসলমানদের চাইতে অনেক বেশী। এর ওপর ছিল তাদের বদর যুদ্ধের পরাজয়ের প্রতিশোধ নেবার তীব্র আকাংখা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও অভিজ্ঞ সাহাবীগণ মদীনায় অবরুদ্ধ হয়ে প্রতিরক্ষার লড়াই চালিয়ে যাবার পক্ষপাতি ছিলেন। কিন্তু বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে পারেননি এমন কতিপয় শাহাদাতের আকাংখায় অধীরভাবে প্রতীক্ষারত তরুণ সাহাবী শহরের বাইরে বের হয়ে যুদ্ধ করার ওপর জোর

www.pathagar.com

দিতে থাকেন। অবশেষে তাদের পীড়াপীড়িতে বাধ্য হয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাইরে বের হবার ফয়সালা করেন। এক হাজার লোক তাঁর সাথে বের হন। কিন্তু 'শওত' নামক স্থানে পৌঁছে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই তার তিনশো সঙ্গী নিয়ে আলাদা হয়ে যায়। যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে তার এহেন আচরণে মুসলিম সেনাদল বেশ বড় আকারের অস্থিরতা ও হতাশার সঞ্চার হয়। এমন কি বনু সালমা ও বনু হারেসার লোকরা এত বেশী হতাশ হয়ে পড়ে যে, তারাও ফিরে যাবার সংকল্প করে ফেলেছিল।

কিন্তু দৃঢ়প্রত্যয়ী সাহাবীগণের প্রচেষ্টায় তাদের মানসিক অস্থিরতা ও হতাশা দূর হয়ে যায়। এই অবশিষ্ট সাতশ সৈন্য নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সামনের দিকে এগিয়ে যান এবং ওহুদ পর্বতের পাদদেশে (মদীনা থেকে প্রায় চার মাইল দূরে) নিজের সেনাবাহিনীকে এমনভাবে বিন্যস্ত করেন যার ফলে পাহাড় থাকে তাদের পেছন দিকে এবং সামনের দিকে থাকে কুরাইশ সেনাদল। একপাশে এমন একটি গিরিপথ ছিল, যেখান থেকে আকস্মিক হামলা হবার আশংকা ছিল। সেখানে তিনি আবদুল্লাহ ইবনে জুবাইরের নেতৃত্বে পঞ্চাশ জন তীরন্দাজের একটি বাহিনী মোতায়েন করেন। তাঁদেরকে জোর তাকীদ দিয়ে জানিয়ে দেন: "কাউকে আমাদের ধারে কাছে ঘেষঁতে দেবে না। কোন অবস্থায় এখান থেকে সরে যাবে না। যদি তোমরা দেখো, পাখিরা আমাদের গোশত ঠুকরে ঠুকরে খাচ্ছে, তাহলেও তোমরা নিজেদের জায়গা থেকে সরে যাবে না"। অতপর যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। প্রথম দিকে মুসলমানদের পাল্লা ভারী থাকে। এমনকি মুশরিকদের সেনাবাহিনীতে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। তারা বিচ্ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়তে থাকে। কিন্তু এই প্রাথমিক সাফল্যকে পূর্ণ বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছিয়ে দেবার পরিবর্তে গনীমাতের মাল আহরণ করার লোভ মুসলমানদের বশীভূত করে ফেলে। তারা শত্রু সেনাদের ধন-সম্পদ লুট করতে শুরু করে।

ওদিকে যে তীরন্দাজদেরকে পেছনে দিকের হেফাজতে নিযুক্ত করা হয়েছিল,তারা যখন দেখতে পেলো শত্রুরা পালিয়ে যাচ্ছে এবং গনীমাতের মাল লুট করা হচ্ছে তখন তারাও নিজেদের জায়গা ছেড়ে গনীমাতের মালের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জুবাইর তাদেরকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কড়া নির্দেশ স্মরণ করিয়ে দিয়ে বার বার বাধা দিতে থাকেন। কিন্তু মাত্র কয়েকজন ছাড়া কাউকে থামানো যায় নি। কাফের সেনাদলের একটি বাহিনীর কমান্ডার খালেদ ইবনে ওয়ালীদ যথা সময়ে এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করেন। তিনি নিজের বাহিনী নিয়ে পাহাড়ের পেছন দিক থেকে এক পাক ঘুরে এসে গিরিপথে প্রবেশ করে আক্রমণ করে বসেন। আবদুল্লাহ ইবনে জুবাইর তাঁর মাত্র কয়েকজন সংগীকে নিয়ে এই আক্রমণ সামাল দেবার ব্যর্থ চেষ্টা করেন। গিরিপথের ব্যূহ ভেদ করে খালেদ তার সেনাদল দিয়ে অকস্মাৎ মুসলমানদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। খালেদের বাহিনীর এই আক্রমণ পলায়নপর কাফের বাহিনীর মনে নতুন আশার সঞ্চার করে। তারাও পেছন ফিরে মুসলমানদের ওপর একযোগে আক্রমণ করে বসে।

www.pathagar.com

এভাবে মুহূর্তের মধ্যে যুদ্ধক্ষেত্রের চেহারা বদলে যায়। হঠাৎ এই অপ্রত্যাশিত অবস্থার মুখোমুখি হয়ে মুসলমানরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। তাদের একটি বড় অংশ বিক্ষিপ্ত হয়ে পলায়নমুখী হয়। তবুও কয়েক জন সাহসী সৈন্য তখনো যুদ্ধ ক্ষেত্রে বীর বিক্রমে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকেন। এমন সময় গুজব ছড়িয়ে পড়ে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শহীদ হয়ে গেছেন। এ গুজবটি সাহাবায়ে কেরামের অবশিষ্ট বাহ্যিক জ্ঞানটুকুও বিলুপ্ত করে দেয়। এতক্ষণ যারা ময়দানে লড়ে যাচ্ছিলেন এবার তারাও হিম্মতহারা হয়ে বসে পড়েন। এ সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চারপাশে ছিলেন মাত্র দশ বারো জন উৎসর্গীত প্রাণ মুজাহিদ। তিনি নিজেও আহত ছিলেন। পরিপূর্ণ পরাজয়ে আর কিছুই বাকি ছিল না। কিন্তু এই মুহূর্তে সাহাবীগণ জানতে পারলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জীবিত আছেন। কাজেই তারা সবদিক থেকে একে একে তাঁর চারদিকে সমবেত হতে থাকে। তারা তাঁকে নিরাপদে পর্বতের ওপরে নিয়ে যান।

এ সময়ের এ বিষয়টি আজো দুর্বোধ্য রয়ে গেছে এবং এ প্রশ্নটির জবাব আজও খুঁজে পাওয়া যায়নি যে, কাফেররা তখন অগ্রবর্তী হয়ে ব্যাপকভাবে আক্রমণ না চালিয়ে কিসের তাড়নায় নিজেরাই মক্কায় ফিরে গিয়েছিল? মুসলমানরা এত বেশী বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছিলেন যে, তাঁদের পক্ষে পূনর্বার এক জায়গায় একত্র হয়ে যথারীতি যুদ্ধ শুরু করা কঠিন ছিল কাফেররা তাদের বিজয়কে পূর্ণতার প্রান্তসীমায় পৌঁছাতে উদ্যোগী হলে তাদের সাফল্য লাভ অসম্ভব ব্যাপার ছিল না। কিন্তু তারা নিজেরাই বা কেন ময়দান ছেড়ে চলে গিয়েছিল তা আজও অজানা রয়ে গেছে।

৯৫. এখানে বনু সালামা ও বনু হারেসার দিকে ইংগিত করা হয়েছে। আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ও তার সাথীদের ময়দান থেকে সরে পড়ার কারণে তারা সাহস হারিয়ে ফেলেছিল।

৯৬. মুসলমানরা যখন দেখলেন, একদিকে শত্রুদের সংখ্যা তিন হাজার আর অন্যদিকে তাঁদের মাত্র এক হাজার থেকেও আবার তিনশো চলে যাচ্ছে, তখন তাদের মনোবল ভেঙে পড়ার উপক্রম হলো। সে সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদেরকে একথা বলেছিলেন।

৯৭. আহত হবার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ থেকে কাফেরদের জন্য বদদোয়া নিঃসৃত হয় এবং তিনি বলেন: "যে জাতি তার নবীকে আহত করে সে কেমন করে কল্যাণ ও সাফল্য লাভ করেত পারে"। এরই জবাবে এই আয়াত নাযিল হয়।

www.pathagar.com

১৮ রামাদান
বিষয়: পিতামাতার প্রতি ভাল ব্যবহার
সূরা বনী ইসরাইল: ২৩-৪০

وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا (23) وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا (24) رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُواْ صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلأَوَّابِينَ غَفُورًا (25) وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا (26) إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُواْ إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا (27) وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاء رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلاً مَّيْسُورًا (28) وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا (29) إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاء وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا (30) وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلاَدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاَقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا (31) وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً (32) وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلاَ يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا (33) وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً (34) وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذا كِلْتُمْ وَزِنُواْ بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً (35) وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً (36) وَلاَ تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولاً (37) كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا (38) ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلاَ تَجْعَلْ مَعَ اللّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا (39) أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُم بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلآئِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلاً عَظِيمًا (40)

২৩) তোমার রব ফয়সালা করে দিয়েছেন [২৫] (১) তোমরা কারোর ইবাদাত করো না, একমাত্র তাঁরই ইবাদাত করো।[২৬] (২) পিতামাতার সাথে ভালো ব্যবহার করো। যদি তোমাদের কাছে তাদের কোনো একজন বা উভয় বৃদ্ধ অবস্থায় থাকে, তাহলে তাদেরকে "উহ্" পর্যন্তও বলো না এবং তাদেরকে ধমকের সুরে জবাব দিয়ো না বরং তাদের সাথে মর্যাদা সহকারে কথা বলো ২৪) আর দয়া ও কোমলতা সহকারে তাদের সামনে বিনম্র

www.pathagar.com

থাকো এবং দোয়া করতে থাকো এই বলেঃ হে আমার প্রতিপালক! তাদের প্রতি দয়া করো, যেমন তারা দয়া, মায়া, মমতা সহকারে শৈশবে আমাকে প্রতিপালন করেছিলেন।

২৫) তোমাদের রব খুব ভালো করেই জানেন তোমাদের মনে কি আছে। যদি তোমরা সৎকর্মশীল হয়ে জীবন যাপন করো, তাহলে তিনি এমন লোকদের প্রতি ক্ষমাশীল যারা নিজেদের ভুলের ব্যাপারে সতর্ক হয়ে বন্দেগীর নীতি অবলম্বন করার দিকে ফিরে আসে।[২৭] ২৬) (৩) আত্মীয়কে তার অধিকার দাও এবং মিসকীন ও মুসাফিরকেও তাদের অধিকার দাও।

২৭) (৪) বাজে খরচ করো না। যারা বাজে খরচ করে তারা শয়তানের ভাই। আর শয়তান তার রবের প্রতি অকৃতজ্ঞ।

২৮) (৫) যদি তাদের থেকে (অর্থাৎ অভাবী, আত্মীয়-স্বজন, মিসকীন ও মুসাফির) তোমাকে মুখ ফিরিয়ে নিতে হয় এজন্য যে, এখনো তুমি প্রত্যাশিত রহমতের সন্ধান করে ফিরছো, তাহলে তাদেরকে নরম জবাব দাও।[২৮] ২৯) (৬) নিজের হাত গলায় বেঁধে রেখো না এবং তাকে একেবারে খোলাও ছেড়ে দিয়ো না, তাহলে তুমি নিন্দিত ও অক্ষম হয়ে যাবে।[২৯] ৩০) তোমার রব যার জন্য চান রিযিক প্রশস্ত করে দেন আবার যার জন্য চান সংকীর্ণ করে দেন। তিনি নিজের বান্দাদের অবস্থা জানেন এবং তাদেরকে দেখছেন।[৩০] ৩১) (৭) দারিদ্রের আশংকায় নিজেদের সন্তান হত্যা করো না। আমি তাদেরকেও রিযিক দেবো এবং তোমাদেরকেও। আসলে তাদেরকে হত্যা করা একটি মহাপাপ।[৩১] ৩২) (৮) যিনার কাছেও যেয়ো না, ওটা অত্যন্ত খারাপ কাজ এবং খুবই জঘন্য পথ।[৩২] ৩৩) (৯) আল্লাহ যাকে হত্যা করা হারাম করে দিয়েছেন,[৩৩] সত্য ব্যতিরেকে তাকে হত্যা করো না।[৩৪] আর যে ব্যক্তি মজলুম অবস্থায় নিহত হয়েছে তার অভিভাবককে আমি কিসাস দাবী করার অধিকার দান করেছি। [৩৫] কাজেই হত্যার ব্যাপারে তার সীমা অতিক্রম করা উচিত নয়,[৩৬] তাকে সাহায্য করা হবে।[৩৭] ৩৪) (১০) ইয়াতীমের সম্পত্তির ধারে কাছে যেয়ো না, তবে হ্যাঁ সদুপায়ে, যে পর্যন্তনা সে বয়োপ্রাপ্ত হয়ে যায়।[৩৮] (১১) প্রতিশ্রুতি পালন করো, অবশ্যই প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে তোমাদের জবাবদিহি করতে হবে।[৩৯] ৩৫) (১২) মেপে দেবার সময় পাত্র ভরে দাও এবং ওজন করে দেবার সময় সঠিক দাঁড়িপাল্লায় ওজন করো। [৪০] এটিই ভালো পদ্ধতি এবং পরিণামের দিক দিয়েও এটিই উত্তম।[৪১]

৩৬) (১৩) এমন কোনো জিনিসের পেছনে লেগে যেয়ো না যে সম্পর্কে তোমার জ্ঞান নেই। নিশ্চিতভাবেই চোখ, কান ও দিল সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।[৪২] ৩৭) (১৪) যমীনে দম্ভভরে চলো না। তুমি না যমীনকে চিরে ফেলতে পারবে, না পাহাড়ের উচ্চতায় পৌঁছে যেতে পারবে।[৪৩] ৩৮) এ বিষয়গুলোর মধ্য থেকে প্রত্যেকটির খারাপ দিক তোমার রবের কাছে অপছন্দনীয়।[৪৪] ৩৯) তোমার রব তোমাকে অহীর মাধ্যমে যে হিকমতের কথাগুলো বলেছেন এগুলো তার অন্তর্ভুক্ত। আর দেখো, আল্লাহর সাথে অন্য

www.pathagar.com

কোনো মাবুদ স্থির করে নিয়ো না, অন্যথায় তোমাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে নিন্দিত এবং সব রকমের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত অবস্থায়।[৪৫] ৪০) কেমন অদ্ভুত কথা, তোমাদের রব তোমাদের পুত্র সন্তান দিয়ে অনুগৃহীত করেছেন এবং নিজের জন্য ফেরেশতাদেরকে কন্যা সন্তান বানিয়ে নিয়েছেন?[৪৬] এটা ভয়ানক মিথ্যা কথা, যা তোমরা নিজেদের মুখে উচ্চারণ করছো।

আয়াত সমূহের ব্যাখ্যা

২৫. এখানে এমন সব বড় বড় মূলনীতি পেশ করা হয়েছে যার ওপর ভিত্তি করে ইসলাম মানুষের সমগ্র জীবন ব্যবস্থার ইমারত গড়ে তুলতে চায়। একে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আন্দোলনের ঘোষণাপত্র বলা যায়। মক্কী যুগের শেষে এবং আসন্ন মাদানী যুগের প্রারম্ভ লগ্নে এ ঘোষণাপত্র পেশ করা হয়। এভাবে এ নতুন ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রের বুনিয়াদ কোন ধরনের চিন্তামূলক, নৈতিক, তামাদ্দুনিক, অর্থনৈতিক ও আইনগত মূলনীতির ওপর রাখা হবে তা সারা দুনিয়ার মানুষ জানতে পারবে। এ প্রসংগে সূরা আনআ'মের ১৯ রুকূ' এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট টীকার ওপরও একবার চোখ বুলিয়ে নিলে ভাল হয়।

২৬. এর অর্থ কেবল এতটুকুই নয় যে, আল্লাহ ছাড়া আর কারো পূজা-উপাসনা করো না বরং এ সংগে এর অর্থ হচ্ছে, বন্দেগী, গোলামী ও দ্বিধাহীন আনুগত্য একমাত্র আল্লাহরই করতে হবে। একমাত্র তাঁরই হুকুমকে হুকুম এবং তাঁরই আইনকে আইন বলে মেনে নাও এবং তাঁর ছাড়া আর কারো সার্বভৌম কর্তৃত্ব স্বীকার করো না। এটি কেবলমাত্র একটি ধর্ম বিশ্বাস এবং ব্যক্তিগত কর্মধারার জন্য একটি পথনির্দেশনাই নয় বরং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনা তাইয়্যেবায় পৌঁছে কার্যত যে রাজনৈতিক, তামাদ্দুনিক ও নৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেন এটি হচ্ছে সেই সমগ্র ব্যবস্থার ভিত্তি প্রস্তরও। এ ইমারতের বুনিয়াদ রাখা হয়েছিল এ মতাদর্শের ভিত্তিতে যে, মহান ও মহিমান্বিত আল্লাহই সমগ্র বিশ্বলোকের মালিক ও বাদশাহ এবং তাঁরই শরীয়াত এ রাজ্যের আইন।

২৭. এ আয়াতে বলা হয়েছে, আল্লাহর পরে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশী হক ও অগ্রাধিকার হচ্ছে পিতামাতার। সন্তানকে পিতামাতার অনুগত, সেবা পরায়ণ ও মর্যাদাবোধ সম্পন্ন করতে হবে। সমাজের সামষ্টিক নৈতিক বৃত্তি এমন পর্যায়ের হতে হবে, যার ফলে সন্তানরা বাপ-মায়ের মুখাপেক্ষীহীন হয়ে পড়বে না, বরং তারা নিজেদেরকে বাপ-মায়ের অনুগৃহীত মনে করবে এবং বুড়ো বয়সে তাদেরকে ঠিক তেমনিভাবে বাপ-মায়ের খিদমত করা শেখাবে যেমনিভাবে বাপ-মা শিশুকালে তাদের পরিচর্যা ও লালন পালন এবং মান-অভিমান বরদাশত করে এসেছে। এ আয়াতটিও নিছক একটি নৈতিক সুপারিশ নয় বরং এরই ভিত্তিতে পরবর্তী পর্যায়ে বাপ-মায়ের জন্য এমনসব শরয়ী অধিকার ও ক্ষমতা নির্ধারণ করা হয়েছে যেগুলোর বিস্তারিত বিবরণ আমরা হাদীসে ও ফিকাহর কিতাবগুলোতে পাই। তাছাড়া ইসলামী সমাজের মানসিক ও

www.pathagar.com

নৈতিক প্রশিক্ষণ এবং তাদের অধিকারের রক্ষাণাবেক্ষণকে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে ও আনুগত্য এবং তাদের অধিকারের রক্ষণাবেক্ষণকে একটি গুরত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ জিনিসগুলো চিরকালের জন্য এ নীতি নির্ধারণ করে দিয়েছে যে, ইসলামী রাষ্ট্র নিজের আইন কানুন, ব্যবস্থাপনামূলক বিধান ও শিক্ষানীতির মাধ্যমে পরিবার প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী ও সংরক্ষিত করার চেষ্টা করবে, দুর্বল করবে না।

২৮. এ তিনটি ধারার উদ্দেশ্য হচ্ছে, মানুষ নিজের উপার্জন ও ধন-দৌলত শুধুমাত্র নিজের জন্যই নির্ধারিত করে নেবে না বরং ন্যায়সংগতভাবে ও ভারসাম্য সহকারে নিজের প্রয়োজন পূর্ণ করার পর নিজের আত্মীয়-স্বজন ও অন্যান্য অভাবী লোকদের অধিকার আদায় করবে। সমাজ জীবনে সাহায্য-সহযোগিতা, সহানুভূতি এবং অন্যের অধিকার জানা ও তা আদায় করার প্রবণতা সক্রিয় ও সঞ্চারিত থাকবে। প্রত্যেক আত্মীয় অন্য আত্মীয়ের সাহায্যকারী এবং প্রত্যেক সামর্থবান ব্যক্তি নিজের আশপাশের অভাবী মানুষদের সাহায্যকারী হবে। একজন মুসাফির যে জনপদেই যাবে নিজেকে অতিথি বৎসল লোকদের মধ্যেই দেখতে পাবে। সমাজে অধিকারের ধারণা এত বেশী ব্যাপক হবে যে, প্রত্যেক ব্যক্তি যাদের মধ্যে অবস্থান করে নিজের ব্যক্তি-সত্তা ও ধন-সম্পদের ওপর তাদের সবার অধিকার অনুভব করবে। তাদের খিদমত করার সময় এ ধারণা নিয়েই খিদমত করবে যে, সে তাদের অধিকার আদায় করছে, তাদেরকে অনুগ্রহ পাশে আবদ্ধ করছে না। কারোর খিদমত করতে অক্ষম হলে তার কাছে ক্ষমা চাইবে এবং আল্লাহর বান্দাদের খিদমত করার যোগ্যতা লাভ করার জন্য আল্লাহর কাছে অনুগ্রহ প্রার্থনা করবে।

ইসলামের ঘোষণাপত্রের এ ধারাগুলোও শুধুমাত্র ব্যক্তিগত নৈতিকতার শিক্ষাই ছিল না বরং পরবর্তী সময়ে মদীনা তাইয়্যেবার সমাজে ও রাষ্ট্রে এগুলোর ভিত্তিতেই ওয়াজিব ও নফল সাদকার বিধানসমূহ প্রদত্ত হয়, অসিয়ত, মীরাস ও ওয়াকফের পদ্ধতি নির্ধারিত হয়, এতিমের অধিকার সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়, প্রত্যেক জনবসতির ওপর মুসাফিরের কমপক্ষে তিনদিন পর্যন্ত মেহমানদারী করার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা হয় এবং এ সঙ্গে সমাজের নৈতিক ব্যবস্থা কার্যত এমন পর্যায়ে উন্নীত করা হয় যার ফলে সমগ্র সামাজিক পরিবেশে দানশীলতা, সহানুভূতি ও সহযোগিতার মনোভাব সঞ্চারিত হয়ে যায়। এমনকি লোকেরা স্বতস্ফূর্তভাবে আইনগত অধিকারসমূহ দেয়া ছাড়াও আইনের জোরে যেসব নৈতিক অধিকার চাওয়া ও প্রদান করা যায় না সেগুলো ও উপলব্ধি ও আদায় করতে থাকে।

২৯. "হাত বাঁধা" একটি রূপক কথা। কৃপণতা অর্থে ব্যবহৃত হয়। আর "হাত খোলে ছেড়ে দেয়া"র মানে হচ্ছে, বাজে খরচ করা। ৪র্থ ধারার সাথে ৬ষ্ঠ ধারাটির এ বাক্যাংশটি মিলিয়ে পড়লে এর পরিষ্কার অর্থ এই মনে হয় যে, লোকদের মধ্যে এতটুকু ভারসাম্য হতে হবে যাতে তারা কৃপণ হয়ে অর্থের আবর্তন রুখে না দেয় এবং অপব্যয়ী

www.pathagar.com

হয়ে নিজের অর্থনৈতিক শক্তি ধ্বংস না করে ফেলে। এর বিপরীত পক্ষে তাদের মধ্যে ভারসাম্যের এমন সঠিক অনুভূতি থাকতে হবে যার ফলে তারা যথার্থ ব্যয় থেকে বিরত হবে না আবার অযথা ব্যয়জনিত ক্ষতির ও শিকার হবে না। অহংকার ও প্রদর্শনেচ্ছামূলক এবং লোক দেখানো খরচ, বিলাসিতা, ফাসেকী ও অশ্লীল কাজে ব্যয় এবং এমন যাবতীয় ব্যয় যা মানুষের প্রকৃত প্রয়োজনেও কল্যাণমূলক কাজে লাগার পরিবর্তে ধন-সম্পদ ভুল পথে নিয়োজিত করে, তা আসলে আল্লাহর নিয়ামত অস্বীকার ছাড়া আর কিছুই নয়। যারা এভাবে নিজেদের ধন-দৌলত খরচ করে তারা শয়তানের ভাই।

এ ধারাগুলোও নিছক নৈতিক শিক্ষা এবং ব্যক্তিগত হেদায়াত পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয়। বরং এদিকে পরিষ্কার ইঙ্গিত করছে যে, একটি সৎ ও সত্যনিষ্ঠ সমাজকে নৈতিক অনুশীলন, সামষ্টিক চাপ প্রয়োগ ও আইনগত বাধা-নিষেধ আরোপের মাধ্যমে অযথা অর্থ ব্যয় থেকে বিরত রাখা উচিত। এ কারণেই পরবর্তীকালে মদীনা রাষ্ট্রে বিভিন্ন কার্যকর পদ্ধতিতে এ উভয় ধারা নিখুঁতভাবে প্রয়োগ করা হয়। প্রথমত অপব্যয় ও বিলাসিতার বহু নীতি প্রথাকে আইনগতভাবে হারাম করা হয়। দ্বিতীয়ত কৌশল অবলম্বন করে অযথা অর্থব্যয়ের পথ বন্ধ করা হয়। তৃতীয়ত সমাজ সংস্কারের মাধ্যমে এমন বহু রসম-রেওয়াজের বিলোপ সাধন করা হয় যেগুলোতে অপব্যয় করা হতো। তারপর রাষ্ট্রকে বিশেষ ক্ষমতা বলে এবং বিশেষ ব্যবস্থাপনা বিধান জারী করে সুস্পষ্ট অপব্যয়ের ক্ষেত্রে বাধা দেয়ার ইখতিয়ার দেয়া হয়। এভাবে যাকাত ও সাদকার বিধানের মাধ্যমে কৃপণতার শক্তিতে গুঁড়িয়ে দেয়া হয় এবং লোকেরা সম্পদ পুঞ্জীভূত করে অর্থের আবর্তনের পথ বন্ধ করে দেবে এ সম্ভাবনা ও নির্মূল করে দেয়া হয়। এসব কৌশল অবলম্বন করার সাথে সাথে সমাজে এমন একটি সাধারণ জনমত সৃষ্টি করা হয়, যা দানশীলতা ও অপব্যয়ের মধ্যকার পার্থক্য সঠিকভাবে জানতো এবং কৃপণতা ও ভারসাম্যপূর্ণ ব্যয়ের মধ্যে ভালভাবেই ফারাক করতে পারতো। এ জনমত কৃপণদেরকে লাঞ্ছিত করে, ব্যয়ের ক্ষেত্রে ভারসাম্য রক্ষাকারীদেরকে মর্যাদাশালী করে, অপব্যয়কারীদের নিন্দা করে এবং দানশীলদেরকে সমগ্র সমাজের খোশবুদার ফুল হিসেবে কদর করে। সে সময়ের নৈতিক ও মানসিক প্রশিক্ষণের প্রভাব আজও মুসলিম সমাজে রয়েছে। আজও দুনিয়ার সব দেশেই মুসলমানরা কৃপণ ও সম্পদ পুঞ্জীভূতকারীদেরকে খারাপ দৃষ্টিতে দেখে এবং দানশীলরা আজও তাদের চোখে সম্মানিত ও মর্যাদা সম্পন্ন।

৩০. অর্থাৎ মহান আল্লাহ নিজের বান্দাদের মধ্যে রিযিক কমবেশী করার ক্ষেত্রে যে পার্থক্য রেখেছেন তার উপযোগিতা বুঝা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। কাজেই রিযিক বন্টনের যে প্রাকৃতিক ব্যবস্থা রয়েছে কৃত্রিম মানবিক কৌশলের মাধ্যমে তার মধ্যে হস্তক্ষেপ না করা উচিত। প্রাকৃতিক অসাম্যকে কৃত্রিম সাম্যে পরিবর্তিত করা অথবা এ অসাম্যকে প্রাকৃতিক সীমার চৌহদ্দী পার করিয়ে বেইনসাফীর সীমানায় পৌঁছিয়ে দেয়া

www.pathagar.com

উভয়টিই সমান ভুল। একটি সঠিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অবস্থান আল্লাহ নির্ধারিত রিযিক বন্টন পদ্ধতির নিকটতরই হয়ে থাকে।

এ বাক্যে প্রাকৃতিক আইনের যে নিয়মটির দিকে পথনির্দেশ করা হয়েছিল তার কারণে মদীনার সংস্কার কর্মসূচীতে এ ধারণাটি আদতে কোন ঠাঁই করে নিতে পারেনি যে, রিযিক ও রিযিকের উপায়-উপকরণগুলোর মধ্যে পার্থক্য ও শ্রেষ্ঠত্ব আসলে এমন কোন অকল্যাণকর বিষয় নয়, যাকে বিলুপ্ত করা এবং একটি শ্রেণীহীন সমাজ গঠন করা কোন পর্যায়ে কাংখিত হতে পারে। পক্ষান্তরে সৎকর্মশীলতা ও সদাচারের ভিত্তিতে মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতির বুনিয়াদ কায়েম করার জন্য মদীনা তাইয়্যেবায় এক বিশেষ কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। সে কর্মপদ্ধতি ছিল এই যে, আল্লাহর প্রকৃতি মানুষের মধ্যে যে পার্থক্য করে রেখেছে তাকে আসল প্রাকৃতিক অবস্থায় অপরিবর্তিত রাখতে হবে এবং ওপরে প্রদত্ত পথনির্দেশনা অনুযায়ী সমাজের নৈতিকতা, আচার-আচরণ ও কর্মবিধানসমূহ এমনভাবে সংশোধন করে দিতে হবে, যার ফলে জীবিকার পার্থক্য ও ব্যবধান কোন জুলুম ও বেইনসাফির বাহনে পরিণত হবার পরিবর্তে এমন অসংখ্য নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও তামাদ্দুনিক কল্যাণ ও সমৃদ্ধির বাহনে পরিণত হবে, যে জন্য মূলত বিশ্বজাহানের স্রষ্টা তাঁর বান্দাদের মধ্যে এ পার্থক্য ও ব্যবধান সৃষ্টি করে রেখেছেন।

৩১. যেসব অর্থনৈতিক চিন্তাধারার ভিত্তিতে প্রাচীনকাল থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত যুগে যুগে জন্মনিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন আন্দোলন দানা বেঁধেছে, এ আয়াতটি তার ভিত পুরোপুরি ধ্বসিয়ে দিয়েছে। প্রাচীন যুগে দারিদ্র্য ভীতি শিশু হত্যা ও গর্ভপাতের কারণ হতো। আর আজ তা দুনিয়াবাসীকে তৃতীয় আর একটি কৌশল অর্থাৎ গর্ভনিরোধের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। কিন্তু ইসলামের ঘোষণাপত্রের এ ধারাটি তাকে অন্নগ্রহণকারীদের সংখ্যা কামাবার ধ্বংসাত্মক প্রচেষ্টা ত্যাগ করে এমনসব গঠনমূলক কাজে নিজের শক্তি ও যোগ্যতা নিয়োগ করার নির্দেশ দিচ্ছে যেগুলোর মাধ্যমে আল্লাহর তৈরী প্রাকৃতিক বিধান অনুযায়ী রিযিক বৃদ্ধি হয়ে থাকে। এ ধারাটির দৃষ্টিতে অর্থনৈতিক উপায়-উপকরণের স্বল্পতার আশংকায় মানুষের বারবার সন্তান উৎপাদনের সিলসিলা বন্ধ করে দিতে উদ্যত হওয়া তার বৃহত্তম ভুলগুলোর অন্যতম হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এ ধারাটি মানুষকে এ বলে সাবধান করে দিচ্ছে যে, রিযিক পৌঁছাবার ব্যবস্থাপনা তোমার আয়ত্বাধীন নয় বরং এটি এমন এক আল্লাহর আয়ত্বাধীন যিনি তোমাকে এ যমীনে আবাদ করেছেন। পূর্বে আগমনকারীদেরকে তিনি যেভাবে রুজি দিয়ে এসেছেন তেমনিভাবে তোমাদেরকেও দেবেন। ইতিহাসের অভিজ্ঞতাও একথাই বলে, দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে জনসংখ্যা যতই বৃদ্ধি হতে থেকেছে ঠিক সেই পরিমাণে বরং বহুসময় তার চেয়ে অনেক বেশী পরিমাণে অর্থনৈতিক উপায় উপকরণ বেড়ে গিয়েছে। কাজেই আল্লাহর সৃষ্টি ব্যবস্থাপনায় মানুষের অযথা হস্তক্ষেপ নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

www.pathagar.com

এ শিক্ষার ফলেই কুরআন নাযিলের যুগ থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত কোন যুগে মুসলমানদের মধ্যে জন্ম শাসনের কোন ব্যাপক ভাবধারা জন্ম লাভ করতে পারেনি।

৩২. "যিনার কাছেও যেয়ো না" এ হুকুম ব্যক্তির জন্য এবং সামগ্রিকভাবে সমগ্র সমাজের জন্যও। ব্যক্তির জন্য এ হুকুমের মানে হচ্ছে, সে নিছক যিনার কাজ থেকে দূরে থেকেই ক্ষান্ত হবেনা বরং এ পথের দিকে টেনে নিয়ে যায় যিনার এমন সব সূচনাকারী এবং প্রাথমিক উদ্যোগ ও আকর্ষণ সৃষ্টিকারী বিষয় থেকেও দূরে থাকবে। আর সমাজের ব্যাপারে বলা যায়, এ হুকুমের প্রেক্ষিতে সমাজ জীবনে যিনা, যিনার উদ্যোগ আকর্ষণ এবং তার কারণসমূহের পথ বন্ধ করে দেয়া সমাজের জন্য ফরয হয়ে যাবে। এ উদ্দেশ্যে সে আইন প্রণয়ন, শিক্ষা ও অনুশীলন দান, সামাজিক পরিবেশের সংস্কার সাধন, সমাজ জীবনের যথাযোগ্য বিন্যাস এবং অন্যান্য প্রভাবশালী ব্যবস্থা অবলম্বন করবে।

এ ধারাটি শেষ পর্যন্ত ইসলামী জীবন ব্যবস্থার একটি বৃহত্তম অধ্যায়ের বুনিয়াদে পরিণত হয়। এর অভিপ্রায় অনুযায়ী যিনা ও যিনার অপবাদকে ফৌজদারী অপরাধ গণ্য করা হয়। পর্দার বিধান জারী করা হয়। অশ্লীলতা ও নির্লজ্জতার প্রচার কঠোরভাবে বন্ধ করে দেয়া হয়। মদ্যপান, নাচ, গান ও ছবির (যা যিনার নিকটতম আত্মীয়) ওপর কড়া নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়। আর এর সংগে এমন একটি দাম্পত্য আইন প্রণয়ন করা হয় যার ফলে বিবাহ সহজ হয়ে যায় এবং এ যিনার সামাজিক কারণসমূহের শিকড় কেটে যায়।

৩৩. "যাকে হত্যা" মানে কেবলমাত্রে অন্য ব্যক্তিকে হত্যা করাই নয়, নিজেকে হত্যা করাও এর অন্তর্ভুক্ত। কারণ মানুষকে মহান আল্লাহ মর্যাদা সম্পন্ন করেছেন। অন্যের প্রাণের সাথে সাথে মানুষের নিজের প্রাণও এ সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত। কাজেই মানুষ হত্যা যত বড় গুনাহ ও অপরাধ, আত্মহত্যা করাও ঠিক তত বড় অপরাধ ও গুনাহ। মানুষ নিজেকে নিজের প্রাণের মালিক এবং এ মালিকানাকে নিজ ক্ষমতায় খতম কর দেবার অধিকার রাখে বলে মনে করে, এটা তার একটা বিরাট ভুল ধারণা। অথচ তার এ প্রাণ আল্লাহর মালিকানাধীন এবং সে একে খতম করে দেয়া তো দূরের কথা একে কোন অনুপযোগী কাজে ব্যবহার করার অধিকারও রাখে না। দুনিয়ার এ পরীক্ষাগৃহে আল্লাহ যেভাবেই আমাদের পরীক্ষা নেন না কেন, পরীক্ষার অবস্থা ভাল হোক বা মন্দ হোক, সেভাবেই শেষ সময় পর্যন্ত আমাদের পরীক্ষা দিতে থাকা উচিত। আল্লাহর দেয়া সময়কে ইচ্ছা করে খতম করে দিয়ে পরীক্ষাগৃহ থেকে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করা একটি ভ্রান্ত পদক্ষেপ ছাড়া আর কিছুই নয়। আবার এ পালিয়ে যাবার কাজটিও এমন এক অপরাধের মাধ্যমে সম্পন্ন করা যাকে আল্লাহ সুস্পষ্ট ভাষায় হারাম গণ্য করেছেন,এটা তো কোনক্রমেই গ্রহণীয় হতে পারে না। অন্য কথায় বলা যায়, দুনিয়ার ছোট ছোট কষ্ট, লাঞ্ছনা ও অপমানের হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে মানুষ বৃহত্তর ও চিরন্তন কষ্ট ও লাঞ্ছনার দিকে পালিয়ে যাচ্ছে।

www.pathagar.com

৩৪. পরবর্তীকালে ইসলামী আইন 'সত্য সহকারে হত্যা' কে শুধুমাত্র পাঁচটি ক্ষেত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দেয়। **এক:** জেনে বুঝে হত্যাকারী থেকে কিসাস নেয়া। **দুই:** আল্লাহর সত্য দ্বীনের পথে বাধাদানকারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। **তিন:** ইসলামী রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থা উৎখাত করার প্রচেষ্টাকারীদের শাস্তি দেয়া, **চার:** বিবাহিত পুরুষ ও নারীকে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার শাস্তি দেয়া। **পাঁচ:** মুরতাদকে শাস্তি দেয়া। শুধুমাত্র এ পাঁচটি ক্ষেত্রে মানুষের প্রাণের মর্যাদা তিরোহিত হয় এবং তাকে হত্যা করা বৈধ গণ্য হয়।

৩৫. মূল শব্দ হচ্ছে, "তার অভিভাবককে আমি সুলতান দান করেছি"। এখানে সুলতান অর্থ হচ্ছে "প্রমাণ" যার ভিত্তিতে সে কিসাস দাবী করতে পারে। এ থেকে ইসলামী আইনের এ মূলনীতি বের হয় যে, হত্যা মোকাদ্দমার আসল বাদী সরকার নয়। বরং নিহত ব্যক্তির অভিভাবকগণই এর মূল বাদীপক্ষ। তারা হত্যাকারীকে মাফ করে দিতে এবং কিসাসের পরিবর্তে রক্তপণ গ্রহণ করতে সম্মত হতে পারে।

৩৬. হত্যার ব্যাপারে বিভিন্নভাবে সীমা অতিক্রম করা যেতে পারে। এগুলো সবই নিষিদ্ধ। যেমন প্রতিশোধ গ্রহণ করতে গিয়ে উন্মত্তের মতো অপরাধী ছাড়া অন্যদেরকেও হত্যা করা। অথবা অপরাধীকে কষ্ট দিয়ে দিয়ে মেরে ফেলা। কিংবা মেরে ফেলার পর তার লাশের ওপর মনের ঝাল মেটানো। অথবা রক্তপণ নেবার পর আবার তাকে হত্যা করা ইত্যাদি।

৩৭. যেহেতু সে সময় পর্যন্ত ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়নি, তাই কে তাকে সাহায্য করবে, একথা স্পষ্ট করে বলা হয়নি। পরে যখন ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় তখন ফয়সালা করে দেয়া হয় যে, তাকে সাহায্য করা তার গোত্র বা সহযোগী বন্ধু দলের কাজ নয় বরং এটা হচ্ছে ইসলামী রাষ্ট্র এবং তার বিচার ব্যবস্থার কাজ। কোন ব্যক্তি বা দল নিজস্বভাবে হত্যার প্রতিশোধ নেবার অধিকার রাখে না। বরং এটা ইসলামী সরকারের দায়িত্ব। ন্যায় বিচার লাভ করার জন্য তার কাছে সাহায্য চাওয়া হবে।

৩৮. এটিও নিছক একটি নৈতিক নির্দেশনামা ছিল না। বরং পরবর্তীকালে যখন ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় তখন এতিমদের অধিকার সংরক্ষণ করার জন্য প্রশাসনিক ও আইনগত উভয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। এর বিস্তারিত বিবরণ আমরা হাদীস ও ফিকাহর কিতাবগুলোতে পাই। তারপর এখান থেকে এ ব্যাপক ভিত্তিক মূলনীতি গ্রহণ করা হয় যে, ইসলামী রাষ্ট্রের যেসব নাগরিক নিজেরা তাদের নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণ করার ক্ষমতা ও যোগ্যতা রাখে না। রাষ্ট্রই তাদের স্বার্থের সংরক্ষক। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: (যার কোন অভিভাবক নেই আমি তার অভিভাবক) এ হাদীসটি এদিকেই ইংগিত করে এবং এ ইসলামী আইন একটি বিস্তৃত অধ্যায়ের ভূমিকা রচনা করে।

www.pathagar.com

৩৯. এটিই নিছক ব্যক্তিগত নৈতিকতারই একটি ধারা ছিল না। বরং যখন ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় তখন একেই সমগ্র জাতির আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক রাজনীতির ভিত্তি প্রস্তর গণ্য করা হয়।

৪০. এ নির্দেশটাও নিছক ব্যক্তিবর্গের পারস্পরিক লেনদেন পর্যন্তসীমাবদ্ধ নয় বরং ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর হাট, বাজার ও দোকানগুলোতে মাপজোক ও দাঁড়িপাল্লাগুলো তত্বাবধান করা এবং শক্তি প্রয়োগ করে ওজনে ও মাপে কম দেয়া বন্ধ করা রাষ্ট্রের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। তারপর এখান থেকেই এ ব্যাপক মূলনীতি গৃহীত হয় যে, ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক লেনদেনের ক্ষেত্রে সব রকমের বেঈমানী ও অধিকার হরণের পথ রোধ করা সরকারের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত।

৪১. অর্থাৎ দুনিয়া ও আখেরাত উভয় স্থানেই। দুনিয়ায় এর শুভ পরিণামের কারণ হচ্ছে এই যে, এর ফলে পারস্পরিক আস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্রেতা ও বিক্রেতা দু'জন দু'জনের ওপর ভরসা করে, এর ফলে ব্যবসায়ে উন্নতি আসে এবং ব্যাপক সমৃদ্ধি দেখা দেয়। অন্যদিকে আখেরাতে এর শুভ পরিণাম পুরোপুরি নির্ভর করে ঈমান ও আল্লাহ ভীতির ওপর।

৪২. এ ধারাটির অর্থ হচ্ছে লোকেরা নিজেদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে ধারণা ও অনুমানের পরিবর্তে 'জ্ঞানের' পেছনে চলবে। ইসলামী সমাজে এ ধারাটির প্রয়োগ ব্যাপকভাবে নৈতিক ব্যবস্থায়, আইনে, রাজনীতিতে, দেশ শাসনে, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও কারিগরী বিদ্যায় এবং শিক্ষা ব্যবস্থায় তথা জীবনের সকল বিভাগে সুষ্ঠুভাবে করা হয়েছে। জ্ঞানের পরিবর্তে অনুমানের পেছনে চালার কারণে মানুষের জীবনে যে অসংখ্য দুষ্ট মতের সৃষ্টি হয় তা থেকে চিন্তা ও কর্মকে মুক্ত করে দেয়া হয়েছে। নৈতিকতার ক্ষেত্রে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, কু-ধারণা থেকে দূরে থাকো এবং কোন ব্যক্তি বা দলের বিরুদ্ধে কোন প্রকার অনুসন্ধান ছাড়াই কোন দোষারোপ করো না। আইনের ক্ষেত্রে এ মর্মে একটি স্থায়ী মূলনীতিই স্থির করে দেয়া হয়েছে যে, নিছক সন্দেহ বশত কারো বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাবে না। অপরাধ তদন্তের ক্ষেত্রে নীতি নির্দেশ করা হয়েছে যে, অনুমানের ভিত্তিতে কাউকে গ্রেফতার, মারধর বা জেলে আটক করা সম্পূর্ণ অবৈধ। বিজাতিদের সাথে আচার আচরণের ক্ষেত্রে এ নীতি নির্ধারণ করা হয়েছে যে, অনুসন্ধান ছাড়া কারোর বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে না এবং নিছক সন্দেহের ভিত্তিতে কোন গুজব ছড়ানোও যাবে না। শিক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও যেসব তথাকথিত জ্ঞান নিছক আন্দাজ-অনুমান এবং দীর্ঘসূত্রীতাময় ধারণা ও কল্পনা নির্ভর, সেগুলোকেও অপছন্দ করা হয়েছে। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এই যে, আক্বীদা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে ধারণা, কল্পনা ও কুসংস্কারের মূল উপড়ে ফেলা হয়েছে এবং ঈমানদারদেরকে শুধুমাত্র আল্লাহ ও রাসূল প্রদত্ত জ্ঞানের ভিত্তিতে প্রমাণিত বিষয় মেনে নেবার শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

www.pathagar.com

৪৩. এর মানে হচ্ছে, ক্ষমতাগর্বী ও অহংকারীদের মতো আচরণ করো না। এ নির্দেশটি ব্যক্তিগত কর্মপদ্ধতি ও জাতীয় আচরণ উভয়ের ওপর সমানভাবে প্রযোজ্য। এ নির্দেশের বদৌলতেই এ ঘোষণাপত্রের ভিত্তিতে মদীনা তাইয়্যেবায় যে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় তার শাসকবৃন্দ, গভর্নর ও সিপাহসালারদের জীবনে ক্ষমতাগর্ব ও অহংকারের ছিঁটেফোটাও ছিল না। এমনকি যুদ্ধরত অবস্থায়ও কখনো তাদের মুখ থেকে দম্ভ ও অহংকারের কোন কথাই বের হতো না। তাদের ওঠা বসা, চাল-চলন, পোশাক-পরিচ্ছদ, ঘর-বাড়ি, সওয়ারী ও সাধারণ আচার-আচরণের নম্রতা ও কোমলতা বরং ফকিরী ও দরবেশীর ছাপ স্পষ্ট দেখা যেতো। যখন তারা বিজয়ীর বেশে কোন শহরে প্রবেশ করতেন তখনও দর্প ও অহংকার সহকারে নিজেদের ভীতি মানুষের মনে বসিয়ে দেবার চেষ্টা করতেন না।

৪৪. অর্থাৎ এগুলোর মধ্য থেকে যেগুলোই নিষিদ্ধ সেগুলো করা আল্লাহ অপছন্দ করেন.। অথবা অন্য কথায় বলা যায়, আল্লাহর যে কোন হুকুম অমান্য করা অপছন্দীয় কাজ।

৪৫. আপাতদৃষ্টে এখানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করা হয়েছে। কিন্তু এ ধরনের অবস্থায় মহান আল্লাহ নিজের নবীকে সম্বোধন করে যে কথা বলেন তা আসলে প্রত্যেক ব্যক্তিকে সম্বোধন করে বলা হয়।

৪৬. ব্যাখ্যার জন্য সূরা নাহলের ৫৭ থেকে ৫৯ পর্যন্ত আয়াতগুলো টীকা সহকারে দেখুন।

www.pathagar.com

১৯ রামাদান

বিষয়: কোমল ব্যবহার

সূরা আল ইমরান: ১৫৯-১৬৩

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ (159) إِن يَنصُرْكُمُ اللّهُ فَلاَ غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (160) وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ (161) أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللّهِ كَمَن بَاء بِسَخَطٍ مِّنَ اللّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (162) هُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ اللّهِ واللّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ (163)

১৫৯) (হে নবী!) এটা আল্লাহর বড়ই অনুগ্রহ যে, তোমার ব্যবহার তাদের প্রতি বড়ই কোমল। নয়তো যদি তুমি রুক্ষ স্বভাবের বা কঠোর চিত্ত হতে, তাহলে তারা সবাই তোমার চারপাশ থেকে সরে যেতো। তাদের ত্রুটি ক্ষমা করে দাও। তাদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করো এবং দ্বীনের ব্যাপারে বিভিন্ন পরামর্শে তাদেরকে অন্তর্ভুক্ত করো। তারপর যখন কোন মতের ভিত্তিতে তোমরা স্থির সংকল্প হবে তখন আল্লাহর ওপর ভরসা করো। আল্লাহ তাদেরকে পছন্দ করেন যারা তাঁর ওপর ভরসা করে কাজ করে।

১৬০) আল্লাহ যদি তোমাদের সাহায্য করেন তাহলে কোন শক্তি তোমাদের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করতে পারবে না। আর যদি তিনি তোমাদের পরিত্যাগ করেন, তাহলে এরপর কে আছেন তোমাদের সাহায্য করার মতো ? কাজেই সাচ্চা মু'মিনদের আল্লাহর ওপরই ভরসা করা উচিত।

১৬১) খেয়ানত করা কোন নবীর কাজ হতে পারে না।[১১৪] যে ব্যক্তি খেয়ানত করবে কিয়ামতের দিন সে নিজের খেয়ানত করা জিনিস সহকারে হাজির হয়ে যাবে। তারপর প্রত্যেকেই তার উপার্জনের পুরোপুরি প্রতিদান পেয়ে যাবে এবং কারো প্রতি কোন জুলুম করা হবে না।

১৬২) যে ব্যক্তি সবসময় আল্লাহর সন্তুষ্টি অনুযায়ী চলে সে কেমন করে এমন ব্যক্তির মতো কাজ করতে পারে, যাকে আল্লাহর গযব ঘিরে ফেলেছে এবং যার শেষ আবাস জাহান্নাম, যা সবচেয়ে খারাপ আবাস ?

www.pathagar.com

১৬৩) আল্লাহর কাছে এ উভয় ধরনের লোকদের মধ্যে বহু পর্যায়ের পার্থক্য রয়েছে। আল্লাহ সবার কার্যকলাপের ওপর নজর রাখেন।

আয়াত সমূহের ব্যাখ্যা

১১৪. পেছনের অংশের প্রতিক্ষার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে তীরন্দাজ বাহিনী মোতায়েন করেছিলেন তারা যখন দেখলো শত্রু সৈন্যদের মালমাত্তা লুটে নেয়া হচ্ছে তখন তারা আশংকা করলো, হয়তো সমগ্র ধন-সম্পদ তারাই পাবে যারা সেগুলো হস্তগত করছে এবং গনীমাত বন্টনের সময় আমরা বঞ্চিত হবো। তাই তারা নিজেদের জায়গা ছেড়ে দিয়ে শত্রু সেনাদের সম্পদ ছিনিয়ে নেবার কাজে লেগে গিয়েছিল। যুদ্ধ শেষে মদীনায় ফিরে এসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ তীরন্দাজ বাহিনীর লোকেদের ডেকে তাদের এ নাফরমানীর কারণ জিজ্ঞেস করলেন। জবাবে তারা এমন কিছু ওজর পেশ করলো যা ছিল আসলে অত্যন্ত দুর্বল। তাদের জবাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ "আসল কথা হচ্ছে, আমাদের ওপর তোমাদের আস্থা ছিল না। তোমরা মনে করছিলে আমরা তোমাদের সাথে খেয়ানত করবো এবং তোমাদের অংশ দেবো না"। এ আয়াতটিতে আসলে এ বিষয়টির প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। আল্লাহর বক্তব্যের অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর নবী নিজেই যখন ছিলেন তোমাদের সেনাপতি এবং সমস্ত বিষয়ই ছিল তাঁর হাতে তখন তোমাদের মনে এ আশংকা কেমন করে দেখা দিল যে, নবীর হাতে তোমাদের স্বার্থ সংরক্ষিত হবে না? আল্লাহর নবীর ব্যাপারে তোমরা কি এ আশংকা করতে পারো যে, তাঁর তত্বাবধানে যে সম্পদ থাকবে তা বিশুস্ততা, আমানতদারী ও ইনসাফের সাথে বন্টন না করে অন্য কোনভাবে বন্টন করা হবে?

www.pathagar.com

২০ রামাদান
বিষয়: পর্দা (হিজাব)
সূরা নূর: ২৪-২৭

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (27) فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (28) لَّيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ (29) قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (30) وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (31)

২৭) হে ঈমানদাগণ![২৩] নিজেদের গৃহ ছাড়া অন্যের গৃহে প্রবেশ করো না যতক্ষণ না গৃহবাসীদের সম্মতি লাভ করো [২৪] এবং তাদেরকে সালাম করো। এটিই তোমাদের জন্য ভালো পদ্ধতি, আশা করা যায় তোমরা এটিকে স্মরণ রাখবে।[২৫]

২৮) তারপর যদি সেখানে কাউকে না পাও, তাহলে তাতে প্রবেশ করো না যতক্ষণ তোমাদের অনুমতি না দেয়া হয়।[২৬] আর যদি তোমাদের বলা হয়, ফিরে যাও তাহলে ফিরে যাবে, এটিই তোমাদের জন্য বেশী শালীন ও পরিচ্ছন্ন পদ্ধতি [২৭] এবং যা কিছু তোমরা করো আল্লাহ তা খুব ভালোভাবেই জানেন।

২৯) তবে তোমাদের জন্য কোন ক্ষতি নেই যদি তোমরা এমন গৃহে প্রবেশ করো যেখানে কেউ বাস করে না এবং তার মধ্যে তোমাদের কোন কাজের জিনিস আছে [২৮] তোমরা যা কিছু প্রকাশ করো ও যা কিছু গোপন করো আল্লাহ সবই জানেন।

৩০) হে নবী ! মু'মিন পুরুষদের বলে দাও তারা যেন নিজেদের দৃষ্টি সংযত করে রাখে [২৯] এবং নিজেদের লজ্জাস্থানসমূহের হেফাজত করে।[৩০] এটি তাদের জন্য বেশী পবিত্র পদ্ধতি। যা কিছু তারা করে আল্লাহ তা জানেন।

www.pathagar.com

৩১) আর হে নবী! মু'মিন মহিলাদের বলে দাও তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত করে রাখে [৩১] এবং তাদের লজ্জাস্থানগুলোর হেফাজত করে [৩২] আর [৩৩] তাদের সাজসজ্জা না দেখায়,[৩৪] যা নিজে নিজে প্রকাশ হয়ে যায় তা ছাড়া।[৩৫] আর তারা যেন তাদের ওড়নার আঁচল দিয়ে তাদের বুক ঢেকে রাখে।[৩৬] তারা যেন তাদের সাজসজ্জা প্রকাশ না করে, তবে নিম্নোক্তদের সামনে ছাড়া [৩৭] স্বামী, বাপ,স্বামীর বাপ,[৩৮] নিজের ছেলে, স্বামীর ছেলে,[৩৯] ভাই,[৪০] ভাইয়ের ছেলে,[৪১] বোনের ছেলে,[৪২] নিজের মেলামেশার মেয়েদের ,[৪৩] নিজের মালিকানাধীনদের,[৪৪] অধীনস্থ পুরুষদের যাদের অন্য কোন রকম উদ্দেশ্য নেই [৪৫] এবং এমন শিশুদের সামনে ছাড়া যারা মেয়েদের গোপন বিষয় সম্পর্কে এখনো অজ্ঞ।[৪৬] তারা যেন নিজেদের যে সৌন্দর্য তারা লুকিয়ে রেখেছে তা লোকদের সামনে প্রকাশ করে দেবার উদ্দেশ্য সজোরে পদক্ষেপ না করে।[৪৭] হে মু'মিনগণ! তোমরা সবাই মিলে আল্লাহর কাছে তাওবা করো,[৪৮] আশা করা যায় তোমরা সফলকাম হবে।[৪৯]

আয়াত সমূহের ব্যাখ্যা

২৩. সূরাব শুরুতে যেসব বিধান দেয়া হয়েছিল সেগুলো ছিল সমাজে অসৎপ্রবণতা ও অনাচারের উদ্ভব হলে কিভাবে তার গতিরোধ করতে হবে তা জানাবার জন্য। এখণ যেসব বিধান দেয়া হচ্ছে সেগুলোর উদ্দেশ্য হচ্ছে সমাজে অসৎবৃত্তির উৎপত্তিটাই রোধ করা এবং সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড এমনভাবে শুধরানো যাতে করে এসব অসৎপ্রবণতা সৃষ্টির পথ বন্ধ হয়ে যায়। এসব বিধান অধ্যয়ন করার আগে দু'টি কথা ভালোভাবে মনের মধ্যে গেঁথে নিতে হবেঃ

এক: অপবাদের ঘটনার পরপরই এ বিধান বর্ণনা করা পরিষ্কারভাবে একথাই ব্যক্ত করে যে, রাসূলের স্ত্রীর ন্যায় মহান ও উন্নত ব্যক্তিত্বের বিরুদ্ধে এত বড় একটি ডাহা মিথ্যা অপবাদের এভাবে সমাজের অভ্যন্তরে ব্যাপক প্রচার লাভকে আল্লাহ আসলে একটি যৌন কামনা তাড়িত পরিবেশের উপস্থিতির ফল বলে চিহ্নিত করেছেন। আল্লাহর দৃষ্টিতে এ যৌন কামনা তাড়িত পরিবেশ বদলানোর একমাত্র উপায় এটাই ছিল যে, লোকদের পরস্পরের গৃহে নিঃসংকোচে আসা যাওয়া বন্ধ করতে হবে, অপরিচিত নারী-পুরুষদের পরস্পর দেখা-সাক্ষাত ও স্বাধীনভাবে মেলামেশার পথ রোধ করতে হবে. মেয়েদের একটি অতি নিকট পরিবেশের লোকজন ছাড়া গায়রে মুহাররাম আত্মীয়-স্বজন ও অপরিচিতদের সামনে সাজসজ্জা করে যাওয়া নিষিদ্ধ করতে হবে, পতিতাবৃত্তির পেশাকে চিরতরে বন্ধ করে দিতে হবে, পুরুষদের ও নারীদের দীর্ঘকাল অবিবাহিত রাখা যাবে না, এমনকি গোলাম ও বাঁদীদেরও বিবাহ দিতে হবে। অন্য কথায় বলা যায়, মেয়েদের পর্দাহীনতা ও সমাজে বিপুল সংখ্যক লোকের অবিবাহিত থাকাই আল্লাহর জ্ঞান অনুযায়ী এমন সব মৌলিক কার্যকারণ যেগুলোর মাধ্যমে সামাজিক পরিবেশে একটি অনুভূত যৌন কামনা সর্বক্ষণ প্রবাহমান থাকে এবং এ যৌন কামনার বশবর্তী হয়ে লোকদের চোখ, কান, মন-মানস সবকিছুই কোন বাস্তব বা কাল্পনিক কেলেংকারিতে (Scandal)

www.pathagar.com

জড়িত হবার জন্য সবসময় তৈরী থাকে। এ দোষ ও ত্রুটি সংশোধন করার জন্য আলোচ্য পর্দার বিধিসমূহের চেয়ে বেশী নির্ভুল, উপযোগী ও প্রভাবশালী অন্য কোন কর্মপন্থা আল্লাহর জ্ঞান-ভান্ডারে ছিল না। নয়তো তিনি এগুলো বাদ দিয়ে অন্য বিধান দিতেন।

দুই: এ সুযোগে দ্বিতীয় যে কথাটি বুঝে নিতে হবে সেটি হচ্ছে এই যে, আল্লাহর শরীয়ত কোন অসৎকাজ নিছক হারাম করে দিয়ে অথবা তাকে অপরাধ গণ্য করে তার জন্য শাস্তি নির্ধারিত করে দেয়াই যথেষ্ট মনে করে না বরং যেসব কার্যকারণ কোন ব্যক্তিকে ঐ অসৎকাজে লিপ্ত হতে উৎসাহিত করে অথবা তার জন্য সুযোগ সৃষ্টি করে দেয় কিংবা তাকে তা করতে বাধ্য করে, সেগুলোকেও নিশ্চিহ্ন করে দেয়। তাছাড়া শরীয়ত অপরাধের সাথে সাথে অপরাধের কারণ, অপরাধের উদ্যোক্তা ও অপরাধের উপায়-উপকরণাদির ওপরও বিধি নিষেধ আরোপ করে। এভাবে আসল অপরাধের ধারে কাছে পৌঁছার আগেই অনেক দূর থেকেই মানুষকে রুখে দেয়া হয়। মানুষ সবসময় অপরাধের কাছ দিয়ে ঘোরাফেরা করতে থাকবে এবং প্রতিদিন পাকড়াও হতে ও শাস্তি পেতে থাকবে, এটাও সে পছন্দ করে না। সে নিছক একজন অভিযুক্তই (Prosecutor) নয় বরং একজন সহানুভূতিশীল সহযোগী, সংস্কারকারী ও সাহায্যকারীও। তাই সে মানুষকে অসৎকাজ থেকে নিষ্কৃতি লাভের ক্ষেত্রে সাহায্য করার উদ্দেশ্যই সকল প্রকার শিক্ষামূলক, নৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা অবলম্বন করে।

২৪. আয়াতের সঠি অর্থ হবেঃ "লোকদের গৃহে প্রবেশ করো না যতক্ষণ না তাদেরকে অন্তরঙ্গ করে নেবে অথবা তাদের সম্মতি জেনে নেবে"। অর্থাৎ একথা না জেনে নেবে যে, গৃহমালিক তোমার আসাকে অপ্রীতিকর বা বিরক্তিকর মনে করছে না এবং তার গৃহে তোমার প্রবেশকে সে পছন্দ করছে। এ জন্য আমি অনুবাদে "অনুমতি নেবা"র পরিবর্তে 'সম্মতি লাভ' শব্দ ব্যবহার করেছি। কারণ এ অর্থটি মূলের নিকটতর।

২৫. জাহেলী যুগে আরববাসীদের নিয়ম ছিল, তারা সুপ্রভাত, শুভ সন্ধ্যা বলতে বলতে নি:সংকোচ সরাসরি একজন অন্যজনের গৃহে প্রবেশ করে যেতো। অনেক সময় বহিরাগত ব্যক্তি গৃহ মালিক ও তার বাড়ির মহিলাদেরকে বেসামাল অবস্থায় দেখে ফেলতো। আল্লাহ এর সংশোধনের জন্যই এ নীতি নির্ধারণ করেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তির যেখানে সে অবস্থান করে সেখানে তার ব্যক্তিগত গোপনীয়তা (Privacy) রক্ষা করার অধিকার আছে এবং তার সম্মতি ও অনুমতি ছাড়া তার এ গোপনীয়তায় হস্তক্ষেপ করা অন্য ব্যক্তির জন্য জায়েয নয়। এ হুকুমটি নাযিল হবার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমাজে যেসব নিয়ম ও রীতিনীতির প্রচলন করেন আমি নীচে সেগুলো বর্ণনা করছি:

এক: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যক্তিগত গোপনীয়তার এ অধিকারটিকে কেবলমাত্র গৃহের চৌহদ্দীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেননি। বরং একে একটি সাধারণ অধিকার গণ্য করেন। এ প্রেক্ষিতে অন্যের গৃহে উঁকি ঝুঁকি মারা, বাহির থেকে চেয়ে দেখা এমনি অন্যের চিঠি তার অনুমতি ছাড়া পড়ে ফেলা নিষিদ্ধ। হযরত সাওবান (নবী

www.pathagar.com

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আজাদ করা গোলাম) বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (সা) বলেন:

"দৃষ্টি যখন একবার প্রবেশ করে গেছে তখন আর নিজের প্রবেশ করার জন্য অনুমতি নেবার দরকার কি"? (আবু দাউদ)

হযরত হুযাইল ইবনে শুরাহবীল বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এলেন এবং ঠিক তাঁর দরজার ওপর দাঁড়িয়ে অনুমতি চাইলেন। নবী (সা) তাকে বললেন, "পিছনে সরে গিয়ে দাঁড়াও, যাতে দৃষ্টি না পড়ে সে জন্যই তো অনুমতি চাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে"। (আবু দাউদ) নবী করীমের (সা) নিজের নিয়ম ছিল এই যে, যখন কারোর বাড়িতে যেতেন, দরজার ঠিক সামনে কখনো দাঁড়াতেন না। কারণ সে যুগে ঘরের দরজায় পর্দা লটকানো থাকত না। তিনি দরজার ডান পাশে বা বাম পাশে দাঁড়িয়ে অনুমতি চাইতেন। (আবু দাউদ) রাসূলুল্লাহর (সা) খাদেম হযরত আনাস বলেন, এক ব্যক্তি বাইরে থেকে রাসূলের (সা) কামরার মধ্যে উঁকি দিলেন। রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে সে সময় একটি তীর ছিল। তিনি তার দিকে এভাবে এগিয়ে এলেন যেন তীরটি তার পেটে ঢুকিয়ে দেবেন। (আবু দাউদ)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেন, নবী (সা) বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের অনুমতি ছাড়া তার পত্রে চোখ বুলালো সে যেন আগুনের মধ্যে দৃষ্টি ফেলছে"। (আবুদ দাউদ)

বুখারী ও মুসলিমে উদ্ধৃত হয়েছে,নবী (সা) বলেছেনঃ

"যদি কোন ব্যক্তি তোমার গৃহে উঁকি মারে এবং তুমি একটি কাঁকর মেরে তার চোখ কানা করে দাও, তাহলে তাতে কোন গোনাহ হবে না।"

এ বিষয়বস্তু সম্বলিত অন্য একটি হাদীসে বলা হয়েছেঃ

"যে ব্যক্তি কারোর ঘরে উঁকি মারে এবং ঘরের লোকেরা তার চোখ ছেঁদা করে দেয়, তবে তাদের কোন জবাবদিহি করতে হবে না"।

ইমাম শাফিঈ এ হাদীসটিকে একদম শাব্দিক অর্থে গ্রহণ করেছেন এবং তিনি কেউ ঘরের মধ্যে উঁকি দিলে তার চোখ ছেঁদা করে দেবার অনুমতি দিয়েছেন। কিন্তু হানাফীগণ এর অর্থ নিয়েছেন এভাবে যে, নিছক দৃষ্টি দেবার ক্ষেত্রে এ হুকুমটি দেয়া হয়নি। বরং এটি এমন অবস্থায় প্রযোজ্য যখন কোন ব্যক্তি বিনা অনুমতিতে গৃহমধ্যে প্রবেশ করে, গৃহবাসীদের বাধা দেয়ায়ও সে নিরস্ত হয় না এবং গৃহবাসীরা তার প্রতিরোধ করতে থাকে। এ প্রতিরোধ ও সংঘাতের মধ্যে যদি তার চোখ ছেঁদা হয়ে যায় বা শরীরের কোন অঙ্গহানি হয় তাহলে এ জন্য গৃহবাসীরা দায়ী হবে না। (আহকামুল কুরআন-জাসসাস, ৩য় খন্ড, ৩৮৫ পৃষ্ঠা)

দুই: ফকীহগণ শ্রবণ শক্তিকেও দৃষ্টিশক্তির হুকুমের অন্তর্ভূক্ত করেছেন। যেমন অন্ধ ব্যক্তি যদি বিনা অনুমতিতে আসে তাহলে তার দৃষ্টি পড়বে না ঠিকই কিন্তু তার কান তো গৃহবাসীদের কথা বিনা অনুমতিতে শুনে ফেলবে। এ জিনিসটিও দৃষ্টির মতো ব্যক্তিগত গোপনীয়তার অধিকারে অবৈধ হস্তক্ষেপ।

www.pathagar.com

তিনঃ কেবলমাত্র অন্যের গৃহে প্রবেশ করার সময় অনুমতি নেবার হুকুম দেয়া হয়নি। বরং নিজের মা-বোনদের কাছে যাবার সময়ও অনুমতি নিতে হবে। এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলো, আমি কি আমার মায়ের কাছে যাবার সময়ও অনুমতি চাইবো? জবাব দিলেন, হ্যাঁ। সে বললো, আমি ছাড়া তাঁর সেবা কারার আর কেউ নেই। এক্ষেত্রে কি আমি যতবার তাঁর কাছে যাবো প্রত্যেকবার অনুমতি নেবো? জবাব দিলেন, "তুমি কি তোমার মাকে উলঙ্গ অবস্থায় দেখতে পছন্দ কর"? (ইবনে জারীর এ মুরসাল হাদীসটি আতা ইবনে ইয়াসার থেকে বর্ণনা করেছেন) আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের উক্তি হচ্ছে, "নিজেদের মা-বোনদের কাছে যাবার সময়ও অনুমতি নিয়ে যাও"। (ইবনে কাসীর) বরং ইবনে মাসউদ তো বলেন, নিজের ঘরে নিজের স্ত্রীর কাছে যাবার সময়ও অন্ততপক্ষে গলা খাঁকারী দিয়ে যাওয়া উচিত। তাঁর স্ত্রী যয়নবের বর্ণনা হচ্ছে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ যখনই গৃহে আসতে থাকেন তখনই আগেই এমন কোন আওয়াজ করে দিতেন যাতেন তিনি আসছেন বলে জানা যেতো। তিনি হঠাৎ ঘরের মধ্যে এসে যাওয়া পছন্দ করতেন না। (ইবনে জারীর)

চারঃ শুধুমাত্র এমন অবস্থায় অনুমতি চাওয়া জরুরী নয় যখন কারোর ঘরে হঠাৎ কোন বিপদ দেখা দেয়া। যেমন, আগুন লাগে অথবা কোন চোর ঢোকে। এ অবস্থায় সাহায্য দান করার জন্য বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করা যায়।

পাঁচঃ প্রথম প্রথম যখন অনুমতি চাওয়ার বিধান জারি হয় তখন লোকেরা তার নিয়ম কানুন জানতো না। একবার এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসে এবং দরজা থেকে চিৎকার করে বলতে থাকে, আমি কি ভেতরে ঢুকে যাবো? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বাঁদী রওযাহকে বলেন, এ ব্যক্তি অনুমতি চাওয়ার নিয়ম জানে না। একটু উঠে গিয়ে তাকে বলে এস, আস্সালামু আলাইকুম, আমি কি ভিতরে আসতে পারি?) বলতে হবে। (ইবনে জারির ও আবু দাউদ) জাবের ইবনে আবদুল্লাহ বলেন, আমি আমার বাবার ঋণের ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গেলাম এবং দরজায় করাঘাত করলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কে? আমি বললাম, আমি। তিনি দু-তিনবার বললেন, "আমি? আমি"? অর্থাৎ এখানে আমি বললে কে কি বুঝবে যে, তুমি কে? (আবু দাউদ)

কালাদাহ ইবনে হাম্বল নামে এক ব্যক্তি কাজে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গেলেন। সালাম ছাড়াই এমনি সেখানে গিয়ে বসলেন। তিনি বললেন, বাইরে যাও এবং আস্সালামু আলাইকুম বলে ভেতরে এসো। (আবু দাউদ) অনুমতি চাওয়ার সঠিক পদ্ধতি ছিল, মানুষ নিজের নাম বলে অনুমতি চাইবে। হযরত উমরের (রা) ব্যাপারে বর্ণিত আছে নবী করীমের (সা) খিদমতে হাজির হয়ে তিনি বলতেনঃ

"আসসালামু আলাইকুম, হে আল্লাহর রাসূল ! উমর কি ভেতরে যাবে"? (আবু দাউদ) অনুমতি নেবার জন্য নবী করীম (সা) বড় জোর তিনবার ডাক দেবার সীমা নির্দেশ করেছেন এবং বলেছেন যদি তিনবার ডাক দেবার পরও জবাব না পাওয়া যায়, তাহলে

www.pathagar.com

ফিরে যাও। (বুখারী মুসলিম, আবু দাউদ) নবী (সা) নিজেও এ পদ্ধতি অনুসরণ করতেন। একবার তিনি হযরত সা'দ ইবনে উবাদার বাড়ীতে গেলেন এবং আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ বলে দু'বার অনুমতি চাইলেন। কিন্তু ভেতর থেকে জবাব এলো না। তৃতীয় বার জবাব না পেয়ে তিনি ফিরে গেলেন। হযরত সা'দ ভেতর থেকে দৌড়ে এলেন এবং বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনার আওয়াজ শুনছিলাম। কিন্তু আমার মন চাচ্ছিল আপনার মুবারক কণ্ঠ থেকে আমার জন্য যতবার সালাম ও রহমতের দোয়া বের হয় ততই ভালো, তাই আমি খুব নীচু স্বরে জবাব দিচ্ছিলাম। (আবু দাউদ ও আহমাদ) এ তিনবার ডাকা একের পর এক হওয়া উচিত নয় বরং একটু থেমে হতে হবে। এর ফলে ঘরের লোকেরা যদি কাজে ব্যস্ত থাকে এবং সে জন্য তারা জবাব দিতে না পারে তাহলে সে কাজ শেষ করে জবাব দেবার সুযোগ পাবে।

ছয়ঃ গৃহমালিক বা গৃহকর্তা অথবা এমন এক ব্যক্তির অনুমতি গ্রহণযোগ্য হবে যার সম্পর্কে মানুষ যথার্থই মনে করবে যে, গৃহকর্তার পক্ষ থেকে সে অনুমতি দিচ্ছে। যেমন, গৃহের খাদেম অথবা কোন দায়িত্বশীল ব্যক্তি। কোন ছোট শিশু যদি বলে, এসে যান, তাহলে তার কথায় ভেতর প্রবেশ করা উচিত নয়।

সাতঃ অনুমতি চাওয়ার ব্যাপারে অযথা পীড়াপীড়ি করা অথবা অনুমতি না পাওয়ায় দরজার ওপর অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা জায়েয নয়। যদি তিনবার অনুমতি চাওয়ার পর গৃহকর্তার পক্ষ থেকে অনুমতি না পাওয়া যায় বা অনুমতি দিতে অস্বীকৃতি জানানো হয়, তাহলে ফিরে যাওয়া উচিত।

২৬. অর্থাৎ কারোর শূন্য গৃহে প্রবেশ করা জায়েয নয়। তবে যদি গৃহকর্তা নিজেই প্রবেশকারীকে তার খালি ঘরে প্রবেশ করার অনুমতি দিয়ে থাকে, তাহলে আপনি তার কামরায় বসে যাবেন। অথবা গৃহকর্তা অন্য কোন জায়গায় আছেন এবং আপনার আসার খবর পেয়ে তিনি বলে পাঠিয়েছেন, আপনি বসুন,আমি এখনই এসে যাচ্ছি। অন্যথায় গৃহে কেউ নেই অথবা ভেতর থেকে কেউ বলছে না নিছক এ কারণে বিনা অনুমতিতে ভেতরে ঢুকে যাওয়া কারোর জন্য বৈধ নয়।

২৭. অর্থাৎ এ জন্য নারাজ হওয়া মন খারাপ করা উচিত নয়। কোন ব্যক্তি যদি করো সাথে দেখা করতে না চায় তাহলে তার অস্বীকার করার অধিকার আছে। অথবা কোন কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে সে অক্ষমতা জানিয়ে দিতে পারে। ফকীহগণ 'ফিরে যাও' এর হুকুমের এ অর্থ নিয়েছেন যে, এ অবস্থায় দরজার সামনে গ্যাঁট হয়ে দাঁড়িয়ে যাওয়ার অনুমতি নেই বরং সেখান থেকে সরে যাওয়া উচিত। অন্যকে সাক্ষাত দিতে বাধ্য করা অথবা তার দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে তাকে বিরক্ত করতে থাকার অধিকার কোন ব্যক্তির নেই।

২৮. এখানে মূলতঃ হোটেল, সরাইখানা, অতিথিশালা, দোকান, মুসাফির খানা ইত্যাদি যেখানে লোকদের জন্য প্রবেশের সাধারণ অনুমতি আছে সেখানকার কথা বলা হচ্ছে।

২৯. এর মানে হচ্ছে, কোন জিনিস কম করা, হ্রাস করা ও নিচু করা। এর অনুবাদ সাধারণত করা হয়, "দৃষ্টি নামিয়ে নেয়া বা রাখা"। কিন্তু আসলে এ হুকুমের অর্থ

www.pathagar.com

সবসময় দৃষ্টি নিচের দিকে রাখা নয়। বরং এর অর্থ হচ্ছে, পূর্ণ দৃষ্টিভরে না দেখা এবং দেখার জন্য দৃষ্টিকে স্বাধীনভাবে ছেড়ে না দেয়া। "দৃষ্টি সংযত রাখা" থেকে এ অর্থ ভালোভাবে প্রকাশ পায়। অর্থাৎ যে জিনিসটি দেখা সংগত নয় তার ওপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিতে হবে। এ জন্য দৃষ্টি নত করাও যায় আবার অন্য কোন দিকে নজর ঘুরিয়েও নেয়া যায়। আয়াতের মধ্যে (মিন) "কিছু" বা "কতক" অর্থ প্রকাশ করছে। অর্থাৎ সমস্ত দৃষ্টি সংযত করার হুকুম দেয়া হয়নি বরং কোন কোন দৃষ্টি সংযত করতে বলা হয়েছে। অন্য কথায় বলা যায়, আল্লাহর উদ্দেশ্য এ নয় যে, কোন জিনিসই পূর্ণ দৃষ্টিতে দেখা উচিত নয় বরং তিনি কেবল মাত্র একটি বিশেষ গন্ডীর মধ্যে দৃষ্টির ওপর এ বিধি-নিষেধ আরোপ করেছেন। যে জিনিসের ওপর আরোপ করা হয়েছে সেটি হচ্ছে, পুরুষদের মহিলাদেরকে দেখা অথবা অন্যদের লজ্জাস্থানে দৃষ্টি দেয়া কিংবা অশ্লীল দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে থাকা।

আল্লাহর কিতাবের এ হুকুমটির যে ব্যাখ্যা হাদীস করেছে তার বিস্তারিত বিবরণ নিচে দেয়া হল:

এক: নিজের স্ত্রী বা মুহাররাম নারীদের ছাড়া কাউকে নজর ভরে দেখা মানুষের জন্য জায়েয নয়। একবার হঠাৎ নজর পড়ে গেলে ক্ষমাযোগ্য। কিন্তু প্রথম দৃষ্টিতে আকর্ষণীয় মনে হলে সেখানে আবার দৃষ্টিপাত করা ক্ষমার যোগ্য নয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ধরনের দেখাকে চোখের যিনা বলেছেন। তিনি বলেছেন: মানুষ তার সমগ্র ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে যিনা করে। দেখা হচ্ছে চোখের যিনা, ফুসলানো কণ্ঠের যিনা, তৃপ্তির সাথে কথা শোনা কানের যিনা, হাত লাগানো ও অবৈধ উদ্দেশ্য নিয়া চলা হাত ও পায়ের যিনা। ব্যভিচারের এ যাবতীয় ভূমিকা যখন পুরোপুরি পালিত হয় তখন লজ্জাস্থানগুলো তাকে পূর্ণতা দান করে অথবা পূর্ণতা দান থেকে বিরত থাকে। (বুখারী, মুসলিম ও আবু দাউদ)

হযরত বুরাইদাহ বর্ণনা করেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আলীকে (রা) বলেন:"হে আলী! এক নজরের পর দ্বিতীয় নজর দিয়ো না। প্রথম নজর তো ক্ষমাপ্রাপ্ত কিন্তু দ্বিতীয় নজরের ক্ষমা নেই"। (আহমাদ,তিরমিযী, আবু দাউদ, দারেমী)

হযরত জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ বাজালী বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, হঠাৎ চোখ পড়ে গেলে কি করবো? বললেন, চোখ ফিরিয়ে নাও অথবা নামিয়ে নাও। (মুসলিম, আহমাদ, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ)

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা:) রেওয়ায়াত করেছেন, নবী (সা) আল্লাহর উক্তি বর্ণনা করেছেন:

"দৃষ্টি হচ্ছে ইবলীসের বিষাক্ত তীরগুলোর মধ্য থেকে একটি তীর, যে ব্যক্তি আমাকে ভয় করে তা ত্যাগ করবে আমি তার বদলে তাকে এমন ঈমান দান করবো যার মিষ্টি সে নিজের হৃদয়ে অনুভব করবে"। (তাবারানী)

www.pathagar.com

আবু উমামাহ রেওয়ায়াত করেছেন, নবী (সা) বলেনঃ "যে মুসলমানের দৃষ্টি কোন মেয়ের সৌন্দর্যের ওপর পড়ে এবং এ দৃষ্টি সরিয়ে নেয়, এ অবস্থায় আল্লাহ তার ইবাদাতে বিশেষ স্বাদ সৃষ্টি করে দেন"। (মুসনাদে আহমাদ)

ইমাম জা'ফর সাদেক তাঁর পিতা ইমাম মুহাম্মাদ বাকের থেকে এবং তিনি হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ আনসারীর থেকে রেওয়ায়াত করেছেনঃ বিদায় হজ্জের সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচাত ভাই ফযল ইবনে আব্বাস (তিনি সে সময় ছিলেন একজন উঠতি তরুণ) মাশরে হারাম থেকে ফেরার পথে নবী করীমের (সা) সাথে তাঁর উটের পিঠে বসেছিলেন। পথে মেয়েরা যাচ্ছিল। ফযল তাদেরকে দেখতে লাগলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার মুখের ওপর হাত রাখলেন এবং তাকে অন্যদিকে ফিরিয়ে দিলেন। (আবু দাউদ) এ বিদায় হজ্জেরই আর একটি ঘটনা। খাস'আম গোত্রের একজন মহিলা পথে রাসূলুল্লাহকে (সা) থামিয়ে দিয়ে হজ্জ সম্পর্কে একটি বিধান জিজ্ঞেস করছিলেন। ফযল ইবনে আব্বাস তার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার মুখ ধরে অন্য দিকে ফিরিয়ে দিলেন। (বুখারী, তিরমিযী, আবু দাউদ)

দুই: এ থেকে কেউ যেন এ ভুল ধারণা করে না বসেন যে, নারীদের মুখ খুলে চলার সাধারণ অনুমতি ছিল তাইতো চোখ সংযত করার হুকুম দেয়া হয়। অন্যথায় যদি চেহারা ঢেকে রাখার হুকুম দেয়া হয়ে থাকে, তাহলে আবার দৃষ্টি সংযত করার বা না করার প্রশ্ন আসে কেন? এ যুক্তি বুদ্ধিবৃত্তিক দিক দিয়েও ভুল এবং ঘটনার দিক দিয়েও সঠিক নয়। বুদ্ধিবৃত্তিক দিক দিয়ে এর ভুল হবার কারণ হচ্ছে এই যে, চেহারার পর্দা সাধারণভাবে প্রচলিত হয়ে যাবার পরও হঠাৎ কোন নারী ও পুরুষেরর সামনাসামনি হয়ে যাবার মতো অবস্থা সৃষ্টি হয়ে যেতে পারে। আর একজন পর্দানশীন মহিলারও কখনো মুখ খোলার প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। অন্যদিকে মুসলমান মহিলারা পর্দা করা সত্ত্বেও অমুসলিম নারীরা তো সর্বাবস্থায় পর্দার বাইরেই থাকবে। কাজেই নিছক দৃষ্টি সংযত করার হুকুমটি মহিলাদের মুখ খুলে ঘোরাফেরা করাকে অনিবার্য করে দিয়েছে, এ যুক্তি এখানে পেশ করা যেতে পারে না। আর ঘটনা হিসেবে এটা ভুল হবার কারণ এই যে, সূরা আহযাবে হিজাবের বিধান নাযিল হবার পরে মুসলিম সমাজে যে পর্দার প্রচলন করা হয়েছিল। চেহারার পর্দা তার অন্তর্ভুক্ত ছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লামের মুবারক যুগে এর প্রচলন হবার ব্যাপারটি বহু হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। অপবাদের ঘটনা সম্পর্কে হযরত আয়েশার হাদীস অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য সূত্র পরম্পরায় বর্ণিত। তাতে তিনি বলেন, জংগল থেকে ফিরে এসে যখন দেখলাম কাফেলা চলে গেছে তখন আমি বসে পড়লাম এবং ঘুম আমার দু'চোখের পাতায় এমনভাবে জেঁকে বসলো যে, আমি ওখানেই ঘুমিয়ে পড়লাম। সকালে সাফওয়ান ইবনে মু'আত্তাল সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। দূর থেকে কাউকে ওখানে পড়ে থাকতে দেখে কাছে এলেন।

"তিনি আমাকে দেখতেই চিনে ফেললেন। কারণ পর্দার হুকুম নাযিল হবার আগে তিনি আমাকে দেখেছিলেন। আমাকে চিনে ফেলে যখন তিনি "ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে

www.pathagar.com

রাজেউন" পড়লেন তখন তাঁর আওয়াজে আমার চোখ খুলে গেলো এবং নিজের চাদরটি দিয়ে মুখ ঢেকে নিলাম"। (বুখারী, মুসলিম, আহমাদ, ইবনে জারীর, সীরাতে ইবনে হিশাম)।

আবু দাউদের কিতাবুল জিহাদে একটি ঘটনা উল্লিখিত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে উম্মে খাল্লাদ নাম্নী এক মহিলার ছেলে এক যুদ্ধে শহীদ হয়ে গিয়েছিল। তিনি তার সম্পর্কে জানার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এলেন। কিন্তু এ অবস্থায়ও তার চেহারা নেকাব আবৃত ছিল। কোন কোন সাহাবী অবাক হয়ে বললেন, এ সময়ও তোমার মুখ নেকাবে আবৃত। অর্থাৎ ছেলের শাহাদাতের খবর শুনে তো একজন মায়ের শরীরের প্রতি কোন নজর থাকে না, বেহুঁশ হয়ে পড়ে অথচ তুমি একদম নিশ্চিন্তে নিজেকে পর্দাবৃত করে এখানে হাজির হয়েছো! জবাবে তিনি বলতে লাগলেনঃ "আমি পুত্র তো হারিয়েছি ঠিকই কিন্তু লজ্জা তো হারাইনি"। আবু দাউদেই হযরত আয়েশার হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, এক মহিলা পর্দার পেছন থেকে হাত বাড়িয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আবেদন পেশ করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) জিজ্ঞেস করেন, এটা মহিলার হাত না পুরুষের? মহিলা বলেন, মহিলারই হাত। বলেন, "নারীর হাত হলে তো কমপক্ষে নখ মেহেদী রঞ্জিত হতো"। আর হজ্জের সময়ের যে দু'টি ঘটনার কথা আমরা ওপরে বর্ণনা করে এসেছি সেগুলো নবী যুগে চেহারা খোলা রাখার পক্ষে দলীল হতে পারে না। কারণ ইহরামের পোশাকে নেকাব ব্যবহার নিষিদ্ধ। তবুও এ অবস্থায়ও সাবধানী মেয়েরা পুরুষদের সামনে চেহারা খোলা রাখা পছন্দ করতেন না। হযরত আয়েশার বর্ণনা, বিদায় হজ্জের সফরে আমরা ইহরাম বাঁধা অবস্থায় মক্কার দিকে যাচ্ছিলাম। মুসাফিররা যখন আমাদের কাছ দিয়ে যেতে থাকতো তখন আমরা মেয়েরা নিজেদের মাথা থেকে চাদর টেনে নিয়ে মুখে ঢেকে নিতাম এবং তারা চলে যাবার পর মুখ আবরণমুক্ত করতাম। (আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ মুখ আবৃত করা যেখানে হারাম)

তিনঃ যেসব অবস্থায় কোন স্ত্রীলোককে দেখার কোন যথার্থ প্রয়োজন থাকে কেবলমাত্র সেগুলোই দৃষ্টি সংযত করার হুকুমের বাইরে আছে। যেমন কোন ব্যক্তি কোন মেয়েকে বিয়ে করতে চায়। এ উদ্দেশ্যে শুধুমাত্র মেয়েটিকে দেখার অনুমতি আছে। বরং দেখাটা কমপক্ষে মুসতাহাব তো অবশ্যই। মুগীরাহ ইবনে শু'বা বর্ণনা করেন, আমি এক জায়াগায় বিয়ের প্রস্তাব দেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করেন, মেয়েটিকে দেখে নিয়েছো তো? আমি বলি, না। বলেনঃ

"তাকে দেখে নাও। এর ফলে তোমাদের মধ্যে অধিকতর একাত্মতা সৃষ্টি হওয়ার আশা আছে"। (আহমদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, দারেমী)

আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি কোথাও বিয়ের পয়গাম দেয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ "মেয়েটিকে দেখে নাও। কারণ আনসারদের চোখে কিছু দোষ থাকে"। (মুসলিম, নাসাঈ, আহমাদ)

জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেনঃ

www.pathagar.com

"তোমাদের কেউ যখন কোন মেয়েকে বিয়ে করার ইচ্ছা করে তখন যতদূর সম্ভব তাকে দেখে নিয়ে এ মর্মে নিশ্চিন্ত হওয়া উচিত যে, মেয়েটির মধ্যে এমন কোন গুণ আছে যা তাকে বিয়ে করার প্রতি আকৃষ্ট করে"। (আহমাদ ও আবু দাউদ)

মুসনাদে আহমাদে আবু হুমাইদাহর বর্ণনা উদ্ধৃত করা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে রাসূলুল্লাহ (সা) এ উদ্দেশ্যে দেখার অনুমতিকে শব্দগুলোর সাহায্যে বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ এমনটি করায় ক্ষতির কিছু নেই। তাছাড়া মেয়েটির অজান্তেও তাকে দেখার অনুমতি দিয়েছেন। এ থেকেই ফকিহগণ প্রয়োজনের ক্ষেত্রে অন্যভাবে দেখার বৈধতার বিধানও উদ্ভাবন করেছেন। যেমন অপরাধ অনুসন্ধান প্রসঙ্গে কোন সন্দেহজনক মহিলাকে দেখা অথবা আদালতে সাক্ষ দেবার সময় কাযীর কোন মহিলা সাক্ষীকে দেখা কিংবা চিকিৎসার জন্য চিকিৎসকের রুগিনীকে দেখা ইত্যাদি।

চারঃ দৃষ্টি সংযত রাখার নির্দেশের এ অর্থও হতে পারে যে, কোন নারী বা পুরুষের সতরের প্রতি মানুষ দৃষ্টি দেবে না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ "কোন পুরুষ কোন পুরুষের লজ্জাস্থানের প্রতি দৃষ্টি দেবে না এবং কোন নারী কোন নারীর লজ্জাস্থানের প্রতি দৃষ্টি দেবে না"। (আহমাদ, মুসলিম, আবুদ দাউদ, তিরমিযী)

হযরত আলী (রা) রেওয়ায়াত করেছেন, নবী করীম (সা) আমাকে বলেনঃ "কোন জীবিত বা মৃত মানুষের রানের ওপর দৃষ্টি দিয়ো না"। (আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

৩০. লজ্জাস্থানের হেফাজত অর্থ নিছক প্রবৃত্তির কামনা থেকে দূরে থাকা নয়। বরং নিজের লজ্জাস্থানকে অন্যের সামনে উন্মুক্ত করা থেকে দূরে থাকাও বুঝায়। পুরুষের জন্য সতর তথা লজ্জাস্থানের সীমানা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত নির্ধারণ করেছেন। তিনি বলেছেনঃ "পুরুষের সতর হচ্ছে তার নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত"। (দারুকুতনী ও বাইহাকী) শরীরের এ অংশ স্ত্রী ছাড়া কারোর সামনে ইচ্ছাকৃতভাবে খোলা হারাম। আসহাবে সুফ্ফার দলভুক্ত হযরত জারহাদে আসলামী বর্ণনা করেছেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আল্লাইহি ওয়া সাল্লামের মজলিসে আমার রান খোলা অবস্থায় ছিল। নবী করীম (সা) বললেনঃ "তুমি কি জানো না, রান ঢেকে রাখার জিনিস" (তিরমিযী, আবুদ দাউদ, মুআত্তা) হযরত আলী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেনঃ "নিজের রান কখনো খোলা রাখবে না"। (আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ) কেবল অন্যের সামনে নয়, একান্তেও উলংগ থাকা নিষিদ্ধ। তাই নবী করীম (সা) বলেছেনঃ "সাবধান, কখনো উলঙ্গ থেকো না। কারণ তোমাদের সাথে এমন সত্তা আছে যারা কখনো তোমাদের থেকে আলাদা হয় না (অর্থাৎ কল্যাণ ও রহমতের ফেরেশতা), তোমরা যখন প্রকৃতির ডাকে সাড়া দাও অথবা স্ত্রীদের কাছে যাও সে সময় ছাড়া, কাজেই তাদের থেকে লজ্জা করো এবং তাদেরকে সম্মান করো"। (তিরমিযী)

অন্য একটি হাদীসে নবী করীম (সা) বলেনঃ "নিজের স্ত্রী ও ক্রীতদাসী ছাড়া বাকি সবার থেকে নিজের সতরের হেফাজত করো"। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করে, আর যখন আমরা একাকী থাকি? জবাব দেনঃ "এ অবস্থায় আল্লাহ থেকে লজ্জা করা উচিত, তিনিই এর বেশী হকদার"। (আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)।

www.pathagar.com

৩১. নারীদের জন্যও পুরুষদের মতো দৃষ্টি সংযমের একই বিধান রয়েছে। অর্থাৎ তাদের ইচ্ছা করে ভিন পুরুষদের দেখা উচিত নয়। ভিন পুরষদের প্রতি দৃষ্টি পড়ে গেলে ফিরিয়ে নেয়া উচিত এবং অন্যদের সতর দেখা থেকে দূরে থাকা উচিত। কিন্তু পুরুষদের পক্ষে মেয়েদেরকে দেখার তুলনায় মেয়েদের পক্ষে পুরুষদেরকে দেখার ব্যাপারে কিছু ভিন্ন বিধান রয়েছে। এদিকে হাদীসে আমরা এ ঘটনা পাচ্ছি যে, হযরত উম্মে সালামাহ ও হযরত উম্মে মাইমূনাহ নবী সাল্লাল্লাহু আল্লাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে বসেছিলেন এমন সময় হযরত ইবনে উম্মে মাকতুম এসে গেলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উভয় স্ত্রীকে বললেন, "তার থেকে পর্দা করো"। স্ত্রীরা বললেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল! তিনি কি অন্ধ নন? তিনি আমাদের দেখতে পাচ্ছেন না এবং চিনতেও পাচ্ছেন না" ।তখন তিনি বললেনঃ "তোমরা দু'জনও কি অন্ধ? তোমরা কি তাকে দেখতে পাচ্ছো না"? হযরত উম্মে সালামাহ (রা) পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন, এটা যখন পর্দার হুকুম নাযিল হয়নি সে সময়কার ঘটনা"। (আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিযী এবং মুআত্তার একটি রেওয়ায়াত এর সমর্থন করে, যাতে বলা হয়েছেঃ হযরত আয়েশার কাছে একজন অন্ধ এলেন এবং তিনি তার থেকে পর্দা করলেন। বলা হলো, আপনি এর থেকে পর্দা করছেন কেন? সে তো আপনাকে দেখতে পারে না। উম্মুল মু'মিনীন (রা) এর জবাবে বললেনঃ "কিন্তু আমি তো তাকে দেখছি"। অন্যদিকে আমরা হযরত আয়েশার একটি হাদীস পাই, তাতে দেখা যায়, ৭ম হিজরী সনে হাবশীদের প্রতিনিধি দল মদীনায় এলো এবং তারা মসজিদে নববীর চত্বরে একটি খেলার আয়োজন করলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে হযরত আয়েশাকে এ খেলা দেখালেন। (বুখারী,মুসলিম, আহমাদ) তৃতীয় দিকে আমরা দেখি, ফাতেমা বিনতে কায়েসকে যখন তাঁর স্বামী তিন তালাক দিলেন তখন প্রশ্ন দেখা দিল তিনি কোথায় ইদ্দত পালন করবেন। প্রথমে নবী করীম (সা) বললেন, উম্মে শরীক আনসারীয়ার কাছে থাকো। তারপর বললেন, তার কাছে আমার সাহাবীগণ অনেক বেশী যাওয়া আসা করে (কারণ তিনি ছিলেন একজন বিপুল ধনশালী ও দানশীলা মহিলা। বহু লোক তাঁর বাড়িতে মেহমান থাকতেন এবং তিনি তাদের মেহমানদারী করতেন।) কাজেই তুমি ইবনে উম্মে মাকতুমের ওখানে থাকো। সে অন্ধ। তুমি তার ওখানে নিঃসংকোচে থাকতে পারবে"। (মুসলিম ও আবু দাউদ)

এসব বর্ণনা একত্র করলে জানা যায়, পুরুষদেরকে দেখার ব্যাপারে মহিলাদের ওপর তেমন বেশী কড়াকড়ি নেই যেমন মহিলাদেরকে দেখার ব্যাপারে পুরুষের ওপর আরোপিত হয়েছে। এক মজলিসে মুখোমুখি বসে দেখা নিষিদ্ধ। পথ চলার সময় অথবা দূর থেকে কোন কোন জায়েয খেলা দেখতে গিয়ে পুরুষদের ওপর দৃষ্টি পড়া নিষিদ্ধ নয়। আর কোন যথার্থ প্রয়োজন দেখা দিলে একই বাড়িতে থাকা অবস্থায়ও দেখলে কোন ক্ষতি নেই। ইমাম গাযযালী ও ইবনে হাজার আসকালানীও হাদীসগুলো থেকে প্রায় এই একই ধরনের সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। শাওকানী নাইলুল আওতারে ইবনে হাজারের এ উক্তি উদ্ধৃত করেছেন যে, "এ থেকেও বৈধতার প্রতি সমর্থন পাওয়া যায়

www.pathagar.com

যে, মেয়েদের বাইরে বের হবার ব্যাপারে সবসময় বৈধতাকেই কার্যকর করা হয়েছে। মসজিদে, বাজারে এবং সফরে মেয়েরা তো মুখে নেকাব দিয়ে যেতো, যাতে পুরুষরা তাদেরকে না দেখে। কিন্তু পুরুষদেরকে কখনো এ হুকুম দেয়া হয়না যে, তোমরাও নেকাব পরো, যাতে মেয়েরা তোমাদেরকে না দেখে। এ থেকে জানা যায়, উভয়ের ব্যাপারে হুকুমের মধ্যে বিভিন্নতা রয়েছে"। (৬ষ্ঠ খন্ড, ১০১ পৃষ্ঠা) তবুও মেয়েরা নিশ্চিন্তে পুরুষদেরকে দেখবে এবং তাদের সৌন্দর্য উপভোগ করতে থাকবে, এটা কোনক্রমেই জায়েয নয়।

৩২. অর্থাৎ অবৈধ যৌন উপভোগ থেকে দূরে থাকে এবং নিজের সতর অন্যের সামনে উন্মুক্ত করাও পরিহার করে। এ ব্যাপারে মহিলাদের ও পুরুষদের জন্য একই বিধান, কিন্তু নারীদের সতরের সীমানা পুরুষদের থেকে আলাদা। তাছাড়া মেয়েদের সতর মেয়েদের ও পুরুষদের জন্য আবার ভিন্ন ভিন্ন।

পুরুষদের জন্য মেয়েদের সতর হাত ও মুখ ছাড়া তার সারা শরীর। স্বামী ছাড়া অন্য কোন পুরুষ এমন কি বাপ ও ভাইয়ের সামনেও তা খোলা উচিত নয়। মেয়েদের এমন পাতলা বা চোস্ত পোশাক পরা উচিত নয় যার মধ্য দিয়ে শরীর দেখা যায় বা শরীরের গঠন কাঠামো ভেতরে থেকে ফুটে উঠতে থাকে। হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, তাঁর বোন হযরত আসমা বিনতে আবু বকর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে আসেন। তখন তিনি পাতলা কাপড় পড়ে ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) সংগে সংগেই মুখ ফিরিয়ে নেন এবং বলেন:"হে আসমা! কোন মেয়ে যখন বালেগ হয়ে যায় তখন তার মুখ ও হাত ছাড়া শরীরের কোন অংশ দেখা যাওয়া জায়েয নয়"। (আবুদ দাউদ)

এ ধরনের আর একটি ঘটনা ইবনে জারীর হযরত আয়েশা থেকে উদ্ধৃত করেছেন: তাঁর কাছে তাঁর বৈপিত্রেয় ভাই আব্দুল্লাহ ইবনুত তোফায়েলের মেয়ে আসেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গৃহে প্রবেশ করে তাকে দেখেই মুখ ফিরিয়ে নেন। হযরত আয়েশা বললেন,হে আল্লাহর রাসূল! এ হচ্ছে আমার ভাইয়ের মেয়ে। তিনি বলেন:

"মেয়ে যখন বালেগ হয়ে যায় তখন তার জন্য নিজের মুখ ও হাত ছাড়া আর কিছু বের করে রাখা হালাল নয়, আর নিজের কব্জির ওপর হাত রেখে হাতের সীমানা তিনি এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, তাঁর মুঠি ও হাতের তালুর মধ্যে মাত্র একমুঠি পরিমাণ জায়গা খালি থাকে"।

এ ব্যাপারে শুধুমাত্র এতটুকু সুযোগ আছে যে, ঘরে কাজকর্ম করার জন্য মেয়েদের শরীরের যতটুকু অংশ খোলার প্রয়োজন দেখা দেয় নিজেদের মুহাররাম আত্মীয়দের (যেমন বাপ-ভাই ইত্যাদি) সামনে মেয়েরা শরীরের কেবলমাত্র ততটুকু অংশই খুলতে পারে। যেমন আটা মাখাবার সময় হাতের আস্তিন গুটানো অথবা ঘরের মেঝে ধুয়ে ফেলার সময় পায়ের কাপড় কিছু ওপরের দিকে তুলে নেয়া।

www.pathagar.com

আর মহিলাদের জন্য মহিলাদের সতরের সীমারেখা হচ্ছে পুরুষদের জন্য পুরুষদের সতরের সীমা রেখার মতই। অর্থাৎ নাভী ও হাঁটুর মাঝখানের অংশ। এর অর্থ এ নয় যে, মহিলাদের সামনে মহিলারা অর্ধ উলংগ থাকবে। বরং এর অর্থ শুধুমাত্র এই যে, নাভী ও হাঁটুর মাঝখানের অংশটুকু ঢাকা হচ্ছে ফরয এবং অন্য অংশগুলো ঢাকা ফরয নয়।

৩৩. এ বিষয়টি মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহর শরীয়ত নারীদের কাছে শুধুমাত্র এতটুকুই দাবী করে না যতটুকু পুরুষদের কাছে করে। অর্থাৎ দৃষ্টি সংযত করা এবং লজ্জাস্থানের হেফাজত করা। বরং তাদের কাছ থেকে আরো বেশী কিছু দাবী করে। এ দাবী পুরুষদের কাছে করেনি। পুরুষ ও নারী যে এ ব্যাপারে সমান নয় তা এ থেকে পরিষ্কার প্রকাশ হয়।

৩৪. আমি زِينَة শব্দের অনুবাদ করেছি "সাজসজ্জা"। এর দ্বিতীয় আর একটি অনুবাদ হতে পারে প্রসাধন। তিনটি জিনিসের ওপর এটি প্রযুক্ত হয়। সুন্দর কাপড়, অলংকার এবং মাথা, মুখ, হাত পা, ইত্যাদির বিভিন্ন সাজসজ্জা, যেগুলো সাধারণত মেয়েরা করে থাকে। আজকের দুনিয়ায় এ জন্য "মেকআপ" (Makeup) শব্দ ব্যবহার করা হয়। এ সাজসজ্জা কাকে দেখানো যাবে না এ ব্যাপারে বিস্তারিত বর্ণনা সামনের দিকে আসছে।

৩৫. তাফসীরগুলোর বিভিন্ন বর্ণনা এ আয়াতটির অর্থ যথেষ্ট অস্পষ্ট করে তুলেছে। অন্যথায় কথাটি মোটেও অস্পষ্ট নয়, একেবারেই পরিষ্কার। প্রথম বাক্যাংশে বলা হয়েছেঃ "তারা যেন নিজেদের সাজসজ্জা ও প্রসাধন প্রকাশ না করে"। আর দ্বিতীয় বাক্যাংশে নিষেধাজ্ঞায় যেসব জিনিসকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে তার মধ্যে যাকে আলাদা তথা নিষেধাজ্ঞার বাইরে রাখা হয়েছে তা হচ্ছে, "যা কিছু এ সাজসজ্জা থেকে আপনা আপনি প্রকাশ হয় বা প্রকাশ হয়ে যায়"। এর পরিষ্কার অর্থ হচ্ছে, মহিলাদের নিজেদের স্বেচ্ছায় এগুলো প্রকাশ ও এসবের প্রদর্শনী না করা উচিত। তবে যা নিজে নিজে প্রকাশ হয়ে যায় (যেমন চাদর বাতাসে উড়ে যাওয়া এবং কোন আবরণ উন্মুক্ত হয়ে যাওয়া) অথবা যা নিজে নিজে প্রকাশিত (যেমন ওপরে যে চারদটি জড়ানো থাকে, কোণ কোনক্রমেই তাকে লুকানো তো সম্ভব নয় আর নারীদের শরীরের সাথে লেপটে থাকার কারণে মোটামুটিভাবে তার মধ্যেও স্বতস্ফুর্ত ভাবে একটি আকর্ষণ সৃষ্টি হয়ে যায়) সে জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন জবাবদিহি নেই। এ আয়াতের এ অর্থই বর্ণনা করেছেন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, হাসান বসরী, ইবনে সীরীন ও ইবরাহীম নাখঈ।

পক্ষান্তরের কোন কোন মুফাসসির এর অর্থ নিয়েছেনঃ মানুষ স্বাভাবিকভাবে যা প্রকাশ করে দেয়, এবং তারপর তারা এর মধ্যে শামিল করে দিয়েছেন মুখ ও হাতকে তাদের সমস্ত সাজসজ্জাসহ। অর্থাৎ তাদের মতে মহিলারা তাদের গালে রুজ পাউডার, ঠোঁটে লিপস্টিক ও চোখে সুরমা লাগিয়ে এবং হাতে আংটি, চুড়ি ও কংকন ইত্যাদি পরে তা উন্মুক্ত রেখে লোকদের সামনে চলাফেরা করবে। ইবনে আব্বাস (রা) ও তাঁর শিষ্যগণ এ অর্থ বর্ণনা করেছেন। হানাফী ফকীহদের একটি বিরাট অংশও অর্থ গ্রহণ করেছেন। (আহকামুল কুরআন-জাসসাস, ৩য় খন্ড, ৩৮৮-৩৮৯ পৃষ্ঠা) কিন্তু আরবী ভাষার কোন

www.pathagar.com

নিয়মে এর অর্থে ব্যবহার করা যেতে পারে তা আমি বুঝতে অক্ষম। 'প্রকাশ হওয়া' ও 'প্রকাশ করার' মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। এবং আমরা দেখি কুরআন স্পষ্টভাবে 'প্রকাশ করার' থেকে বিরত রেখে "প্রকাশ হওয়া"র ব্যাপারে অবকাশ দিচ্ছে। এ অবকাশকে 'প্রকাশ করা' পর্যন্ত বিস্তৃত করা কুরআনেরও বিরোধী এবং এমন সব হাদীসেরও বিরোধী যেগুলো থেকে প্রমাণ হয় যে, নবী যুগে হিজাবের হুকুম এসে যাবার পর মহিলারা মুখ খুলে চলতো না, হিজাবের হুকুমের মধ্যে চেহারার পর্দাও শামিল ছিল এবং ইহরাম ছাড়া অন্যান্য সব অবস্থায় নেকাবকে মহিলাদের পোশাকের একটি অংশে পরিণত করা হয়েছিল। তারপর এর চাইতেও বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে এই যে, এ অবকাশের পক্ষে যুক্তি হিসেবে একথা পেশ করা হয় যে, মুখ ও হাত মহিলাদের সতরের অন্তর্ভূক্ত নয়। অথচ সতর ও হিজাবের মধ্যে আসমান-যমীন ফারাক। সতর মুহাররাম পুরুষদের সামনে খোলাও জায়েয নয়। আর হিজাব তো সতরের অতিরিক্ত একটি জিনিস, যাকে নারীদের ও গায়রে মুহাররাম পুরুষদের মাঝখানে আটকে দেয়া হয়েছে এবং এখানে সতরের নয় বরং হিজাবের বিধান আলোচ্য বিষয়।

৩৬. জাহেলী যুগে মহিলারা মাথায় এক ধরনের আঁটসাঁট বাঁধন দিতো। মাথার পেছনে চুলের খোঁপার সাথে এর গিরো বাঁধা থাকতো। সামনের দিকে বুকের একটি অংশ খোলা থাকত। সেখানে গলা ও বুকের ওপরের দিকে অংশটি পরিষ্কার দেখা যেতো। বুকে জামা ছাড়া আর কিছুই থাকতো না। পেছনের দিকে দুটো তিনটে খোঁপা দেখা যেতো। (তাফসীরে কাশশাফ, ২য় খন্ড, ৯০ পৃষ্ঠা, ইবনে কাসীর, ৩য় খন্ড ২৮৩-২৮৪ পৃষ্ঠা) এ আয়াত নাযিল হবার পর মুসলমান মহিলাদের মধ্যে ওড়নার প্রচলন করা হয়। আজকালকার মেয়েদের মতো তাকে ভাঁজ করে পেঁচিয়ে গলার মালা বানানো এর উদ্দেশ্য ছিল না। বরং এটি শরীরে জড়িয়ে মাথা, কোমর, বুক ইত্যাদি সব ভালোভাবে ঢেকে নেয়া ছিল এর উদ্দেশ্য। মু'মিন মহিলারা কুরআনের এ হুকুমটি শোনার সাথে সাথে যেভাবে একে কার্যকর করে হযরত আয়েশা (রা) তার প্রশংসা করে বলেন: সূরা নূর নাযিল হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ থেকে তা শুনে লোকেরা ঘরে ফিরে আসে এবং নিজেদের স্ত্রী, মেয়ে ও বোনদের আয়াতগুলো শোনায়। আনসারদের মেয়েদের মধ্যে এমন একজনও ছিল না যে এ আয়াত শোনার পর নিজের জায়গায় চুপটি করে বসে ছিল। প্রত্যেকে উঠে দাঁড়িয়েছিল। অনেকে নিজের কোমরে বাঁধা কাপড় খুলে নিয়ে আবার অনেকে চাদর তুলে নিয়ে সংগে সংগেই ওড়না বানিয়ে ফেলল এবং তা দিয়ে শরীর ঢেকে ফেললো। পরদিন ফজরের নামাযের সময় যতগুলো মহিলা মসজিদে নববীতে হাজির হয়েছিল তাদের সবাই দোপাট্টা ও ওড়না পরা ছিল। এ সম্পর্কিত অন্য একটি হাদীসে হযরত আয়েশা (রা) আরও বিস্তারিত বর্ণনা করে বলেন: মহিলারা পাতলা কাপড় পরিত্যাগ করে নিজেদের মোটা কাপড় বাছাই করে তা দিয়ে ওড়না তৈরী করলেন। (ইবনে কাসীর, ৩য় খন্ড, ২৮৪ পৃঃ এবং আবু দাউদ, পোশাক অধ্যায়) ওড়না পাতলা কাপড়ের না হওয়া উচিত। এ বিধানগুলোর মেজাজ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে চিন্তা করলে এ বিষয়টি নিজে নিজেই উপলব্ধি করা যায়। কাজেই

www.pathagar.com

আনসারদের মহিলারা হুকুম শুনেই বুঝতে পেরেছিল কোন ধরনের কাপড় দিয়ে ওড়না তৈরী করলে এ উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে। কিন্তু শরীয়ত প্রবর্তক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একথাটিকে শুধুমাত্র লোকদের বোধ ও উপলব্ধির ওপর ছেড়ে দেননি বরং তিনি নিজেই এর ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন। "দেহইয়াহ কালবী বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে মিসরের তৈরী সূক্ষ্ম মখমলের কাপড় নিয়ে এলো। তিনি তা থেকে এটুকরা আমাকে দিলেন এবং বললেন, এখন থেকে কেটে এক খন্ড দিয়ে তোমার নিজের জামা তৈরী করে নাও এবং এক অংশ দিয়ে তোমার স্ত্রীর দোপাট্টা বানিয়ে দাও, কিন্তু তাকে বলে দেবে- এর নিচে যেন আর একটি কাপড় লাগিয়ে নেয়, যাতে শরীরের গঠন ভেতর থেকে দেখা না যায়"। (আবু দাউদ, পোশাক অধ্যায়)।

৩৭. অর্থাৎ যাদের মধ্যে একটি মহিলা তার পূর্ণ সৌন্দর্য ও সাজসজ্জা সহকারে স্বাধীনভাবে থাকতে পারে এসব লোক হচ্ছে তারাই। এ জনগোষ্ঠীর বাইরে আত্মীয় বা অনাত্মীয় যে-ই থাক না কেন কোন নারীর তার সামনে সাজগোজ করে আসা বৈধ নয়। বাক্যে যে হুকুম দেয়া হয়েছিল তার অর্থ এখানে প্রকাশ করে দেয়া হয়েছে এভাবে যে, এ সীমিত গোষ্ঠীর বাইরে যারাই আছেন তাদের সামনে নারীর সাজসজ্জা ইচ্ছাকৃত বা বেপরোয়াভাবে নিজেই প্রকাশ করা উচিত নয়,তবে তার প্রচেষ্টা সত্ত্বেও অথবা তার ইচ্ছা ছাড়াই যা প্রকাশ হয়ে যায় অথবা যা গোপন করা সম্ভব না হয় তা আল্লাহর কাছে ক্ষমাযোগ্য।

৩৮. এর অর্থ শুধু বাপ নয় বরং দাদা ও দাদার বাপ এবং নানা ও নানার বাপও এর অন্তর্ভূক্ত। কাজেই একটি মহিলা যেভাবে তার বাপ ও শ্বশুড়ের সামনে আসতে পারে ঠিক তেমনিভাবে আসতে পারে তার বাপের ও নানার বাড়ির এসব মুরব্বীদের সামনেও।

৩৯. ছেলের অন্তর্ভুক্ত হবে নাতি, নাতির ছেলে, দৌহিত্র ও দৌহিত্রের ছেলে সবাই। আর এ ব্যাপারে নিজের ও সতীনের মধ্যে কোন ফারাক নেই। নিজের সতীন পুত্রদের সন্তানদের সামনে নারীরা ঠিক তেমনি স্বাধীনভাবে সাজসজ্জার প্রকাশ করতে পারে যেমন নিজের সন্তানদের ও সন্তানদের সন্তানদের সামনে করতে পারে।

৪০. ভাইয়ের মধ্যে সহোদর ভাই, বৈমাত্রেয় এবং বৈপিত্রেয় ভাই সবাই শামিল।

৪১. ভাই-বোনদের ছেলে বলতে তিন ধরনের ভাই বোনদের সন্তান বুঝানো হয়েছে অর্থাৎ তাদের নাতি, নাতির ছেলে এবং দৌহিত্র ও দোহিত্রের ছেলে সবাই এর অন্তর্ভুক্ত।

৪২. এখানে যেহেতু আত্মীয়দের গোষ্ঠী খতম হয়ে যাচ্ছে তাই সামনের দিকে অনাত্মীয় লোকদের কথা বলা হচ্ছে। এ জন্য সামনের দিকে এগিয়ে যাবার আগে তিনটি বিষয় ভালোভাবে বুঝে নিতে হবে। কারণ এ বিষয়গুলো না বুঝলে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা দেখা দেয়।

প্রথম বিষয়টি হচ্ছে, কেউ কেউ সাজসজ্জা প্রকাশের স্বাধীনতাকে কেবলমাত্র এমন সব আত্মীয় পর্যন্ত সীমাবদ্ধ মনে করেন যাদের নাম এখানে উচ্চারণ করা হয়েছে। বাকি

www.pathagar.com

সবাইকে এমনকি আপন চাচা ও আপন মামাকে যেসব আত্মীয়দের থেকে পর্দা করতে হবে তাদের মধ্যে গণ্য করেন। তাদের যুক্তি হচ্ছে, এদের নাম কুরআনে বলা হয়নি। কিন্তু একথা সঠিক নয়। আপন চাচা ও মামা তো দূরের কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো দুধ চাচা ও দুধ মামা থেকেও পর্দা করতে হযরত আয়েশাকে অনুমতি দেননি। সিহাহ সিত্তাহ ও মুসনাদে আহমাদে হযরত আয়েশা বর্ণিত একটি হাদীসে বলা হয়েছেঃ আবুল কু'আইসের ভাই আফলাহ তাঁর কাছে এলেন এবং ভেতর প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। যেহেতু তখন পর্দার হুকুম নাযিল হয়ে গিয়েছিল, তাই হযরত আয়েশা অনুমতি দিলেন না। তিনি বলে পাঠালেন, তুমি তো আমার ভাইঝি, কারণ তুমি আমার ভাই আবুল কু'আইসের স্ত্রীর দুধপান করেছো। কিন্তু এ সম্পর্কটা কি এমন পর্যায়ের যেখানে পর্দা উঠিয়ে দেয়া জায়েয? এ ব্যাপারে হযরত আয়েশা কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলেন না। ইত্যবসরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসে গেলেন। তিনি বললেন, সে তোমার কাছে আসতে পারে। এ থেকে জানা যায়, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই এ আয়াতকে এ অর্থে নেননি যে, এর মধ্যে যেসব আত্মীয়ের কথা বলা হয়েছে কেবল তাদের থেকে পর্দা করা হবে না এবং বাকি সবার থেকে পর্দা করা হবে। বরং তিনি এ থেকে নীতি নির্ধারণ করেছেন যে, যেসব আত্মীয়ের সাথে একটি মেয়ের বিয়ে হারাম তারা সবাই এ আয়াতের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। যেমন চাচা, মামা, জামাতা ও দুধ সম্পর্কীয় আত্মীয়-স্বজন। তাবেঈ'দের মধ্য হযরত হাসান বসরীও এ মত প্রকাশ করেছেন এবং আল্লামা আবু বকর জাসসাস আহকামুল কুরআনে এর প্রতিই সমর্থন জানিয়েছেন। (৩য় খন্ড, ৩৯০ পৃষ্ঠা)

দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে, যেসব আত্মীয়ের সাথে চিরন্তন হারামের সম্পর্ক নয় (অর্থাৎ যাদের সাথে একজন কুমারী বা বিধবার বিয়ে বৈধ) তারা মুহাররাম আত্মীয়দের অন্তর্ভূক্ত নয়। মেয়েরা নিঃসংকোচে সাজসজ্জা করে তাদের সামনে আসবে না। আবার একেবারে অনাত্মীয় অপরিচিতদের মতো তাদের থেকে তেমনি পূর্ণ পর্দাও করবে না যেমন ভিন পুরুষদের থেকে করে। এ দুই প্রান্তিকতার মাঝামাঝি কি দৃষ্টিভংগী হওয়া উচিত তা শরীয়তে নির্ধারিত নেই। কারণ এটা নির্ধারিত হতে পারে না। এর সীমানা বিভিন্ন আত্মীয়ের ব্যাপারে তাদের আত্মীয়তা, বয়স, পারিবারিক সম্পর্ক ও সম্বন্ধ এবং উভয়পক্ষের অবস্থার (যেমন এক গৃহে বা আলাদা আলাদা বাস করা) প্রেক্ষিতে অবশ্যই বিভিন্ন হবে এবং হওয়া উচিত। এ ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিজের নিয়ম ও কর্মপদ্ধতি যা কিছু ছিল তা থেকে আমরা এ দিক নির্দেশনাই পাই। হযরত আসরা বিনতে আবু বকর ছিলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শ্যালিকা। বহু হাদীস থেকে প্রমাণ পাওয়া যায়, তিনি রাসূলের (সা) সামনে আসতেন এবং শেষ সময় পর্যন্ত তাঁর ও নবী সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মধ্যে কমপক্ষে চেহারা ও হাতের ক্ষেত্রে কোন পর্দা ছিল না। বিদায় হজ্জ অনুষ্ঠিত হয় নবীর (সা) ইন্তিকালের মাত্র কয়েক মাস আগে এবং সে সময় এমন অবস্থাই বিরাজিত ছিল (দেখুন আবু দাউদ, হজ্জ অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ মুহাররাম তার গোলামকে আদব শিক্ষা দেবে)।

www.pathagar.com

অনুরূপভাবে হযরত উম্মেহানী ছিলেন আবু তালেবের মেয়ে ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচাত বোন। জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত তিনি নবী করীমের (সা) কাছে আসতেন এবং কমপক্ষে তাঁর সামনে কখনো নিজের মুখ ও চেহারার পর্দা করেননি। মক্কা বিজয়ের সময়ের একটি ঘটনা তিনি নিজেই বর্ণনা করেছেন। এ থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। (দেখুন আবু দাউদ, কিতাবুস সওম, বাবুন ফীন নীয়্যাত ফিস সওমে ওয়ার রুখসাতে ফকীহ।) অন্যদিক আমরা দেখি, হযরত আব্বাস তাঁর ছেলে ফযলকে এবং বারী'আহ ইবনে হারেস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আপন চাচাত ভাই) তাঁর ছেলে আবদুল মুত্তালিবকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এ বলে পাঠালেন যে, এখন তোমরা যুবক হয়ে গেছো, তোমরা রোজগারের ব্যবস্থা করতে না পারলে তোমাদের বিয়ে হতে পারে না, কাজেই তোমরা রাসূলের (সা) কাছে গিয়ে কোন চাকরির দরখাস্ত করো। তারা দু'জন হযরত যয়নবের গৃহে গিয়ে রাসূলুল্লাহর খিদমতে হাযির হলেন। হযরত যয়নব ছিলেন ফযলের আপন ফুপাত বোন আর আব্দুল মুত্তালিব ইবনে রাবী'আর বাপের সাথেও তাঁর ফযলের সাথে যেমন তেমনি আত্মীয় সম্পর্ক ছিল। কিন্তু তিনি তাদের দু'জনের সামনে হাযির হলেন না এবং রাসূলের (সা) উপস্থিতিতে পর্দার পেছন থেকে তাদের সাথে কথা বলতে থাকলেন। (আবু দাউদ, কিতাবুল খারাজ) এ দু'ধরনের ঘটনাবলী মিলিয়ে দেখলে ওপরে আমি যা বর্ণনা করে এসেছি বিষয়টির সে চেহারাই বোধগম্য হবে।

তৃতীয় বিষয় হচ্ছে, যেখানে আত্মীয়তা সন্দেহপূর্ণ হয়ে যায় সেখানে মুহাররাম আত্মীয়দের থেকেও সতর্কতা হিসেবে পর্দা করা উচিত। বুখারী, মুসলিম ও আবু দাউদে উদ্ধৃত হয়েছে, উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাওদার (রা) এক ভাই ছিল বাঁদিপুত্র (অর্থাৎ তাঁর পিতার ক্রীতদাসীর গর্ভজাত ছিল)। তাঁর সম্পর্কে হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাসকে (রা) তাঁর ভাই উতবা এ মর্মে অসীয়ত করেন যে, এ ছেলেকে নিজের ভাতিজা মনে করে তার অভিভাবকত্ব করবে কারণ সে আসলে আমার ওরসজাত। এ মামলাটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এলো। তিনি হযরত সা'দের দাবী এই বলে নাকচ করে দিলেন যে, "যার বিছানায় সন্তানের জন্ম হয়েছে সে-ই সন্তানের পিতা। আর ব্যভিচারীর জন্য রয়েছে পাথর"। কিন্তু সাথে সাথেই তিনি হযরত সাওদাকে বলে দিলেন, এ ছেলেটি থেকে পর্দা করবে, কারণ সে যে সত্যিই তার ভাই এ ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়নি।

৪৩. এর শাব্দিক অনুবাদ হচ্ছে, "তাদের মহিলারা"। এখানে কোন মহিলাদের কথা বলা হয়েছে সে বির্তকে পরে আসা যাবে। এখন সবার আগে যে কথাটি উল্লেখযোগ্য এবং যেদিকে দৃষ্টি দেয়া উচিত সেটি হচ্ছে, এখানে নিছক "মহিলারা" বলা হয়নি, যার ফলে মুসলমান মহিলার জন্য সমস্ত মহিলাদের এবং সব ধরনের মেয়েদের সামনে বেপর্দা হওয়া ও সাজসজ্জা প্রকাশ করা জায়েয হয়ে যেতো। বরং এর মাধ্যমে মহিলাদের সাথে তার স্বাধীনতাকে সর্ববিস্থায় একটি বিশেষ গন্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ করে

www.pathagar.com

দিয়েছে। সে গন্ডীর যে কোন পর্যায়েরই হোক না কেন তাতে কিছু আসে যায় না। এখন প্রশ্ন থেকে যায়, এটা কোন গন্ডী এবং সে মহিলারাই বা আর যাদের ওপর এ শব্দ প্রযুক্ত হয়? এর জবাব হচ্ছে এ ব্যাপারে ফকীহ ও মুফাসসিরগণের উক্তি বিভিন্নঃ

একটি দল বলেন, এখানে কেবলমাত্র মুসলমান মেয়েদের কথা বলা হয়েছে। যিম্মী বা অন্য যে কোন ধরনের অমুসলিম মেয়েরাই হোক না কোন মুসলমান মেয়েদেরকে তাদের থেকে এবং পুরুষদের থেকে যেমন করা হয় তেমনি পর্দা করা উচিত। ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ ও জুরাইজ এ মত পোষণ করেন। এরা নিজেদের সমর্থনে এ ঘটনাটিও পেশ করে থাকেন যে, হযরত উমর (রা) হযরত আবু উবাইদাহকে লিখেন, "আমি শুনেছি কিছু কিছু মুসলিম নারী অমুসলিম নারীদের সাথে হাম্মামে যাওয়া শুরু করেছেন। অথচ যে নারী আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে তার জন্য তার শরীরের ওপর তার মিল্লাতের অন্তর্ভুক্তদের ছাড়া অন্য কারোর দৃষ্টি পড়া হালাল নয়"। এ পত্র যখন হযরত আবু উবাইদাহ পান তখন তিনি হঠাৎ ভীত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েন এবং বলতে থাকেন, "হে আল্লাহ! যে সব মুসলমান মহিলা নিছক ফর্সা হবার জন্য এসব হাম্মামে যায় তাদের মুখ যেন আখেরাতে কালো হয়ে যায়"। (ইবনে জারীর, বায়হাকী ও ইবনে কাসীর)

দ্বিতীয় দলটি বলেন, এখানে সব নারীদের কথা বলা হয়েছে। ইমাম রাযীর দৃষ্টিতে এ মতটিই সঠিক। কিন্তু একথা বোধগম্য নয় যে, যদি সত্যিই আল্লাহর উদ্দেশ্য এটিই হয়ে থাকে তাহলে আবার نساءهن বলার অর্থ কি? এ অবস্থায় তো শুধু النساء বলা উচিত ছিল। তৃতীয় মতটিই যুক্তিসংগত এবং কুরআনের শব্দের নিকটতরও। সেটি হচ্ছে, যেসব নারীদের সাথে তারা মেলামেশা করে, যাদের সাথে তাদের জানাশোনা আছে, যাদের সাথে তারা সম্পর্কে রাখে এবং যারা তাদের কাজে কর্মে অংশ নেয় তাদের কথা এখানে বলা হয়েছে। তারা মুসলিমও হতে পারে আবার অমুসলিমও। অপরিচিত মহিলাদের যাদের স্বভাব-চরিত্র, আচার-আচরণের অবস্থা জানা নেই অথবা যাদের বাইরের অবস্থা সন্দেহজনক এবং যারা নির্ভরযোগ্য নয়, তাদেরকে এ গন্ডীর বাইরে রাখাই এর উদ্দেশ্য। কিছু সহীহ হাদীস থেকে এ মতের প্রতি সমর্থন পাওয়া যায়। হাদীসগুলোতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র স্ত্রীদের কাছে যিম্মি মহিলাদের উপস্থিতির কথা বলা হয়েছে। এ ব্যাপারে যে আসল জিনিসটির প্রতি দৃষ্টি দেয়া হবে সেটি ধর্মীয় বিভিন্নতা নয় বরং নৈতিক অবস্থা। অমুসলিম হলেও পরিচিত ও নির্ভরযোগ্য পরিবারের ভদ্র, লজ্জাশীলা ও সদাচারী মহিলাদের সাথে মুসলিম মহিলারা পুরোপুরি নিঃসংকোচে মেলামেশা করতে পারে। কিন্তু মুসলমান মেয়েরাও যদি বেহায়া, বেপর্দা ও অসদাচারী হয় তাহলে প্রত্যেক শরীফ ও ভদ্র পরিবারের মহিলার তাদের থেকে পর্দা করা উচিত। কারণ নৈতিকতার জন্য তাদের সাহচর্য ভিন্ন পুরুষদের সাহচর্যের তুলনায় কম ক্ষতিকর নয়। আর অপরিচিত মহিলারা যাদের অবস্থা জানা নেই, তাদের সাথে মেলামেশা করার সীমানা আমাদের মতে গায়রে মুহাররাম আত্মীয়দের সামনে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার সর্বাধিক সীমানার সমপরিমাণ হতে

www.pathagar.com

পারে। অর্থাৎ তাদের সামনে মহিলারা কেবলমাত্র মুখ ও হাত খুলতে পারে, বাকি সারা শরীর ও অঙ্গসজ্জা ঢেকে রাখতে হবে।

৪৪. এ নির্দেশটির অর্থ বুঝার ব্যাপারেও ফকীহদের মধ্যে মতবিরোধ হয়েছে। একটি দল এর অর্থ করেছেন এমন সব বাঁদী যারা কোন মহিলার মালিকানাধীন আছে। তাদের মতে, আল্লাহর উক্তির অর্থ হচ্ছে, বাঁদী মুশরিক বা আহলি কিতাব যে দলেরই অন্তর্ভুক্ত হোক না কেন মুসলিম মহিলা মালিক তার সামনে তো সাজসজ্জা প্রকাশ করতে পারে কিন্তু মহিলার নিজেরই মালিকানাধীন গোলামের থেকেও পর্দা করার ব্যাপারটি অপরিচিত স্বাধীন পুরুষের থেকে পর্দার সমপর্যায়ের। এটি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) মুজাহিদ,হাসান বসরী, ইবনে সীরীন, সাঈদ ইবনে মুসাইয়িব, তাউস ও ইমাম আবু হানীফার মত। ইমাম শাফেঈর একটি উক্তিও এর সমর্থনে পাওয়া যায়। এ মনীষীদের যুক্তি হচ্ছে, গোলামের জন্য তার মহিলা মালিক মুহাররাম নয়। যদি সে স্বাধীন হয়ে যায়, তাহলে তার আগের মহিলা মালিককে বিয়েও করতে পারে। কাজেই নিছক গোলামী এমন কোন কারণ হতে পারে না যার ফলে মহিলারা তাদের সামনে এমন স্বাধীনভাবে চলাফেরা করবে যার অনুমতি মুহাররাম পুরুষদের সামনে চলাফেরা করার জন্য দেয়া হয়েছে। এখন বাকী থাকে এ প্রশ্নটি যে, ما ملكت أيمانهن শব্দাবলী ব্যাপক অর্থবোধক, গোলাম ও বাঁদী উভয়ের জন্য ব্যবহার হয়, তাহলে আবার বিশেষভাবে বাঁদীদের জন্য একে ব্যবহার করার যুক্তি কি? এর জবাব তারা এভাবে দেন যে, এ শব্দাবলী যদিও ব্যাপক অর্থবোধক তবুও পরিবেশ ও পরিস্থিতি এগুলোর অর্থকে মহিলাদের জন্য বিশেষভাবে নির্দেশ করছে। প্রথমে نساءهن বলা হয় তারপর বলা হয় ما ملكت أيمانهن প্রথমে نساءهن শব্দ শুনে সাধারণ মানুষ মনে করতে পারতো এখানে এমন নারীদের কথা বলা হয়েছে যারা কোন নারীর পরিচিত মহলের বা আত্মীয়-স্বজনদের অন্তর্ভুক্ত হবে। এ থেকে হয়তো বাঁদীরা এর অন্তর্ভুক্ত নয়, এ ভুল ধারণা সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা ছিল। তাই ما ملكت أيمانهن বলে দিয়ে একথা পরিষ্কার করে দেয়া হয়েছে যে, স্বাধীন মেয়েদের মতো বাঁদীদের সামনেও সাজসজ্জার প্রদর্শনী করা যেতে পারে।

দ্বিতীয় দলের মতে এ অনুমতিতে বাঁদী ও গোলাম উভয়েই রয়েছে। এটি হযরত আয়েশা (রা) ও হযরত উম্মে সালামাহ (রা) ও অন্য কতিপয় আহলে বায়েত ইমামের অভিমত। ইমাম শাফেঈর একটি বিখ্যাত উক্তিও এর স্বপক্ষে রয়েছে। তাদের যুক্তি শুধুমাত্র ما ملكت أيمانهن এর ব্যাপক অর্থ থেকে নয় বরং তারা সুন্নাতে রাসূল থেকেও এর সমর্থনে প্রমাণ পেশ করেন। যেমন এ ঘটনাটিঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবদুল্লাহ ইবনে মাসআদাতিল ফাযারী নামক এক গোলামকে নিয়ে হযরত ফাতেমার বাড়িতে গেলেন। তিনি সে সময় এমন একটি চাদর গায়ে দিয়ে ছিলেন যা দিয়ে মাথা ঢাকতে গেলে পা খুলে যেতো এবং পা ঢাকতে গেলে মাথা খুলে যেতো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর হতবিহ্বল ভাব দেখে বললেন,"কোন দোষ

www.pathagar.com

নেই, এখানে আছে তোমার বাপ ও তোমার গোলাম"। (আবু দাউদ, আহমাদ ও বায়হাকী আনাস ইবনে মালেকের উদ্ধৃতি থেকে। ইবনে আসাকির তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে লিখেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত ফতেমাকে এ গোলামটি দিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি একে লালন পালন করেছিলেন এবং তারপর মুক্ত করে দিয়েছিলেন। কিন্তু এ উপকারের প্রতিদান সে এভাবে দিয়েছিল যে, সিফফীনের যুদ্ধের সময় হযরত আলীর প্রতি চরম শত্রুতার প্রকাশ ঘটিয়ে আমীর মু'আবিয়ার একান্ত সমর্থকে পরিণত হয়েছিল।) অনুরূপভাবে তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ উক্তিটি থেকেও যুক্তি প্রদর্শন করেন।

"যখন তোমাদের কেউ তার গোলামের সাথে "মুকাতাবাত" তথা অর্থ আদায়ের বিনিময়ে মুক্তি দেবার লিখিত চুক্তি করে এবং চুক্তিকৃত অর্থ আদায় করার ক্ষমতা রাখে তখন তার সে গোলাম থেকে পর্দা করা উচিত"। (আবু দাউদ ও তিরমিযী এবং ইবনে মাজাহ উম্মে সালামার রেওয়ায়াত থেকে।)

৪৫. মূলে التابعين غير أولي الاربة من الرجال শব্দাবলী বলা হয়েছে। এর শাব্দিক অনুবাদ হবে, "পুরুষদের মধ্য থেকে এমন সব পুরুষ যারা অনুগত, কামনা রাখে না"। এ শব্দগুলো থেকে প্রকাশ হয়, মুহাররাম পুরুষদের ছাড়া অন্য কোন পুরুষের সামনে একজন মুসলমান মহিলা কেবলমাত্র এমন অবস্থায় সাজসজ্জার প্রকাশ করতে পারে, যখন তার মধ্যে দু'টি গুণ পাওয়া যায়, এক: সে অনুগত অর্থাৎ অধীনস্থ ও কর্তৃত্বের অধীন। দুই: তার মধ্যে কামনা নেই। অর্থাৎ নিজের বয়স, শারীরিক অসামর্থ, বুদ্ধিবৃত্তিক দুর্বলতা, দারিদ্র ও অর্থহীনতা অথবা অন্যের পদানত হওয়া ও গোলামীর কারণে তার মনে গৃহকর্তার স্ত্রী, মেয়ে, বোন বা মা সম্পর্কে কোন কুসংকল্প সৃষ্টি হবার শক্তি বা সাহস থাকে না। এ হুকুমকে যে ব্যক্তিই নাফরমানীর অবকাশ অনুসন্ধানের নিয়তে নয় বরং আনুগত্য করার নিয়তে পড়বে সে প্রথম দৃষ্টিতেই অনুভব করবে যে, আজকালকার বেয়ারা, খানসামা, শোফার ও অন্যান্য যুবক কর্মচারীরা অবশ্য এ সংজ্ঞার আওতাভুক্ত হবে না। মুফাসসির ও ফকীহগণ এর যে ব্যাখ্যা করেছেন তার ওপর একবার নজর বুলালে জ্ঞানী ও বিশেষজ্ঞগণ এ শব্দগুলোর কি অর্থ বুঝেছেন তা জানা যেতে পারে:

ইবনে আব্বাস: এর অর্থ হচ্ছে এমন সব সাদাসিধে বোকা ধরনের লোক যারা মহিলাদের ব্যাপারে আগ্রহী নয়।

কাতাদাহ: এমন পদানত ব্যক্তি যে নিজের পেটের খাবার যোগাবার জন্য তোমার পেছনে পড়ে থাকে।

মুজাহিদ: এমন লোক যে ভাত চায়, মেয়েলোক চায় না।

শা'বী: যে ব্যক্তি কোন পরিবারের সাথে লেগে থাকে। এমনকি তাদের ঘরের লোকে পরিণত হয় এবং সে পরিবারে প্রতিপালিত হয়ে বড় হয়। ঘরের মেয়েদের প্রতি সে

www.pathagar.com

নজর দেয় না এবং এ ধরনের নজর দেবার হিম্মতই করতে পারে না। পেটের ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্যই সে তাদের সাথে লেগে থাকে।

তাউস ও যুহরী: নির্বোধ ব্যক্তি, যার মধ্যে মেয়েদের প্রতি উৎসাহ নেই এবং এর হিম্মতও নেই। (ইবনে জারীর, ১৮ খন্ড, ৯৫-৯৬ পৃষ্ঠা এবং ইবনে আসীর, ৩য় খন্ড, ২৮৫ পৃষ্ঠা)

এ ব্যাখ্যাগুলোর চাইতেও বেশী স্পষ্ট ব্যাখ্যা পাওয়া যায় একটি ঘটনা থেকে। এটি ঘটেছিল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জামানায়। বুখারী, মুসলিম আবু দাউদ, নাসাঈ ও আহমাদ প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ এটি হযরত আয়েশা (রা) ও উম্মে সালামাহ (রা) থেকে রেওয়ায়াত করেছেন। ঘটনাটি হচ্ছে: মদীনা তাইয়্যেবায় ছিল এক নপুংশক হিজড়ে। নবীর পবিত্র স্ত্রীগণ ও অন্য মহিলারা তাকে غير أولي الاربة এর মধ্যে গণ্য করে নিজেদের কাছে আসতে দিতেন। একদিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালামাহর কাছে গেলেন। সেখানে তিনি তাকে উম্মে সালামার (রা) ভাই আব্দুল্লাহ ইবনে আবু উমাইয়ার সাথে কথা বলতে শুনলেন। সে বলছিল, কাল যদি তায়েফ জয় হয়ে যায়, তাহলে আপনি গাইলান সাকাফির মেয়ে বাদীয়াকে না নিয়ে ক্ষান্ত হবেন না। তারপর সে বাদীয়ার সৌন্দর্য ও তার দেহ সৌষ্ঠবের প্রশংসা করতে থাকলে এমনকি তার গোপন অংগগুলোর প্রশংসামূলক বর্ণনাও দিয়ে দিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কথা শুনে বললেন, "ওরে আল্লার দুশমন! তুই তো তাকে খুবই লক্ষ্য করে দেখেছিস বলে মনে হয়"। তারপর তিনি হুকুম দিলেন, তার সাথে পর্দা করো এবং ভবিষ্যতে যেন সে গৃহে প্রবেশ করতে না পারে। এরপর তিনি তাকে মদীনা থেকে বের করে দিলেন এবং অন্যান্য নপুংশক পুরুষদেরকেও অন্যের গৃহে প্রবেশ করা নিষিদ্ধ করে দিলেন। কারণ তাদেরকে নপুংশক মনে করে মেয়েরা তাদের সামনে সতর্কতা অবলম্বন করতো না এবং তারা এক ঘরের মেয়েদের অবস্থা অন্য ঘরের পুরুষদের কাছে বর্ণনা করতো। এ থেকে জানা যায়, কারো (কামনাহীন) হবার জন্য কেবলমাত্র এতটকুই যথেষ্ট নয় যে, সে শারীরিক দিক দিয়ে ব্যভিচার করতে সমর্থ নয়। যদি তার মধ্যে প্রচ্ছন্ন যৌন কামনা থেকে তাকে এবং সে মেয়েদের ব্যাপারে আগ্রহান্বিত হয় তাহলে অবশ্যই সে অনেক রকমের বিপদের কারণ হতে পারে।

৪৬. অর্থাৎ যাদের মধ্যে এখনো যৌন কামনা সৃষ্টি হয়নি। বড় জোর দশ-বারো বছরের ছেলেদের ব্যাপারে একথা বলা যেতে পারে। এর বেশী বয়সের ছেলেরা অপ্রাপ্ত বয়স্ক হলেও তাদের মধ্যে যৌন কামনার উন্মেষ হতে থাকে।

৪৭. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ হুকুমটিকে কেবলমাত্র অলংকারের ঝংকারের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেননি। বরং এ থেকে এ নীতি নির্ধারণ করেছেন যে, দৃষ্টি ছাড়া অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলোকে উত্তেজিতকারী জিনিসগুলোও আল্লাহ তা'আলা মহিলাদেরকে যে উদ্দেশ্যে সাজসজ্জা ও সৌন্দর্যের প্রকাশনী করতে নিষেধ করেছেন

www.pathagar.com

তার বিরোধী। তাই তিনি মহিলাদেরকে খোশবু লাগিয়ে বাইরে বের না হবার হুকুম দিয়েছেন। হযরত আবু হুরায়রার (রা) রেওয়ায়াত হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেনঃ

"আল্লাহর দাসীদেরকে আল্লাহর মসজিদে আসতে নিষেধ করো না। কিন্তু তারা যেন খোশবু লাগিয়ে না আসে"। (আবু দাউদ ও আহমাদ) একই বক্তব্য সম্বলিত অন্য একটি হাদীসে বলা হয়েছে, একটি মেয়ে খোশবু মেখেছে। তিনি তাকে থামিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "হে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর দাসী! তুমি কি মসজিদ থেকে আসছো? সে বললো হ্যাঁ? বললেন, আমি আমার প্রিয় আবুল কাসেম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে মেয়ে মসজিদে খোশবু মেখে আসে তার নামায ততক্ষন কবুল হয় না যতক্ষন না সে বাড়ি ফিরে ফরয গোসলের মত গোসল করে"। (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, আহমাদ নাসাঈ)। আবু মূসা আশআরী বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

"যে নারী আতর মেখে পথ দিয়ে যায়, যাতে লোকেরা তার সুবাসে বিমোহিত হয়, সে এমন ও এমন। তিনি তার জন্য খুবই কঠিন শব্দ ব্যবহার করেছেন"। (তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ) তাঁর নির্দেশ ছিল, মেয়েদের এমন খোশবু ব্যবহার করা উঁচিত, যার রং অনেক কিন্তু সুবাস হালকা। (আবু দাউদ)।

অনুরূপভাবে নারীরা প্রয়োজন ছাড়া নিজেদের আওয়াজ পুরুষদেরকে শোনাবে এটাও তিনি অপছন্দ করতেন। প্রয়োজনে কথা বলার অনুমতি কুরআনেই দেয়া হয়েছে এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র স্ত্রীগণ নিজেরাই লোকদেরকে দ্বীনী মাসায়েল বর্ণনা করতেন। কিন্তু যেখানে এর কোন প্রয়োজন নেই এবং কোন দ্বীনী বা নৈতিক লাভও নেই সেখানে মহিলারা নিজেদের আওয়াজ ভিন পুরুষদেরকে শুনাবে, এটা পছন্দ করা হয়নি। কাজেই নামাযে যদি ইমাম ভুলে যান তাহলে পুরুষদের সুবহানাল্লাহ বলার হুকুম দেয়া হয়েছে কিন্তু মেয়েদেরকে এক হাতের ওপর অন্য হাত মেরে ইমামকে সতর্ক করে দেবার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। (বুখারী, মুসলিম, আহমাদ, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)।

৪৮. অর্থাৎ এ ব্যাপারে এ পর্যন্ত যেসব ভুল-ভ্রান্তি তোমরা করেছো তা থেকে তাওবা করো এবং ভবিষ্যতের জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যেসব নির্দেশ দিয়েছেন সে অনুযায়ী নিজেদের কর্মপদ্ধতি সংশোধন করে নাও।

৪৯. প্রসংগত এ বিধানগুলো নাযিল হবার পর কুরআনের মর্মবাণী অনুযায়ী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইসলামী সমাজে অন্য যেসব সংস্কারমূলক বিধানের প্রচলন করেন সেগুলোর একটি সংক্ষিপ্তসারও এখানে বর্ণনা করা সংগত মনে করছিঃ

একঃ মুহাররাম আত্মীয়ের অনুপস্থিতিতে তিনি অন্য লোকদেরকে (আত্মীয় হলেও) কোন মেয়ের সাথে একাকী সাক্ষাত করতে ও তার কাছে নির্জনে বসতে নিষেধ

www.pathagar.com

করেছেন। হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহর রেওয়ায়াত হচ্ছে, নবী করীম (সা) বলেছেনঃ

"যেসব নারীর স্বামী বাইরে গেছে তাদের কাছে যেয়ো না। কারণ শয়তান তোমাদের মধ্য থেকে প্রত্যেকের রক্ত ধারায় আবর্তন করছে"। (তিরমিযী)

হযরত জাবের থেকে অন্য একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে, তাতে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেনঃ

"যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের দিনের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন কখনো কোন মেয়ের সাথে নির্জনে সাক্ষাত না করে যতক্ষণ না ঐ মেয়ের কোন মুহাররাম তার সাথে থাকে। কারণ সে সময় তৃতীয়জন থাকে শয়তান"। (আহমাদ)
প্রায় এ একই ধরনের বিষয়বস্তু সম্বলিত তৃতীয় একটি হাদীস ইমাম আহমাদ আমের ইবনে রাবীআহ থেকে উদ্ধৃত করেছেন। এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহর (সা) নিজের সতর্কতা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, একবার রাতের বেলা তিনি হযরত সাফিয়ার সাথে তাঁর গৃহের দিকে যাচ্ছিলেন। পথে দু'জন আনসারী তাঁর পাশ দিয়ে গেলেন। তিনি তাদেরকে থামিয়ে বললেন, আমার সাথের এ মহিলা হচ্ছে আমার স্ত্রী সাফিয়া। তারা বললেন, সুবহানাল্লাহ! হে আল্লাহর রাসূল! আপনার সম্পর্কেও কি কোন কুধারণা হতে পারে? বললেন, শয়তান মানুষের মধ্যে রক্তের মতো চলাচল করে। আমার আশংকা হলো সে আবার তোমাদের মনে কোন কুধারণা সৃষ্টি না করে বসে। (আবু দাউদ, সওম অধ্যায়)।

দুইঃ কোন পুরুষেরর হাত কোন গায়রে মুহাররাম মেয়ের গায়ে লাগুক এটাও তিনি বৈধ করেননি। তাই তিনি পুরুষদের হাতে হাত রেখে বাই'আত করতেন। কিন্তু মেয়েদের বাই'আত নেবার সময় কখনো এ পদ্ধিত অবলম্বন করতেন না। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাত কখনো কোন ভিন মেয়ের শরীরে লাগেনি। তিনি মেয়েদের থেকে শুধুমাত্র মৌখিক শপথ নিতেন এবং শপথ নেয়া শেষ হলে বলতেন, যাও তোমাদের বাই'আত হয়ে গেছে"। (আবু দাউদ, কিতাবুল খারাজ)।

তিনঃ তিনি মেয়েদের মুহাররাম ছাড়া একাকী অথবা গায়রে মুহাররামের সাথে সফর করতে কঠোরভাবে নিষেধ করতেন। বুখারী ও মুসলিম ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়াতে উদ্ধৃত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সা) খুতবায় বলেনঃ

"কোন পুরুষ যেন কোন মহিলার সাথে একান্তে সাক্ষাত না করে যতক্ষন তার সাথে তার মুহাররাম না থাকে এবং কোন মহিলা যেন সফর না করে যতক্ষন না তার কোন মুহাররাম তার সাথে থাকে"।

এক ব্যক্তি উঠে বললো, আমার স্ত্রী হজ্জে যাচ্ছে এবং আমার নাম অমুক অভিযানে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে লেখা হয়ে গেছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, "বেশ, তুমি তোমার স্ত্রীর সাথে হজ্জে চলে যাও"। এ বিষয়বস্তু সম্বলিত বহু হাদীস ইবনে উমর, আবু

www.pathagar.com

সাঈদ খুদরী ও আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে নির্ভরযোগ্য হাদীসের কিতাবগুলোতে বর্ণিত হয়েছে। সেগুলোতে শুধুমাত্র সফরের সময়সীমা অথবা সফরের দূরত্বের ক্ষেত্রে বিভিন্নতা আছে কিন্তু এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাসী মু'মিন মহিলার পক্ষে মুহাররাম ছাড়া সফর করা বৈধ নয়। এর মধ্যে কোন হাদীসে ১২ মাইল বা এর চেয়ে বেশী দূরত্বের সফরের ওপর বিধি-নিষেধের কথা বলা হয়েছে। কোনটিতে একদিন, কোনটিতে এক দিন এক রাত, কোনটিতে দু'দিন আবার কোনটিতে তিন দিনের সীমা নির্দেশ করা হয়েছে। কিন্তু এ বিভিন্নতা এ হাদীসগুলোর নির্ভরযোগ্যতা খতম করে দেয় না এবং এ কারণে এর মধ্য থেকে কোন একটি হাদীসকে অন্য সব হাদীসের ওপর প্রাধান্য দিয়ে এ হাদীসে বর্ণিত সীমারেখাকে আইনগত পরিমাপ গণ্য করার চেষ্টা করাও আমাদের জন্য অপরিহার্য হয় না। কারণ এ বিভিন্নতার একটি যুক্তিসংগত কারণ বোধগম্য হতে পারে। অর্থাৎ বিভিন্ন সময়ের ঘটনা যেমন রাসূলের (রা) সামনে এসেছে সে অনুযায়ী তিনি তার হুকুম বর্ণনা করেছেন। যেমন কোন মহিলা যাচ্ছেন তিন দিনের দূরত্বের সফরে এবং এ ক্ষেত্রে তিনি মুহাররাম ছাড়া তাকে যেতে নিষেধ করেছেন। আবার কেউ এক দিনের দূরত্বের সফরে যাচ্ছেন এবং তিনি তাকেও থামিয়ে দিয়েছেন। এখানে বিভিন্ন প্রশ্নকারীর বিভিন্ন অবস্থা এবং তাদের প্রত্যেককে তাঁর পৃথক পৃথক জবাব আসল জিনিস নয়। বরং আসল জিনিস হচ্ছে ওপরে ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়াতে যে নিয়ম বর্ণনা করা হয়েছে সেটি। অর্থাৎ সফর, সাধারণ পরিভাষায় যাকে সফর বলা হয় কোন মেয়ের মুহাররাম ছাড়া এ ধরনের সফর করা উচিত নয়।

চারঃ রাসূলুল্লাহ (সা) মৌখিকভাবে এবং কার্যত ও নারী ও পুরুষেরর মেলামেশা রোধ করার প্রচেষ্টা চালান। ইসলামী জীবনে জুম'আ ও জামা'আতের গুরুত্ব কোন ইসলামী জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তির অজানা নয়। জুম'আকে আল্লাহ নিজেই ফরয করেছেন। আর জামা'আতের সাথে নামায পড়ার গুরুত্ব এ থেকেই অনুধাবন করা যেতে পারে যে, যদি কোন ব্যক্তি কোন প্রকার অক্ষমতা ছাড়াই মসজিদে হাজির না হয়ে নিজ গৃহে নামায পড়ে নেয় তাহলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উক্তি অনুযায়ী তার নামায গৃহীতই হয় না। আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, দারুকুতনী ও হাকেম ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়াতের মাধ্যমে) কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুম'আর নামায ফরয হওয়া থেকে মেয়েদেরকে বাদ রেখেছেন। (আবু দাউদ উম্মে আতীয়্যার রেওয়ায়াতের মাধ্যমে দারুকুতনী ও বাইহাকী জাবেরের রেওয়ায়াতের মাধ্যমে এবং আবু দাউদ ও হাকেম তারেক ইবনে শিহাবের রেওয়ায়াতের মাধ্যমে) আর জামা'আতের সাথে নামাযে শরিক হওয়াকে মেয়েদের জন্য বাধ্যতামূলক তো করেনইনি বরং এর অনুমতি দিয়েছেন এভাবে যে, যদি তারা আসতে চায় তাহলে তাদেরকে বাধা দিয়ো না। তারপর এর সাথে একথাও বলে দিয়েছেন যে, তাদের জন্য ঘরের নামায মসজিদের নামাযের চেয়ে ভালো। ইবনে উমর (রা) ও আবু হুরায়রার (রা) রেওয়ায়াত হচ্ছে, নবী করীম (সা) বলেছেনঃ "আল্লাহর দাসীদেরকে আল্লাহর মসজিদে যেতে বাধা দিয়ো না"। (আবু

www.pathagar.com

দাউদ) অন্য রেওয়ায়াতগুলো বর্ণিত হয়েছে ইবনে উমর থেকে নিম্নোক্ত শব্দাবলী এবং এর সাথে সামঞ্জস্যশীল শব্দাবলি সহকারেঃ

"মহিলাদেরকে রাতের বেলায় মসজিদে আসার অনুমতি দাও"। (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, আবু দাউদ)

অন্য একটি রেওয়ায়াতের শব্দাবলি হচ্ছেঃ

"তোমাদের নারীদেরকে মসজিদে আসতে বাধা দিয়ো না, তবে তাদের ঘর তাদের জন্য ভালো"। (আহমাদ, আবু দাউদ)

উম্মে হুমাইদ সায়েদীয়া বলেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! আপনার পেছনে নামায পড়তে আমার খুবই ইচ্ছা হয়। তিনি বললেন, "তোমার নিজের কামরায় নামায পড়া বারান্দায় নামায পড়ার চাইতে ভালো, তোমার নিজের ঘরে নামায পড়া নিজের মহল্লার মসিজদে নামায পড়ার চাইতে ভালো এবং তোমার মহল্লার মসজিদে নামায পড়া জামে মসজিদে নামায পড়ার চেয়ে ভালো"। (আহমাদ ও তাবারানী) প্রায় এই একই ধরনের বিষয়বস্তু সম্বলিত হাদীস আবু দাউদে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। আর হযরত উম্মে সালামার (রা) রেওয়ায়াতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শব্দাবলী হচ্ছেঃ "মহিলাদের জন্য তাদের ঘরের অভ্যন্তর ভাগ হচ্ছে সবচেয়ে ভালো মসজিদ"। (আহমদ, তাবারানী) কিন্তু হযরত আয়েশা (রা) বনী উমাইয়া আমলের অবস্থা দেখে বলেন, "যদি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নারীদের আজকের অবস্থা দেখতেন তাহলে তাদের মসজিদে আসা ঠিক তেমনিভাবে বন্ধ করতেন যেমনভাবে বনী ইসরাঈলদের নারীদের আসা বন্ধ করা হয়েছিল। (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ) মসজিদে নববীতে নারীদের প্রবেশের জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি দরজা নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। হযরত উমর (রা) নিজেদের শাসনামলে এ দরজা দিয়ে পুরুষদের যাওয়া আসা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছিলেন। (আবু দাউদ ই'তিযালুন নিসা ফিল মাসাজিদ ও মা জাআ ফী খুরুজিন নিসা ইলাল মাসাজিদ অধ্যায়) জামা'আতে মেয়েদের লাইন রাখা হতো পুরুষেরদের লাইনের পেছনে এবং নামায শেষে রাসূলুল্লাহ (সা) সালাম ফেরার পর কিছুক্ষন বসে থাকতেন, যাতে পুরুষদের ওঠার আগে মেয়েরা উঠে চলে যেতে পারে। (আহমাদ, বুখারী উম্মে সালামার রেওয়ায়াতের মাধ্যমে) রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, পুরুষদের সর্বোত্তম লাইন হচ্ছে তাদের সর্বপ্রথম লাইনটি এবং নিকৃষ্ঠতম লাইনটি হচ্ছে সবচেয়ে পেছনের (অর্থাৎ মেয়েদের নিকটবর্তী) লাইন এবং মেয়েদের সর্বোত্তম লাইন হচ্ছে সবচেয়ে পেছনের লাইন এবং তাদের নিকৃষ্টতম লাইন হচ্ছে সবার আগের (অর্থাৎ পুরুষদের নিকটবর্তী) লাইন। (মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও আহমাদ)

দুই ঈদের নামাযে মেয়েলোকেরা শরীক হতো কিন্তু তাদের জায়গা ছিল পুরুষদের থেকে দূরে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুতবার পরে মেয়েলোকদের দিকে

www.pathagar.com

গিয়ে তাদেরকে পৃথকভাবে সম্বোধন করতেন। (আবু দাউদ, জাবের ইবনে অব্দুল্লাহর বর্ণনার মাধ্যমে বুখারী ও মুসলিম ইবনে আব্বাসের বর্ণনার মাধ্যমে) একবার মসজিদে নববীর বাইরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম দেখলেন, পথে নারী-পুরুষ এক সাথে মিশে গেছে। এ অবস্থা দেখে তিনি নারীদেরেক বললেনঃ

"থেমে যাও, তোমাদের পথের মাঝখান দিয়ে চলা ঠিক নয়, কিনারা দিয়ে চলো"। এ কথা শুনতেই মহিলারা এক পাশে হয়ে গিয়ে একবারে দেয়ালের পাশ দিয়ে চলতে লাগলো। (আবু দাউদ)

এসব নির্দেশ থেকে পরিষ্কার জানা যায়, নারী-পুরুষদের মিশ্র সমাবেশাদি ইসলামের প্রকৃতির সাথে কত বেশী বেখাপ্পা! যে দ্বীন আল্লাহর ঘরে ইবাদাত করার সময়ও উভয় গোষ্ঠীকে পরস্পর মিশ্রিত হতে দেয় না তার সম্পর্কে কে ধারণা করতে পারে যে, সে স্কুল-কলেজ, অফিস-আদালত, ক্লাব-রেস্তোরাঁ ও সভা-সমিতিতে তাদের মিশ্র হওয়াকে বৈধ করে দেবে?

পাঁচঃ নারীদেরকে ভারসাম্য সহকারে সাজসজ্জা করার তিনি কেবল অনুমতিই দেননি বরং অনেক সময় নিজেই এর নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু এ ব্যাপারে সীমা অতিক্রম করা থেকে কঠোরভাবে বাধা দিয়েছেন। সেকালে আরবের মহিলা সমাজে যে ধরনের সাজসজ্জার প্রচলন ছিল তার মধ্য থেকে নিম্নোক্তজিনিসগুলোকে তিনি অভিসম্পাতযোগ্য এবং মানব জাতির ধ্বংসের কারণ হিসেব গণ্য করেছেনঃ

নিজের চুলের সাথে পরচুলা লাগিয়ে তাকে বেশী লম্বা ও ঘন দেখাবার চেষ্টা করা।

শরীরের বিভিন্ন জায়গায় উলকি আঁকা ও কৃত্রিম তিল বসানো।

ভ্রূর চুল উপড়ে ফেলে বিশেষ আকৃতির ভ্রু নির্মাণ করা এবং লোম ছিঁড়ে মুখ পরিষ্কার করা।

দাঁত ঘসে ঘসে সুঁচালো ও পাতলা করা অথবা দাঁতের মাঝখানে কৃত্রিম ছিদ্র তৈরী করা।

জাফরান ইত্যাদি প্রসাধনীর মাধ্যমে চেহারায় কৃত্রিম রং তৈরী করা।

এসব বিধান সিহাহ সিত্তাহ ও মুসনাদে আহমাদে হযরত আয়েশা (রা), হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রা), হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা),হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) ও আমীর মুআবীয়া (রা) থেকে নির্ভরযোগ্য বর্ণনা পরম্পরায় উদ্ধৃত হয়েছে।

আল্লাহ ও রাসূলের এসব পরিষ্কার নির্দেশ দেখার পর একজন মু'মিনের জন্য দু'টোই পথ খোলা থাকে। **একঃ** সে এর অনুসরণ করবে এবং নিজের ও নিজের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনকে এমনসব নৈতিক অনাচার থেকে পবিত্র করবে, যেগুলোর পথ রোধ করার জন্য আল্লাহ কুরআনে এবং তাঁর রাসূল সুন্নাতে এমন বিস্তারিত বিধান দিয়েছেন।

www.pathagar.com

দুই: যদি সে নিজের মানসিক দুর্বলতার কারণে এগুলোর মধ্য থেকে কোনটির বিরুদ্ধাচরণ করে, তাহলে কমপক্ষে গোনাহ মনে করে করবে তাকে গোনাহ বলে স্বীকার করে নেবে এবং অনর্থক অপব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়ে গোনাহকে সওয়াবে পরিণত করার চেষ্টা করবে না। এ দু'টি পথ পরিহার করে যারা কুরআন ও সুন্নাতের সুস্পষ্ট বিধানের বিরুদ্ধাচরণ করে কেবল পাশ্চাত্য সমাজের পদ্ধতি অবলম্বন করেই ক্ষান্ত থাকে না বরং এরপর সেগুলোকেই যথার্থ ইসলাম প্রমাণ করার জন্য প্রচেষ্টা শুরু করে দেয় এবং ইসলামে আদৌ পর্দার কোন বিধান নেই বলে প্রকাশ্যে দাবী করতে থাকে তারা গোনাহ ও নাফরমানীর সাথে সাথে মূর্খতা ও মুনাফিক সুলভ ধৃষ্টতা দেখিয়ে থাকে।

দুনিয়ায় কোন ভদ্র ও মার্জিত রুচি সম্পন্ন ব্যক্তি এর প্রশংসা করতে পারে না এবং আখেরাতে আল্লাহর কাছ থেকেও এর আশা করা যেতে পারে না। কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে মুনাফিকদের চাইতেও দু'কদম এগিয়ে আছে এমন সব লোক যারা আল্লাহ ও রাসূলের এসব বিধানকে ভুল প্রতিপন্ন করে এবং এমন সব পদ্ধতিকে সঠিক ও সত্য মনে করে যা তারা অমুসলিম জাতিসমূহের কাছ থেকে শিখেছে। এরা আসলে মুসলমান নয়। কারণ এরপরও যদি তারা মুসলামন থাকে তাহলে ইসলাম ও কুফর শব্দ দু'টি একেবারেই অর্থহীন হয়ে যায়। যদি তারা নিজেদের নাম বদলে নিতো এবং প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে ইসলাম থেকে বের হয়ে যেতো, তাহলে আমরা কমপক্ষে তাদের নৈতিক সাহসের স্বীকৃতি দিতাম। কিন্তু তাদের অবস্থা হচ্ছে, এ ধরনের চিন্তা পোষণ করেও তারা মুসলমান সেজে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এদের চেয়ে নিকৃষ্ট ধরনের মানুষ সম্ভবত দুনিয়ায় আর কোথাও পাওয়া যায় না। এ ধরনের চরিত্র ও নৈতিকতার অধিকারী লোকদের থেকে যে কোন প্রকার জালিয়াতী, প্রতারণা, দাগাবাজী, আত্মসাত ও বিশ্বাসঘাতকতা মোটেই অপ্রত্যাশিত নয়।

২৪. এ বাক্যাংশটির অন্য একটি অনুবাদ এভাবে করা যেতে পারে আল্লাহর সাথে অন্য কোন ইলাহ তৈরী করে নিয়ো না অথবা অন্য কাউকে ইলাহ গণ্য করো না।

www.pathagar.com

২১ রামাদান
বিষয়ঃ যাদের সাথে বিবাহ হারাম
সূরা নিসাঃ ১৯-২৩

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاء كَرْهًا وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (19) وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا (20) وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا (21) وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاء سَبِيلاً (22) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا (23)

১৯) হে ঈমানদারগণ ! তোমাদের জন্য জোরপূর্বক নারীদের উত্তরাধিকারী হয়ে বসা মোটেই হালাল নয়। [২৮] আর তোমরা যে মোহরানা তাদেরকে দিয়েছো তার কিছু অংশ তাদেরকে কষ্ট দিয়ে আত্মসাৎ করাও তোমাদের জন্য হালাল নয়। তবে তারা যদি কোন সুস্পষ্ট চরিত্রহীনতার কাজে লিপ্ত হয় (তাহলে অবশ্যই তোমরা তাদেরকে কষ্ট দেবার অধিকারী হবে) [২৯] তাদের সাথে সদ্ভাবে জীবন যাপন করো। যদি তারা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয় হয়, তাহলে হতে পারে একটা জিনিস তোমরা পছন্দ করো না কিন্তু আল্লাহ তার মধ্যে অনেক কল্যাণ রেখেছেন। [৩০] ২০) আর যদি তোমরা এক স্ত্রীর জায়গায় অন্য স্ত্রী আনার সংকল্প করেই থাকো, তাহলে তোমরা তাকে স্তূপীকৃত সম্পদ দিয়ে থাকলেও তা থেকে কিছুই ফিরিয়ে নিয়ো না। তোমরা কি মিথ্যা অপবাদ দিয়ে ও সুস্পষ্ট জুলুম করে তা ফিরিয়ে নেবে? ২১) আর তোমরা তা নেবেই বা কেমন করে যখন তোমরা পরস্পরের স্বাদ গ্রহণ করেছো এবং তারা তোমাদের কাছ থেকে পাকাপোক্ত অঙ্গীকার নিয়েছে। [৩১] ২২) আর তোমাদের পিতা যেসব স্ত্রীলোককে বিয়ে করেছে, তাদেরকে কোনক্রমেই বিয়ে করো না। তবে আগে যা হয়ে গেছে তা হয়ে গেছে। [৩২] আসলে এটা একটা নির্লজ্জতা প্রসূত কাজ, অপছন্দনীয় ও নিকৃষ্ট আচরণ। [৩৩] ২৩) তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে তোমাদের মা,[৩৪] কন্যা,[৩৫] বোন,[৩৬] ফুফু, খালা, ভাতিজি, ভাগিনী [৩৭] ও তোমাদের সেই সমস্ত মাকে যারা তোমাদেরকে দুধ পান করিয়েছে এবং তোমাদের দুধ বোন[৩৮] তোমাদের

www.pathagar.com

স্ত্রীদের মা[৩৯] ও তোমাদের স্ত্রীদের মেয়েদেরকে যারা তোমাদের কোলে মানুষ হয়েছে,[৪০] সেই সমস্ত স্ত্রীদের মেয়েদেরকে যাদের সাথে তোমাদের স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, অন্যথায় যদি (শুধুমাত্র বিয়ে হয় এবং) স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত না হয়, তাহলে (তাদেরকে বাদ দিয়ে তাদের মেয়েদেরকে বিয়ে করলে) তোমাদের কোন জবাবদিহি করতে হবে না, এবং তোমাদের ঔরসজাত পুত্রদের স্ত্রীদেরকেও।[৪১] আর দুই বোনকে একসাথে বিয়ে করাও তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে।[৪২] তবে যা প্রথমে হয়ে গেছে তা হয়ে গেছে। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।[৪৩]

আয়াত সমূহের ব্যাখ্যা

২৮.এর অর্থ হচ্ছে, স্বামীর মৃত্যুর পর তার পরিবারের লোকেরা তার বিধবাকে মীরাসী সম্পত্তি মনে করে তার অভিভাবক ও ওয়ারিস হয়ে না বসে। স্বামী মরে গেলে স্ত্রী ইদ্দত পালন করার পর স্বাধীনভাবে ইচ্ছা যেতে এবং যাকে ইচ্ছা বিয়ে করতে পারে।

২৯. তাদের চরিত্রহীনতার শাস্তি দেবার জন্য এ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে, তাদের সম্পদ লুট করে খাবার জন্য নয়।

৩০. অর্থাৎ স্ত্রী যদি সুন্দরী না হয় অথবা তার মধ্যে এমন কোন ত্রুটি থাকে যে জন্য স্বামী তাকে অপছন্দ করে তাহলে এ ক্ষেত্রে স্বামীর তৎক্ষণাৎ হতাশ হয়ে তাকে পরিত্যাগ করতে উদ্যত হওয়া উচিত নয়। যতদূর সম্ভব তাকে অবশ্যই ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন করতে হবে। অনেক সময় দেখা যায়, স্ত্রী সুন্দরী হয় না ঠিকই কিন্তু তার মধ্যে অন্যান্য এমন কিছু গুণাবলী থাকে, যা দাম্পত্য জীবনে সুন্দর মুখের চাইতে অনেক বেশী গুরুত্ব লাভ করে। যদি সে তার এই গুণাবলী প্রকাশের সুযোগ পায়, তা হলে তার স্বামী রত্নটি যিনি প্রথম দিকে শুধুমাত্র স্ত্রীর অসুন্দর মুখশ্রী দেখে হতাশ হয়ে পড়ছিলেন, এখন দেখা যাবে তার চরিত্র মাধুর্যে তার প্রেমে আত্মহারা হয়ে পড়ছেন। এমনিভাবে অনেক সময় দাম্পত্য জীবনের শুরুতে স্ত্রীর কোন কোন কথা ও আচরণ স্বামীর কাছে বিরক্তিকর ঠেকে এবং এ জন্য স্ত্রীর ব্যাপারে তার মন ভেঙে পড়ে। কিন্তু সে ধৈর্য্য ধারণ করলে এবং স্ত্রীকে তার সম্ভাব্য সকল যোগ্যতার বাস্তবায়নের সুযোগ দিলে সে নিজেই অনুধাবন করতে পারে যে, তার স্ত্রীর মধ্যকার দোষের তুলনায় গুণ অনেক বেশী। কাজেই দাম্পত্য সম্পর্ক ছিন্ন করার ব্যাপার তাড়াহুড়ো করা মোটেই পছন্দনীয় নয়। তালাক হচ্ছে সর্বশেষ উপায়। একান্ত অপরিহার্য ও অনিবার্য অবস্থায়ই এর ব্যবহার হওয়া উচিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: অর্থাৎ তালাক জায়েয হলেও দুনিয়ার সমস্ত জায়েয কাজের মধ্যে এটি আল্লাহর কাছে সবচাইতে অপছন্দনীয়।

অন্য একটি হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: "বিয়ে করো এবং তালাক দিয়ো না। কারণ আল্লাহ এমন সব পুরুষ ও নারীকে পছন্দ করেন না যারা ভ্রমরের মতো ফুলে ফুলে মধু আহরণ করে বেড়ায়"।

৩১. পাকাপোক্ত অংগীকার অর্থ বিয়ে। কারণ এটি আসলে বিশ্বস্ততার একটি মজবুত ও শক্তিশালী অঙ্গীকার ও চুক্তি এবং এরই স্থিতিশীলতা ও মজবুতীর ওপর ভরসা করেই একটি

www.pathagar.com

মেয়ে নিজেকে একটি পুরুষের হাতে সোপর্দ করে দেয়। এখন পুরুষটি যদি নিজের ইচ্ছায় এ অঙ্গীকার ও চুক্তি ভঙ্গ করে তাহলে চুক্তি করার সময় সে যে বিনিময় পেশ করেছিল তা ফিরিয়ে নেবার অধিকার তার থাকে না। (সূরা বাকারার ২৫১ টীকাটিও দেখুন।)

৩২. সামাজিক ও তামাদ্দুনিক সমস্যাবলীর ক্ষেত্রে জাহেলিয়াতের ভ্রান্ত পদ্ধতিগুলোকে হারাম গণ্য করে সাধারণভাবে কুরআন মজীদে অবশ্যই একথা বলা হয়ে থাকে: "যা হয়ে গেছে তা হয়ে গেছে"। এর দু'টি অর্থ হয়। **এক:** অজ্ঞতা ও অজ্ঞানতার যুগে তোমরা যে সমস্ত ভুল করেছো, সেগুলো পাকড়াও করা হবে না। তবে এ ক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে এই যে, এখন যথার্থ নির্দেশ এসে যাবার পর তোমরা নিজেদের কার্যকলাপ সংশোধন করে নাও এবং ভুল ও অন্যায় কাজগুলো পরিহার করো, সেগুলোর পুনরাবৃত্তি করো না। **দুই:** আগের যুগের কোন পদ্ধতিকে যদি এখন হারাম গণ্য করা হয়ে থাকে, তাহলে তা থেকে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সঠিক হবে না যে, আগের আইন বা রীতি অনুযায়ী যে কাজ ইতিপূর্বে করা হয়েছে তাকে নাকচ করে দিয়ে তা থেকে উদ্ভূত ফলাফলকে অবৈধ ও তার ফলে যে দায়িত্ব মাথায় চেপে বসেছে তাকে অনিবার্যভাবে রহিত করা হচ্ছে। যেমন এখন বিমাতাকে বিয়ে করা হারাম গণ্য করা হয়েছে। এর অর্থ এ নয় যে, এ পর্যন্ত যত লোক এ ধরনের বিয়ে করেছে, তাদের গর্ভজাত সন্তানদেরকে জারজ গণ্য করা হচ্ছে এবং নিজেদের পিতার সম্পদ সম্পত্তিতে তাদের উত্তরাধিকার রহিত করা হচ্ছে। অনুরূপভাবে যদি লেনদেনের কোন পদ্ধতিকে হারাম গণ্য করা হয়ে থাকে,তাহলে তার অর্থ এ নয় যে, এ পদ্ধিতে এর আগে যতগুলো লেনদেন হয়েছে, সব বাতিল গণ্য হয়েছে এবং এখন এভাবে কোন ব্যক্তি যে ধন-সম্পদ উপার্জন করেছে তা তার থেকে ফেরত নেয়া হবে অথবা ঐ সম্পদকে হারাম গণ্য করা হবে।

৩৩. ইসলামী আইন মোতাবিক এ কাজটি একটি ফৌজদারী অপরাধ এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষ এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করার ক্ষমতা রাখেন। আবু দাউদ, নাসাঈ ও মুসনাদে আহমাদে এ হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই অপরাধকারীদেরকে মৃত্যুদন্ড ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার শাস্তি দিয়েছেন। আর ইবনে মাজাহ ইবনে আব্বাস থেকে যে রেওয়ায়াত উদ্ধৃত করেছেন তা, থেকে জানা যায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ব্যাপারে এই সাধারণ নির্দেশটি বর্ণনা করেছিলেন:

"যে ব্যক্তি মুহরিম আত্মীয়ার মধ্য থেকে কারো সাথে যিনা করে তাকে হত্যা করো"।

ফিকাহবিদদের মধ্যে এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম আহমাদের মতে এহেন ব্যক্তিকে হত্যা করা হবে এবং তার ধন-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে। ইমাম আবু হানীফা, ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেঈর মতে যদি সে কোন মুহরিম আত্মীয়ার সাথে যিনা করে থাকে, তাহলে তাকে যিনার শাস্তি দেয়া হবে আর যদি বিয়ে করে থাকে তাহলে তাকে কঠিন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়া হবে।

৩৪. মা বলতে আপন মা ও বিমাতা উভয়ই বুঝায়। তাই উভয়ই হারাম এ ছাড়া বাপের মা ও মায়ের মা-ও এ হারামের অন্তর্ভূক্ত।

www.pathagar.com

যে মহিলার সাথে বাপের অবৈধ সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে সে পুত্রের জন্য হারাম কিনা এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। প্রথম যুগের কোন কোন ফকীহ একে হারাম বলেন না। আর কেউ কেউ হারাম বলেছেন। বরং তাদের মতে, বাপ যৌন কামনা সহ যে মহিলার গা স্পর্শ করেছে সে ও পুত্রের জন্য হারাম। অনুরূপভাবে যে মহিলার সাথে পুত্রের অবৈধ সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে, সে বাপের জন্য হারাম কিনা এবং যে পুরুষের সাথে আবার মেয়ের অবৈধ সম্পর্ক ছিল অথবা পরে হয়ে যায়, তার সাথে বিয়ে করা মা ও মেয়ে উভয়ের জন্য হারাম কিনা, এ ব্যাপারেও প্রথম যুগের ফকীহদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। এ প্রসংগে ফকীহদের আলোচনা অত্যন্ত দীর্ঘ। তবে সামান্য চিন্তা করলে একথা সহজেই অনুধাবন করা যায় যে, কোন ব্যক্তি যদি এমন কোন স্ত্রীলোকের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ থাকে, যার ওপর তার পিতার বা পুত্রেরও নজর থাকে অথবা যার মা বা মেয়ের ওপরও তার নজর থাকে, তাহলে এটাকে কখনো সুস্থ ও সৎ সামাজিকতার উপযোগী বলা যেতে পারে না। যে সমস্ত আইনগত চুলচেরা বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিবাহ ও অবিবাহ, বিবাহ পূর্ব ও বিবাহ পরবর্তী এবং সংস্পর্শ ও দৃষ্টিপাত ইত্যাদির মধ্যে পার্থক্য করা হয়, কিন্তু আল্লাহর শরীয়তের স্বাভাবিক প্রকৃতি তা মেনে নিতে মোটেই প্রস্তুত নয়। সোজা কথায় পারিবারিক জীবনে একই স্ত্রীলোকের সাথে বাপ ও ছেলে অথবা একই পুরুষের সাথে মা ও মেয়ের যৌন সম্পর্ক কঠিন বিপর্যয় সৃষ্টির কারণ এবং শরীয়ত একে কোনক্রমেই বরদাশত করতে পারে না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

"যে ব্যক্তি কোন মেয়ের যৌনাঙ্গের প্রতি দৃষ্টিপাত করে তার মা ও মেয়ে উভয়ই তার জন্যে হারাম হয়ে যায়"।

তিনি আরো বলেন: "আল্লাহ সেই ব্যক্তির চেহারা দেখাই পছন্দ করেন না, যে একই সময় মা ও মেয়ে উভয়ের যৌনাঙ্গে দৃষ্টিপাত করে"।

এ হাদীসগুলো থেকে শরীয়তের উদ্দেশ্য দিবালোকের মতো সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

৩৫. নাতনী ও দৌহিত্রীও কন্যার অন্তর্ভূক্ত। তবে অবৈধ সম্পর্কের ফলে যে মেয়ের জন্ম হয় সেও হারাম কিনা, এ ব্যাপারে অবশ্যই মতবিরোধ আছে। ইমাম আবু হানীফা (র), ইমাম মালেক (রা) ও ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বলের (র) মতে সেও বৈধ কন্যার মতোই মুহরিম। অন্যদিকে ইমাম শাফেঈর (র) মতে সে মুহরিম নয় অর্থাৎ তাকে বিয়ে করা যায়; কিন্তু আসলে যে মেয়েটিকে সে নিজে তার নিজেরই ঔরসজাত বলে জানে, তাকে বিয়ে করা তার জন্য বৈধ, এ চিন্তাটিও সুস্থ ও ভারসাম্যপূর্ণ বিবেককে ভারাক্রান্ত করে।

৩৬. সহোদর বোন, মা-শরীক বোন ও বাপ-শরীক বোন-তিনজনই সমানভাবে এ নির্দেশের আওতাধীন।

৩৭. এ সম্পর্কগুলোর ক্ষেত্রেও সহোদর ও বৈমাত্রেয় বৈপিত্রেয়ের-ব্যাপারে কোন পার্থক্য নেই। বাপ ও মায়ের বোন সহোদর, মা-শরীক বা বাপ-শরীক যে পর্যায়েরই হোক না কেন তারা অবশ্যই পুত্রের জন্য হারাম। অনুরূপভাবে ভাই ও বোন সহোদর, মা-শরীক বা বাপ-শরীক যে কোন পর্যায়েরই হোক না কেন তাদের কন্যারা নিজের কন্যার মতই হারাম।

www.pathagar.com

৩৮. সমগ্র উম্মাতে মুসলিমা ও ব্যাপারে একমত যে, একটি ছেলে বা মেয়ে যে স্ত্রীলোকদের দুধ পান করে তার জন্য ঐ স্ত্রীলোকটি মায়ের পর্যায়ভুক্ত ও তার স্বামী বাপের পর্যায়ভুক্ত হয়ে যায় এবং আসল মা ও বাপের সম্পর্কের কারণে যে সমস্ত আত্মীয়তা হারাম হয়ে যায় দুধ-মা ও দুধ-বাপের সম্পর্কের কারণেও সেসব আত্মীয়তাও তার জন্য হারাম হয়ে যায়। এ বিধানটির উৎসমূলে রয়েছে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ নির্দেশটি: "বংশ ও রক্ত সম্পর্কের দিক দিয়ে যা হারাম দুধ সম্পর্কের দিক দিয়েও তা হারাম"।

তবে কি পরিমাণ দুধ পানে দুধ সম্পর্কের দিক দিয়ে বিয়ে করা হারাম হয়ে যায় সে ব্যাপারে মতবিরোধ আছে। ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মালেকের মতে যে পরিমাণ দুধ পান করলে একজন রোযাদারের রোযা ভেঙে যেতে পারে কোন স্ত্রীলোকের সেই পরিমাণ দুধ যদি শিশু পান করে,তাহলে হারামের বিধান প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। কিন্তু ইমাম আহমাদের মতে তিনবার পান করলে এবং ইমাম শাফেঈর মতে পাঁচবার পান করলে এ হারামের বিধান প্রতিষ্ঠিত হয়। এ ছাড়াও কোন্ বয়সে দুধ পান করলে বিবাহ সম্পর্ক হারাম হয়ে যায় সে ব্যাপারেও মতানৈক্য রয়েছে। এ ব্যাপারে ফকীহগণ নিম্নোক্তমত পোষণ করেন:

এক: শিশুর মাতৃদুগ্ধ পানের যে স্বাভাবিক বয়সকাল, যখন তার দুধ ছাড়ানো হয় না এবং দুধকেই তার খাদ্য হিসেবে খাওয়ানো হয়, এসই সময়ের মধ্যে কোন মহিলার দুধ পান করলে বিবাহ সম্পর্ক হারাম হয়ে যায়। নয়তো দুধ ছাড়ানোর পর কোন শিশু কোন মহিলার দুধ পান করলে, তা পানি পান করারই পর্যায়ভুক্ত হয়। উম্মে সালমা (রা) ও ইবনে আব্বাস (রা) এ মত পোষণ করেছেন। হযরত আলী (রা) থেকেও এই অর্থে একটি বর্ণনা পাওয়া যায়। যুহরী, হাসান বসরী কাতাদাহ, ইকরামাহ ও আওযাঈও এ মত পোষণ করেন।

দুই: শিশুর দুই বছর বয়সকালের মধ্যে যে দুধ পান করানো হয় কেবল মাত্র তা থেকেই দুধ সম্পর্ক প্রমাণিত হয়। এটি হযরত উমর (রা), ইবনে মাসউদ (রা), আবু হুরায়রা (রা) ও ইবনে উমরের (রা) মত। ফকীহগণের মধ্যে ইমাম শাফেঈ, ইমাম আহমাদ, ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মাদ ও সুফিয়ান সাওরী এই মত গ্রহণ করেছেন। ইমাম আবু হানীফারও একটি অভিমত এরই স্বপক্ষে ব্যক্ত হয়েছে। ইমাম মালিকও এই মতের সমর্থন করেন। কিন্তু তিনি বলেন: দু'বছর থেকে যদি এক মাস দু'মাস বেশী হয়ে যায় তাহলে তার ওপরও ঐ দুধ পানের সময় কালের বিধান কার্যকর হবে।

তিন: ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম যুফারের বিখ্যাত অভিমত হচ্ছে, দুধপানের মেয়াদ আড়াই বছর এবং এই সময়ের মধ্যে কোন স্ত্রীলোকের দুধ পান করলে দুধ-সম্পর্ক প্রমাণিত হবে।

চার: যে কোন বয়সে দুধ পান করলে দুধ সম্পর্ক স্থাপিত হবে। অর্থাৎ এ ব্যাপারে বয়স নয়, দুধই আসল বিষয়। পানকারী বৃদ্ধ হলেও দুধ পানকারী শিশুর জন্য যে বিধান তার জন্যও সেই একই বিধান জারী হবে। হযরত আয়েশা (রা) এ মত পোষণ করেন। হযরত আলী (রা) থেকেই এরই সমর্থনে অপেক্ষাকৃত নির্ভুল অভিমত বর্ণিত হয়েছে। ফকীহদের

www.pathagar.com

মধ্যে উরওয়াহ ইবনে যুবাইর, আতা ইবনে রিবাহ, লাইস ইবনে সা'দ ও ইবনে হাযম এই মত অবলম্বন করেছেন।

৩৯. যে মহিলার সাথে শুধুমাত্র বিয়ে হয়েছে তার মা হারাম কি না এ ব্যাপারে মতবিরোধ আছে। ইমাম আবু হানীফা, ইমাম মালেক, ইমাম শাফেঈ ও ইমাম আহমাদ (রাঃ) তার হারাম হওয়ার অভিমত ব্যক্ত করেছেন। অন্যদিকে হযরত আলীর (রা) মতে কোন মহিলার সাথে একান্তে অবস্থান না করা পর্যন্ত তার মা হারাম হবে না।

৪০. সৎ বাপের ঘরে লালিত হওয়াই এই ধরনের মেয়ের হারাম হওয়ার জন্য শর্ত নয়। মহান আল্লাহ নিছক এই সম্পর্কটির নাজুকতা বর্ণনা করার জন্য এ শব্দাবলী ব্যবহার করেছেন। এ ব্যাপারে মুসলিম ফকীহগণের প্রায় 'ইজমা' অনুষ্ঠিত হয়েছে যে, সৎ মেয়ে সৎ বাপের ঘরে লালিত হোক বা না হোক সর্বাবস্থায়ই সে সৎ বাপের জন্য হারাম।

৪১. এই শর্তটি কেবলমাত্র এ জন্য বৃদ্ধি করা হয়েছে যে, কোন ব্যক্তি যাকে পালক পুত্র হিসেবে গ্রহণ করেছে, তার বিধবা বা তালাক প্রাপ্তা স্ত্রী ঐ ব্যক্তির জন্য হারাম নয়। কেবল মাত্র নিজের ঔরসজাত পুত্রের স্ত্রীই বাপের জন্য হারাম। এভাবে পুত্রের ন্যায় প্রপুত্র ও দৌহিত্রের স্ত্রীও দাদা ও নানার জন্য হারাম।

৪২. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ, খালা ও ভাগিনী এবং ফুফু ও ভাইঝিকেও এক সাথে বিয়ে করা হারাম। এ ব্যাপারে একটা মূলনীতি মনে রাখা দরকার। সেটি হচ্ছে, এমন ধরনের দু'টি মেয়েকে একত্রে বিয়ে করার হারাম যাদের একজন যদি পুরুষ হতো তাহলে অন্য জনের সাথে তার বিয়ে হারাম হতো।

৪৩. অর্থাৎ জাহেলী যুগে তোমরা জুলুম করতে। দুই বোনকে এক সাথে বিয়ে করতে। সে ব্যাপারে আর জবাবদিহি করতে হবে না। তবে শর্ত হচ্ছে, এখন তা থেকে বিরত থাকতে হবে। (টীকা ৩২ দেখুন) এরই ভিত্তিতে এ নির্দেশ দেয়া হয় যে, যে ব্যক্তি কুফরীর যুগে দুই সহোদর বোনকে বিয়ে করেছিল তাকে এখন ইসলাম গ্রহণ করার পর একজনকে রাখতে ও অন্যজনকে ছেড়ে দিতে হবে। মুসলিম

www.pathagar.com

২২ রামাদান
বিষয়: সামাজিক দায়বদ্ধতা
সূরা আল মাউন : ০১-০৭

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ (1) فَذَٰلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ (2) وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ (3) فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ (4) الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (5) الَّذِينَ هُمْ يُرَاؤُونَ (6) وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ (7)

১) তুমি কি তাকে দেখেছো।[১] যে আখেরাতের পুরষ্কার ও শাস্তিকে [২] মিথ্যা বলছে ?[৩] ২) সে-ই তো [৪] এতিমকে ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেয় [৫] ৩) এবং মিসকিনকে খাবার দিতে [৬] উদ্বুদ্ধ করে না। [৭] ৪) তারপর সেই নামাযীদের জন্য ধ্বংস,[৮] ৫) যারা নিজেদের নামাযের ব্যাপারে গাফলতি করে [৯] ৬) যারা লোক দেখানো কাজ করে [১০] ৭) এবং মামুলি প্রয়োজনের জিনিস সমূহ [১১] (লোকদেরকে) দেয়া থেকে বিরত থাকে।

আয়াত সমূহের ব্যাখ্যা

১. 'তুমি কি দেখেছো' বাক্যে এখানে বাহ্যত সম্বোধন করা হয়েছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে। কিন্তু কুরআনের বর্ণনাভঙ্গি অনুযায়ী দেখা যায়, এসব ক্ষেত্রে সাধারণত প্রত্যেক জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিচার-বিবেচনা সম্পন্ন লোকদেরকেই এ সম্বোধন করা হয়ে থাকে। আর দেখা মানে চোখ দিয়ে দেখাও হয়। কারণ সামনের দিকে লোকদের যে অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে তা প্রত্যেক প্রত্যক্ষকারী স্বচক্ষে দেখে নিতে পারে। আবার এর মানে জানা, বুঝা ও চিন্তা ভাবনা করাও হতে পারে। আরবী ছাড়া অন্যান্য ভাষায়ও এ শব্দটি এ অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন আমরা বলি, "আচ্ছা, ব্যাপারটা আমাকে দেখতে হবে"। অর্থাৎ আমাকে জানতে হবে। অথবা আমরা বলি, "এ দিকটাও তো একবার দেখো"। এর অর্থ হয়, "এ দিকটা সম্পর্কে একটু চিন্তা করো"। কাজেই "أرأيت " শব্দটিকে দ্বিতীয় অর্থে ব্যবহার করলে আয়াতের অর্থ হবে, "তুমি কি জানো সে কেমন লোক যে শাস্তি ও পুরষ্কারকে মিথ্যা বলে? "অথবা" তুমি কি ভেবে দেখেছো সেই ব্যক্তির অবস্থা যে কর্মফলকে মিথ্যা বলে?

৫. মূলে বলা হয়েছে এর কয়েকটি অর্থ হয়। **এক:** সে এতিমের হক মেরে খায় এবং তার বাপের পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে বেদখল করে তাকে সেখান থেকে ধাক্কা দিয়ে বের করে দেয়। **দুই:** এতিম যদি তার কাছে সাহায্য চাইতে আসে তাহলে দয়া করার পরিবর্তে সে তাকে ধিক্কার দেয়। তারপরও যদি সে নিজের অসহায় ও কষ্টকর অবস্থার জন্য অনুগ্রহ লাভের আশায় দাঁড়িয়ে থাকে তাহলে তাকে ধাক্কা দিয়ে বের করে দেয়।

www.pathagar.com

তিনঃ সে এতিমের ওপর জুলুম করে। যেমন তার ঘরেই যদি তার কোন আত্মীয় থাকে। কথায় কথায় গালমন্দ ও লাথি ঝাঁটা খাওয়া ছাড়া তার ভাগ্যে আর কিছুই জোটে না। তাছাড়া এ বাক্যের মধ্যে এ অর্থও নিহিত রয়েছে যে, সেই ব্যক্তি মাঝে মাঝে কখনো কখনো এ ধরনের জুলুম করে না বরং এটা তার অভ্যাস ও চিরাচরিত রীতি সে যে এটা একটা খারাপ কাজ করছে, এ অনুভূতিও তার থাকে না। বরং বড়ই নিশ্চিন্তে সে এ নীতি অবলম্বন করে যেতে থাকে। সে মনে করে, এতিম একটা অক্ষম ও অসহায় জীব। কাজেই তার হক মেরে নিলে, তার ওপর জুলুম-নির্যাতন চালালে অথবা সে সাহায্য চাইতে এলে তাকে ধাক্কা মেরে বের করে দিলে কোন ক্ষতি নেই।

এ প্রসংগে কাজী আবুল হাসান আল মাওয়ারদী তাঁর "আ'লামুন নুবুওয়াহ" কিতাবে একটি অদ্ভুত ঘটনা বর্ণনা করেছেন। ঘটনাটি হচ্ছেঃ আবু জেহেল ছিল একটি এতিম ছেলের অভিভাবক। ছেলেটি একদিন তার কাছে এলো। তার গায়ে একটুকরা কাপড়ও ছিল না। সে কাকুতি মিনতি করে তার বাপের পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে তাকে কিছু দিতে বললো। কিন্তু জালেম আবু জেহেল তার কথায় কানই দিল না। সে অনেক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর শেষে নিরাশ হয়ে ফিরে গেলো। কুরাইশ সরদাররা দুষ্টুমি করে বললো, "যা মুহাম্মাদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কাছে চলে যা। সেখানে গিয়ে তার কাছে নালিশ কর। সে আবু জেহেলের কাছে সুপারিশ করে তোর সম্পদ তোকে দেবার ব্যবস্থা করবে"। ছেলেটি জানতো না আবু জেহেলের সাথে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কি সম্পর্ক এবং এ শয়তানরা তাকে কেন এ পরামর্শ দিচ্ছে। সে সোজা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে পৌঁছে গেলো এবং নিজের অবস্থা তাঁর কাছে বর্ণনা করলো। তার ঘটনা শুনে নবী (সা) তখনই দাঁড়িয়ে গেলেন এবং তাকে সঙ্গে নিয়ে নিজের নিকৃষ্টতম শত্রু আবু জেহেলের কাছে চলে গেলেন। তাঁকে দেখে আবু জেহেল তাঁকে অভ্যর্থনা জানালো। তারপর যখন তিনি বললেন, এ ছেলেটির হক একে ফিরিয়ে দাও তখন সে সংগে সংগেই তাঁর কথা মেনে নিল এবং তার ধন-সম্পদ এনে তার সামনে রেখে দিল। ঘটনার পরিণতি কি হয় এবং পানি কোন দিকে গড়ায় তা দেখার জন্য কুরাইশ সরদাররা ওঁৎ পেতে বসেছিল। তারা আশা করছিল দু' জনের মধ্যে বেশ একটা মজার কলহ জমে উঠবে। কিন্তু এ অবস্থা দেখে তারা অবাক হয়ে গেলো। তারা আবু জেহেলের কাছে এসে তাকে ধিক্কার দিতে লাগলো। তাকে বলতে লাগলো, তুমিও নিজের ধর্ম ত্যাগ করেছ। আবু জেহেল জবাব দিল, আল্লাহর কসম! আমি নিজের ধর্ম ত্যাগ করিনি। কিন্তু আমি অনুভব করলাম, মুহাম্মাদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ডাইনে ও বাঁয়ে এক একটি অস্ত্র রয়েছে। আমি তার ইচ্ছার সামান্যতম বিরুদ্ধাচরণ করলে সেগুলো সোজা আমার শরীরের মধ্যে ঢুকে যাবে। এ ঘটনাটি থেকে শুধু এতটুকুই জানা যায় না যে, সে যুগে আরবের সবচেয়ে বেশী উন্নত ও মর্যাদা সম্পন্ন গোত্রের বড় বড় সরদাররা পর্যন্ত এতিম ও সহায়-সম্বলহীন লোকদের সাথে কেমন ব্যবহার করতো বরং এই সঙ্গে একথাও জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উন্নত নৈতিক প্রভাব কতটুকু কার্যকর হয়েছিল। ইতিপূর্বে তাফহীমুল

www.pathagar.com

কুরআনের সূরা আল আম্বিয়া ৫ টীকায় আমি এ ধরনের একটি ঘটনা বর্ণনা করেছি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যে জবরদস্ত নৈতিক প্রভাব প্রতিপত্তির কারণে কুরাইশরা তাঁকে যাদুকর বলতো এ ঘটনাটি তারই মূর্ত প্রকাশ।

৭. শব্দের মানে হচ্ছে, সে নিজেকে উদ্বুদ্ধ করে না, নিজের পরিবারের লোকদেরকেও মিসকিনকে খাবার দিতে উদ্বুদ্ধ করে না এবং অন্যদেরকেও এ ব্যাপারে উৎসাহিত করে না যে, সমাজে যেসব গরীব ও অভাবী লোক অনাহারে মারা যাচ্ছে তাদের হক আদায় করো এবং তাদের ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য কিছু করো। এখানে মহান আল্লাহ শুধুমাত্র দু'টি সুস্পষ্ট উদাহরণ দিয়ে আসলে আখেরাত অস্বীকার প্রবণতা মানুষের মধ্যে কোন ধরনের নৈতিক অসৎবৃত্তির জন্ম দেয় তা বর্ণনা করেছেন। আখেরাত না মানলে এতিমকে ধাক্কা দিয়ে বের করে দেয়া এবং মিসকিনকে খাবার দিতে উদ্বুদ্ধ না করার মতো দু'টি দোষ মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হয়ে যায় বলে শুধুমাত্র এ দু'টি ব্যাপারে মানুষকে পাকড়াও করা ও সমালোচনা করাই এর আসল উদ্দেশ্য নয়। বরং এই গোমরাহীর ফলে যে অসংখ্য দোষ ও ত্রুটির জন্ম হয় তার মধ্য থেকে নমুনা স্বরূপ এমন দু'টি দোষের কথা উল্লেখ করা হয়েছে প্রত্যেক সুস্থ বিবেক ও সৎবিচার-বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি যেগুলোকে নিকৃষ্টতম দোষ বলে মেনে নেবে। এই সংগে একথাও হৃদয়পটে অংকিত করে দেয়াই উদ্দেশ্য যে, এ ব্যক্তিটিই যদি আল্লাহর সামনে নিজের উপস্থিতি ও নিজের কৃতকর্মের জবাবদিহির স্বীকৃতি দিতো, তাহলে এতিমের হক মেরে নেবার, তার ওপর জুলুম-নির্যাতন করার, তাকে ধিক্কার দেবার এবং মিসকিনকে নিজে খাবার না দেবার ও অন্যকে দিতে উদ্বুদ্ধ না করার মতো নিকৃষ্টতম কাজ সে করতো না। আখেরাত বিশ্বাসীদের গুণাবলী সূরা আসর ও সূরা বালাদে বয়ান করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছেঃ আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি করুণা করার জন্য তারা পরস্পরকে উপদেশ দেয় এবং তারা পরস্পরকে সত্যপ্রীতি ও অধিকার আদায়ের উপদেশ দেয়।

৮. এখানে "ফা" ব্যবহার করার তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, প্রকাশ্যে যারা আখেরাত অস্বীকার করে তাদের অবস্থা তুমি এখনই শুনলে, এখন যারা নামায পড়ে অর্থাৎ মুসলমানদের সাথে শামিল মুনাফিকদের অবস্থাটা একবার দেখো। তারা যেহেতু বাহ্যত মুসলামান হওয়া সত্ত্বেও আখেরাতকে মিথ্যা মনে করে, তাই দেখো তারা নিজেদের জন্য কেমন ধ্বংসের সরঞ্জাম তৈরি করছে।

"مصلين" মানে নামায আদায়কারীগণ। কিন্তু যে আলোচনা প্রসংগে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে এবং সামনের দিকে তাদের যে গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে সেগুলোর প্রেক্ষিতে এ শব্দটির মানে আসলে নামাযী নয় বরং নামায আদায়কারী দল অর্থাৎ মুসলমানদের দলের অন্তর্ভুক্ত হওয়া।

৯. "عن صلاتهم ساهون" বলা হয়নি বরং বলা হয়েছে "في صلاتهم ساهون" যদি বলা হতো "ফী সালাতিহিম" তাহলে এর মানে হতো, নিজেরা নামাযে ভুলে যায়। কিন্তু

www.pathagar.com

নামায পড়তে পড়তে ভুলে যাওয়া ইসলামী শরীয়তে নিফাক তো দূরের কথা গোনাহের পর্যায়েও পড়ে না। বরং এটা আদতে কোন দোষ বা পাকড়াও যোগ্য কোন অপরাধও নয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিজের নামাযের মধ্যে কখনো ভুল হয়েছে। তিনি এই ভুল সংশোধনের জন্য পদ্ধতি নির্ধারণ করেছেন। এর বিপরীত মানে হচ্ছে তারা নিজেদের নামায থেকে গাফেল। নামায পড়া ও না পড়া উভয়টিরই তাদের দৃষ্টিতে কোন গুরুত্ব নেই। কখনো তারা নামায পড়ে আবার কখনো পড়ে না। যখন পড়ে, নামাযের আসল সময় থেকে পিছিয়ে যায় এবং সময় যখন একেবারে শেষ হয়ে আসে তখন উঠে গিয়ে চারটি ঠোকর দিয়ে আসে। অথবা নামাযের জন্য ওঠে ঠিকই কিন্তু একবারে যেন উঠতে মন চায়না এমনভাবে ওঠে এবং নামায পড়ে নেয় কিন্তু মনের দিক থেকে কোন সাড়া পায় না। যেন কোন আপদ তাদের ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। নামায পড়তে পড়তে কাপড় নিয়ে খেলা করতে থাকে। হাই তুলতে থাকে। আল্লাহর স্মরণ সামান্যতম তাদের মধ্যে থাকে না। সারাটা নামাযের মধ্যে তাদের এ অনুভূতি থাকেনা যে, তারা নামায পড়ছে। নামাযের মধ্যে কি পড়ছে তাও তাদের খেয়াল থাকে না, নামায পড়তে থাকে এবং মন অনত্র পড়ে থাকে। তাড়াহুড়া করে এমনভাবে নামাযটা পড়ে নেয় যাতে কিয়াম, রুকূ' ও সিজদা কোনটাই ঠিক হয় না। কেননা কোন প্রকারে নামায পড়ার ভান করে দ্রুত শেষ করার চেষ্টা করে। আবার এমন অনেক লোক আছে, যারা কোন জায়গায় আটকা পড়ে যাবার কারণে বেকায়দায় পড়ে নামাযটা পড়ে নেয় কিন্তু আসলে তাদের জীবনে এ ইবাদতটার কোন মর্যাদা নেই। নামাযের সময় এসে গেলে এটা যে নামাযের সময় এ অনুভূতিই ও তাদের থাকে না। মুয়ায্যিনের আওয়াজ কানে এলে তিনি কিসের আহবান জানাচ্ছেন, কাকে এবং কেন জানাচ্ছেন একথাটা একবারও তারা চিন্তা করে না। এটাই আখেরাতের প্রতি ঈমান না রাখার আলামত। কারণ ইসলামের এ তথাকথিত দাবীদাররা নামায পড়লে কোন পুরার পাবে বলে মনে করে না এবং না পড়লে তাদের কপালে শাস্তি ভোগ আছে একথা বিশ্বাস করে না। এ কারণে তারা এ কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করে। এ জন্য হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা) ও হযরত আতা ইবনে দীনার বলেনঃ আল্লাহর শোকর তিনি "ফী সালাতিহিম সাহুন" বলেননি বরং বলেছেন, "আন সালাতিহিম সাহুন"। অর্থাৎ আমরা নামাযে ভুল করি ঠিকই কিন্তু নামায থেকে গাফেল হই না। এ জন্য আমরা মুনাফিকদের অন্তর্ভুক্ত হবো না।

কুরআন মজীদের অন্যত্র মুনাফিকদের এ অবস্থাটি এভাবে বর্ণনা করা হয়েছেঃ"তারা যখনই নামাযে আসে অবসাদগ্রস্তের মতো আসে এবং যখনই (আল্লাহর পথে) খরচ করে অনিচ্ছাকৃতভাবে করে"। (তাওবা ৫৪)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

"এটা মুনাফিকের নামায, এটা মুনাফিকের নামায, এটা মুনাফিকের নামায। সে আসরের সময় বসে সূর্য দেখতে থাকে। এমনকি সেটা শয়তানের দু'টো শিংয়ের

www.pathagar.com

মাঝখানে পৌঁছে যায়। (অর্থাৎ সূর্যাস্তের সময় নিকটবর্তী হয়) তখন সে উঠে চারটে ঠোকর মেরে নেয়। তাতে আল্লাহকে খুব কমই স্মরণ করা হয়"। (বুখারী, মুসলিম ও মুসনাদে আহমাদ)

হযরত সা'দ ইবেন আবী ওয়াক্কাস (রা) থেকে তাঁর পুত্র মুসআব ইবনে সা'দ রেওয়ায়াত করেন, যারা নামাযের ব্যাপারে গাফলতি করে তাদের সম্পর্কে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন, যারা গড়িমসি করতে করতে নামাযের সময় শেষ হয় এমন অবস্থায় নামায পড়ে তারাই হচ্ছে এসব লোক। (ইবনে জারীর, আবু ইয়ালা, ইবনুল মুনযির, ইবনে আবী হাতেম, তাবারানী ফিল আওসাত, ইবনে মারদুইয়া ও বাইহাকী ফিস সুনান। এ রেওয়ায়াতটি হযরত সা'দের নিজের উক্তি হিসেবেও উল্লিখিত হয়েছে। সে ক্ষেত্রে এর সনদ বেশী শক্তিশালী। আবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী হিসেবে এ রেওয়ায়াতটির সনদ বাইহাকী ও হাকেমের দৃষ্টিতে দুর্বল) হযরত মুস'আবের দ্বিতীয় রেওয়ায়াতটি হচ্ছে, তিনি নিজের মহান পিতাকে জিজ্ঞেস করেন, এ আয়াটি নিয়ে কি আপনি চিন্তা-ভাবনা করেছেন? এর অর্থ কি নামায ত্যাগ করা? অথবা এর অর্থ নামায পড়তে পড়তে মানুষের চিন্তা অন্য কোনদিকে চলে যাওয়া? আমাদের মধ্যে কে এমন আছে নামাযের মধ্যে যার চিন্তা অন্য দিকে যায় না? তিনি জবাব দেন, না এর মানে হচ্ছে মানুষের সময়টা নষ্ট করে দেয়া এবং গড়িমসি করে সময় শেষ হয় হয় এমন অবস্থায় তা পড়া। (ইবনে জারীর, ইবনে আবী শাইবা, আবু ইয়া'লা, ইবনুল মুনযির, ইবনে মারদুইয়া ও বাইহাকী ফিস সুনান)

এ প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে, নামাযের মধ্যে অন্য চিন্তা এসে যাওয়া এক কথা এবং নামাযের প্রতি কখনো দৃষ্টি না দেয়া এবং নামায পড়তে পড়তে সবসময় অন্য বিষয় চিন্তা করতে থাকা সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা। প্রথম অবস্থাটি মানবিক দুর্বলতার স্বাভাবিক দাবি। ইচ্ছা ও সংকল্প ছাড়াই অন্যান্য চিন্তা এসে যায় এবং মু'মিন যখনই অনুভব করে, তার মন নামায থেকে অন্যদিকে চলে গেছে তখনই সে চেষ্টা করে আবার নামাযে মনোনিবেশ করে। দ্বিতীয় অবস্থাটি নামাযে গাফলতি করার পর্যায়ভূক্ত। কেননা এ অবস্থায় মানুষ শুধুমাত্র নামাযের ব্যায়াম করে। আল্লাহকে স্মরণ করার কোন ইচ্ছা তার মনে জাগে না। নামায শুরু করা থেকে নিয়ে সালাম ফেরা পর্যন্ত একটা মুহূর্তও তার মন আল্লাহর প্রতি আকৃষ্ট হয় না। যেসব চিন্তা মাথায় পুরে সে নামাযে প্রবেশ করে তার মধ্যেই সবসময় ডুবে থাকে।

১০. এটি একটি স্বতন্ত্র বাক্যও হতে পারে আবার পূর্বের বাক্যের সাথে সম্পর্কিত হতে পারে। একে স্বতন্ত্র বাক্য গণ্য করলে এর অর্থ হবে, কেননা সৎকাজও তারা আন্তরিক সংকল্প সহকারে আল্লাহর জন্য করে না। বরং যা কিছু করে অন্যদের দেখাবার জন্য করে। এভাবে তারা নিজেদের প্রশংসা শুনাতে চায়। তারা চায়, লোকেরা তাদের সৎ লোক মনে করে তাদের সৎকাজের ডংকা বাজাবে। এর মাধ্যমে তারা কোন না

www.pathagar.com

কোনভাবে দুনিয়ার স্বার্থ উদ্ধার করবে। আর আগের বাক্যের সাথে একে সম্পর্কিত মনে করলে এর অর্থ হবে তারা লোক দেখানো কাজ করে। সাধারণভাবে মুফাস্‌সিরগণ দ্বিতীয় অর্থটিকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। কারণ প্রথম নজরেই টের পাওয়া যায় আগের বাক্যের সাথে এর সম্পর্ক রয়েছে। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন: "এখানে মুনাফিকদের কথা বলা হয়েছে, যারা লোক দেখানো নামায পড়তো। অন্য লোক সামনে থাকলে নামায পড়তো এবং অন্য লোক না থাকলে পড়তো না"। অন্য একটি রেওয়ায়াতে তাঁর বক্তব্য হচ্ছে, "একাকী থাকলে পড়তো না। আর সর্ব সমক্ষে পড়ে নিতো"। (ইবনে জারীর, ইবনুল মুনযির, ইবনে আবী হাতেম, ইবনে মারদুইয়া ও বায়হাকী ফিশ শু'আব) কুরআন মজীদেও মুনাফিকদের অবস্থা বর্ণনা করে বলা হয়েছে:

"আর যখন তারা নামাযের জন্য ওঠে অবসাদগ্রস্তের ন্যায় ওঠে। লোকদের দেখায় এবং আল্লাহকে স্মরণ করে খুব কমই"। (আন নিসা ১৪২)

১১. মূলে মাউন শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। হযরত আলী (রা), ইবনে উমর (রা) সাঈদ ইবনে জুবাইর, কাতাদাহ, হাসান বসরী, মুহাম্মাদ ইবনে হানাফীয়া, যাহ্‌হাক, ইবনে যায়েদ, ইকরামা, মুজাহিদ, আতা ও যুহরী রাহিমাহুমুল্লাহ বলেন, এখানে এই শব্দটি থেকে যাকাত বুঝানো হয়েছে। ইবনে আব্বাস (রা) ইবনে মাসউদ (র) ইবরাহীম নাখয়ী (র) আবু মালেক (র) এবং অন্যান্য লোকদের উক্তি হচ্ছে, এখানে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্র যেমন হাঁড়ি-পাতিল, বালতি, দা, দাঁড়িপাল্লা, লবণ, পানি-আগুন, চকমাকি (বর্তমানে এর স্থান দখল করেছে দিয়াশলাই) ইত্যাদির কথা বলা হয়েছে। কারণ লোকেরা সাধারণত এগুলো দৈনন্দিন কাজের জন্য পরস্পরের কাছ থেকে চেয়ে নেয়। সাঈদ ইবনে জুবাইর ও মুজাহিদের একটি উক্তিও এর সমর্থনে পাওয়া যায়। হযরত আলীর (রা) এক উক্তিতেও বলা হয়েছে, এর অর্থ যাকাত হয় আবার ছোট ছোট নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস পত্রও হয়। ইবনে আবী হাতেম ইকরামা, থেকে উদ্ধৃত করে বলেন, মাউনের সর্বোচ্চ পর্যায় হচ্ছে যাকাত এবং সর্বনিম্ন পর্যায় হচ্ছে কাউকে চালুনী, বালতী বা দেয়াশলাই ধার দেয়া। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথীরা বলতাম (কোন কোন হাদীসে আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুবারক জামানায় বলতাম): মাউন বলতে হাঁড়ি, কুড়াল, বালতি, দাঁড়িপাল্লা এবং এ ধরনের অন্যান্য জিনিস অন্যকে ধার দেয়া বুঝায়। (ইবনে জারীর, ইবনে আবী শাইবা, আবু দাউদ, নাসায়ী, বাযযার, ইবনুল মুনযির, ইবনে আবী হতেম, তাবারানী ফিল আওসাত, ইবনে মারদুইয়া ও বাইহাকী ফিস সুনান)

সাঈদ ইবনে ইয়ায স্পষ্ট নাম উল্লেখ না করেই প্রায় এ একই বক্তব্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয় সাল্লামের সাহাবীদের থেকে উদ্ধৃত করেছেন। তার অর্থ হচ্ছে, তিনি বিভিন্ন সাহাবী থেকে একথা শুনেছেন। (ইবনে জারীর ও ইবনে আবী শাইবা) দাইলামী, ইবনে আসাকির ও আবু নু'আইম হযরত আবু হুরায়রার একটি হাদীস উদ্ধৃত

www.pathagar.com

করেছেন। তাতে তিনি বলেছেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে এ আয়াতের ব্যাখ্যা করে বলেছেন, এ থেকে কুড়াল, বালতি এবং এ ধরনের অন্যান্য জিনিস বুঝানো হয়েছে। এ হাদীসটি যদি সহীহ হয়ে থাকে, তাহলে সম্ভবত এটি অন্য লোকেরা জানতেন না। জানলে এরপর কখনো তারা এর অন্য কোন ব্যাখ্যা করতেন না।

মূলত মাউন ছোট ও সামান্য পরিমাণ জিনিসকে বলা হয়। এমন ধরনের জিনিস যা লোকদের কোন কাজে লাগে বা এর থেকে তারা ফয়দা অর্জন করতে পারে। এ অর্থে যাকাতও মাউন। কারণ বিপুল পরিমাণ সম্পদের মধ্য থেকে সামান্য পরিমাণ সম্পদ যাকাত হিসেবে গরীবদের সাহায্য করার জন্য দেয়া হয়। আর এই সংগে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) এবং তাঁর সমমনা লোকেরা অন্যান্য যেসব নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির কথা উল্লেখ করেছেন সেগুলোও মাউন। অধিকাংশ তাফসীরকারের মতে, সাধারণত প্রতিবেশীরা একজন আর একজনের কাছ থেকে দৈনন্দিন যেসব জিনিস চেয়ে নিয়ে থাকে সেগুলোই মাউনের অন্তর্ভুক্ত। এ জিনিসগুলো অন্যের কাছ থেকে চেয়ে নেয়া কোন অপমানজনক বিষয় নয়। কারণ ধনী-গরীব সবার এ জিনিসগুলো কোন না কোন সময় দরকার হয়। অবশ্যই এ ধরনের জিনিস অন্যকে দেবার ব্যাপারে কার্পণ্য করা হীন মনোবৃত্তির পরিচায়ক। সাধারণত এ পর্যায়ের জিনিসগুলো অপরিবর্তিত থেকে যায় এবং প্রতিবেশীরা নিজেদের কাজে সেগুলো ব্যবহার করে, কাজ শেষ হয়ে গেলে অবিকৃত অবস্থায়ই তা ফেরত দেয়। কারো বাড়িতে মেহমান এলে প্রতিবেশীর কাছে খাটিয়া বা বিছানা-বালিশ চাওয়াও এ মাউনের অন্তর্ভূক্ত অথবা নিজের প্রতিবেশীর চুলায় একটু রান্নাবান্না করে নেয়ার অনুমতি চাওয়া কিংবা কেউ কিছুদিনের জন্য বাইরে যাচ্ছে এবং নিজের কোন মূল্যবান জিনিস অন্যের কাছে হেফাজত সহকারে রাখতে চাওয়াও মাউনের পর্যায়ভুক্ত। কাজেই এখানে আয়াতে মূল বক্তব্য হচ্ছে, আখেরাত অস্বীকৃতি মানুষকে এতবেশী সংকীর্ণমনা করে দেয় যে, সে অন্যের জন্যে সামান্যতম ত্যাগ স্বীকার করতেও রাজি হয় না

www.pathagar.com

২৩ রামাদান
বিষয়ঃ দুনিয়ার আকর্ষণ
সূরা আল ইমরানঃ ১৪-১৯

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاء وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ (14) قُلْ أَؤُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ (15) الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (16) الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالأَسْحَارِ (17) شَهِدَ اللّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَأُوْلُواْ الْعِلْمِ قَآئِمَاً بِالْقِسْطِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (18) إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ إِلاَّ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمْ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللّهِ فَإِنَّ اللّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (19)

১৪) মানুষের জন্য নারী, সন্তান, সোনারূপার স্তূপ, সেরা ঘোড়া, গবাদী পশু ও কৃষি ক্ষেতের প্রতি আসক্তিকে বড়ই সুসজ্জিত ও সুশোভিত করা হয়েছে। কিন্তু এগুলো দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনের সামগ্রী মাত্র। প্রকৃতপক্ষে উত্তম আবাস তো রয়েছে আল্লাহর কাছে।

১৫) বলো, আমি কি তোমাদের জানিয়ে দেবো, ওগুলোর চাইতে ভালো জিনিস কি? যারা তাকওয়ার নীতি অবলম্বন করে তাদের জন্য তাদের রবের কাছে রয়েছে বাগান, তার নিম্নদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হয়। সেখানে তারা চিরন্তন জীবন লাভ করবে। পবিত্র স্ত্রীরা হবে তাদের সংগিনী[১১] এবং তারা লাভ করবে আল্লাহর সন্তুষ্টি। আল্লাহ তার বান্দাদের কর্মনীতির ওপর গভীর ও প্রখর দৃষ্টি রাখেন।[১২]

১৬) এ লোকেরাই বলেঃ "হে আমাদের রব! আমরা ঈমান এনেছি, আমাদের গোনাহখাতা মাফ করে দাও এবং জাহান্নামের আগুন থেকে আমাদের বাচাঁও। এরা সবরকারী।[১৩]

১৭) সত্যনিষ্ঠ, অনুগত ও দানশীল এবং রাতের শেষভাগে আল্লাহর কাছে গোনাহ মাফের জন্য দোয়া করে থাকে"।

www.pathagar.com

১৮) আল্লাহ নিজেই সাক্ষ্য দিয়েছেন, তিনি ছাড়া আর কোন ইলাই নেই।[১৪] আর ফেরেশতা ও সকল জ্ঞানবান লোকই সততা ও ন্যায়পরায়ণতার সাথে এ সাক্ষ্য দিচ্ছে [১৫] যে, সেই প্রবল পরাক্রান্তও জ্ঞানবান সত্তা ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই।

১৯) ইসলাম আল্লাহর নিকট একমাত্র দ্বীন বা জীবনবিধান।[১৬] যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল, তারা এ দ্বীন থেকে সরে গিয়ে যেসব বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করেছে, সেগুলো অবলম্বনের এ ছাড়া আর কোন কারণই ছিল না যে, প্রকৃত জ্ঞান এসে যাওয়ার পর তারা নিজেদের মধ্যে পরস্পরের ওপর বাড়াবাড়ি করার জন্য এমনটি করেছে।[১৭] আর যে কেউ আল্লাহর হেদায়াতের আনুগত্য করতে অস্বীকার করে, তার কাছ থেকে হিসেব নিতে আল্লাহর মোটেই দেরী হয় না।

আয়াত সমূহের ব্যাখ্যা

১১. এর ব্যাখ্যা দেখুন সূরা আল বাকারার ২৭ টীকায়।

১২. অর্থাৎ আল্লাহ অপাত্রে দান করেন না। উপরি উপরি বা ভাসা ভাসা ভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা তাঁর নীতি নয়। তিনি তার বান্দাহদের কার্যাবলী, সংকল্প ও ইচ্ছা পুরোপুরি ও ভালোভাবেই জানেন। কে পুরস্কার লাভের যোগ্য আর কে যোগ্য নয়, তাও তিনি ভালোভাবেই জানেন।

১৩. অর্থাৎ সত্য পথে পূর্ণ অবিচলতার সাথে প্রতিষ্ঠিত থাকে। কোন ক্ষতি বা বিপদের মুখে কখনো সাহস ও হিম্মতহারা হয় না। ব্যর্থতা এদের মনে কোন চিড় ধরায় না। লোভ-লালসায় পা পিছলে যায় না। যখন আপাতদৃষ্টিতে সাফল্যের কোন সম্ভাবনাই দেখা যায় না তখনো এরা মজবুতভাবে সত্যকে আঁকড়ে ধরে থাকে। (সূরা আল বাকারার ৬০ টীকাটিও দেখে নিন)।

১৪. অর্থাৎ যে আল্লাহ বিশ্ব-জাহানের সমস্ত তত্ত্ব, সত্য ও রহস্যের প্রত্যক্ষ জ্ঞান রাখেন, যিনি সমগ্র সৃষ্টিকে আবরণহীন অবস্থায় দেখছেন এবং যার দৃষ্টি থেকে পৃথিবী ও আকাশের কোন একটি বস্তুও গোপন নেই, এটি তার সাক্ষ্য এবং তার চাইতে আর বেশী নির্ভরযোগ্য চাক্ষুষ সাক্ষ্য আর কে দিতে পারে? কারণ সমগ্র সৃষ্টিজগতে তিনি ছাড়া আর কোন সত্তা খোদায়ী গুণান্বিত নয়। আর কোন সত্তা খোদায়ী কর্তৃত্বের অধিকারী নয় এবং আর কারোর খোদায়ী করার যোগ্যতাও নেই।

১৫. আল্লাহর পর সবচেয়ে বেশী নির্ভরযোগ্য সাক্ষ্য হচ্ছে ফেরেশতাদের। কারণ তারা হচ্ছে বিশ্বরাজ্যের ব্যবস্থাপনার কার্যনির্বাহী ও কর্মচারী। তারা সরাসরি নিজেদের ব্যক্তিগত জ্ঞানের ভিত্তিতে সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, এই বিশ্বরাজ্যে আল্লাহ ছাড়া আর আরো হুকুম চলে না এবং পৃথিবী ও আকাশের পরিচালনা ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে তিনি ছাড়া আর কোন সত্তা এমন নেই যার কাছ থেকে তারা নির্দেশ গ্রহণ করতে পারে। ফেরেশতাদের পরে এই সৃষ্টিজগতে আর যারাই প্রকৃত সত্য সম্পর্কে কম বেশী কিছুটা জ্ঞান রাখে,

www.pathagar.com

সৃষ্টির আদি থেকে নিয়ে আজ পর্যন্তকার তাদের সবার সর্বসম্মত সাক্ষ্য হচ্ছে এই যে, আল্লাহ একাই এই সমগ্র বিশ্ব-জাহানের মালিক, পরিচালক ও প্রভু।

১৬. অর্থাৎ আল্লাহর কাছে মানুষের জন্য একটি মাত্র জীবন ব্যবস্থা ও একটি মাত্র জীবন বিধান সঠিক ও নির্ভুল বলে গৃহীত। সেটি হচ্ছে, মানুষ আল্লাহকে নিজের মালিক ও মাবুদ বলে স্বীকার করে নেবে এবং তাঁর ইবাদত, বন্দেগী ও দাসত্বের মধ্যে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সোপর্দ করে দেবে। আর তাঁর বন্দেগী করার পদ্ধতি নিজেরা আবিষ্কার করবে না। বরং তিনি নিজের নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে যে হিদায়ত ও বিধান পাঠিয়েছেন কোন প্রকার কমবেশী না করে তার অনুসরণ করবে। এই চিন্তা ও কর্মপদ্ধতির নাম "ইসলাম" আর বিশ্ব-জাহানের স্রষ্টা ও প্রভু নিজের সৃষ্টিকূল ও প্রজা সাধারণের জন্য ইসলাম ছাড়া অন্য কোন কর্মপদ্ধতির বৈধতার স্বীকৃতি না দেয়াও পুরোপুরি ন্যায়সংগত। মানুষ তার নির্বুদ্ধিতার কারণে নাস্তিক্যবাদ থেকে নিয়ে শিরক ও মূর্তিপূজা পর্যন্ত যে কোন মতবাদ ও যে কোন পদ্ধতির অনুসরণ করা নিজের জন্য বৈধ মনে করতে পারে কিন্তু বিশ্ব-জাহানের প্রভুর দৃষ্টিতে এগুলো নিছক বিদ্রোহ ছাড়া আর কিছুই নয়।

১৭. এর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর পক্ষ থেকে দুনিয়ার যে কোন স্থানে যে কোন যুগে যে নবীই এসেছেন, তাঁর দ্বীনই ছিল ইসলাম। দুনিয়ার যে কোন জাতির ওপর যে কিতাবই নাযিল হয়েছে, তা ইসলামেরই শিক্ষা দান করেছে। এই আসল দ্বীনকে বিকৃত করে এবং তার মধ্যে পরিবর্তন পরিবর্ধন করে যেসব ধর্ম মানুষের মধ্যে প্রচলিত হয়েছে, তাদের জন্ম ও উদ্ভবের কারণ এ ছাড়া আর কিছুই ছিল না যে, লোকেরা নিজেদের বৈধ সীমা অতিক্রম, নিজেদের খেয়াল খুশী মতো আসল দ্বীনের আকীদা-বিশ্বাস, মূলনীতি ও বিস্তারিত বিধান পরিবর্তন করে ফেলেছে।

www.pathagar.com

২৪ রামাদান

বিষয়: দুনিয়া মুসলমানদের জন্য পরীক্ষা

সূরা আনকাবুত: ০১-১১

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الم (1) أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ (2) وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ (3) أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (4) مَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (5) وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (6) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ (7) وَوَصَّيْنَا الإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (8) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ (9) وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ (10) وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ (11)

১) আলিম-লাম-মীম। ২) লোকেরা কি মনে করে রেখেছে, "আমরা ঈমান এনেছি" কেবলমাত্র একথাটুকু বললেই তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে, আর পরীক্ষা করা হবে না? [১] ৩) অথচ আমি তাদের পূর্ববর্তীদের সবাইকে পরীক্ষা করে নিয়েছি [২] আল্লাহ অবশ্যই দেখবেন [৩] কে সত্যবাদী এবং কে মিথ্যুক। ৪) আর যারা খারাপ কাজ করছে [৪] তারা কি মনে করে বসেছে তারা আমার থেকে এগিয়ে চলে যাবে ? [৫] বড়ই ভুল সিদ্ধান্ত তারা গ্রহণ করছে। ৫) যে কেউ আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করার আশা করে (তার জানা উচিত), আল্লাহর নির্ধারিত সময় আসবেই। [৬] আর আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও জানেন। [৭] ৬) যে ব্যক্তিই প্রচেষ্টা-সংগ্রাম করবে সে নিজের ভালোর জন্যই করবে। [৮] আল্লাহ অবশ্যই বিশ্ববাসীদের প্রতি মুখাপেক্ষী নন। [৯] ৭) আর যারা ঈমান আনবে ও সৎকাজ করবে তাদের দুস্কৃতিগুলো আমি তাদের থেকে দূর করে দেবো এবং তাদেরকে তাদের সর্বোত্তম কাজগুলোর প্রতিদান দেবো। [১০].৮) আমি মানুষকে নিজের পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছি। কিন্তু যদি তারা তোমার ওপর চাপ দেয় যে, তুমি এমন কোন (মা'বুদকে) আমার সাথে শরীক করো যাকে তুমি (আমার শরীক হিসেবে) জানো না, তাহলে তাদের আনুগত্য করো না। [১১] আমার দিকেই তোমাদের সবাইকে ফিরে আসতে হবে, তখন আমি তোমাদের জানাবো তোমরা কি করছিলে। [১২] ৯) আর

www.pathagar.com

যারা ঈমান আনবে ও সৎকাজ করে থাকবে তাদেরকে আমি নিশ্চয়ই সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত করবো। ১০) লোকদের মধ্যে এমন কেউ আছে যে বলে, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর প্রতি [১৩] কিন্তু যখন সে আল্লাহর ব্যাপারে নিগৃহীত হয়েছে তখন লোকদের চাপিয়ে দেয়া পরীক্ষাকে আল্লাহর আযাবের মতো মনে করে নিয়েছে। [১৪] এখন যদি তোমার রবের পক্ষ থেকে বিজয় ও সাহায্য এসে যায়, তাহলে এ ব্যক্তিই বলবে, "আমরা তো তোমাদের সাথে ছিলাম"। [১৫] বিশ্ববাসীদের মনের অবস্থা কি আল্লাহ ভালোভাবে জানেন না? ১১) আর আল্লাহ তো অবশ্যই দেখবেন কারা ঈমান এনেছে এবং কারা মুনাফিক। [১৬]

আয়াত সমূহের ব্যাখ্যা

১. যে অবস্থায় একথা বলা হয় তা ছিল এই যে, মক্কা মু'আযমায় কেউ ইসলাম গ্রহণ করলেই তার ওপর বিপদ আপদ ও জুলুম-নিপীড়নের পাহাড় ভেঙ্গে পড়তো। কোন গোলাম বা গরীব মানুষ ইসলাম গ্রহণ করলে তাকে ভীষণভাবে মারপিট এবং কঠোর নির্যাতন-নিপীড়নের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত করা হতো। সে যদি কোন দোকানদার বা কারিগর হতো তাহলে তার রুজি-রোজগারের পথ বন্ধ করে দেয়া হতো। সে যদি কোন প্রভাবশালী পরিবারের কোন ব্যক্তি হতো, তাহলে তার নিজের পরিবারের লোকেরা তাকে নানাভাবে বিরক্ত করতো ও কষ্ট দিতো এবং এভাবে তার জীবনকে দুর্বিসহ করে তুলতো। এ অবস্থা মক্কায় একটি মারাত্মক ভীতি ও আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি করে দিয়েছিল। এ কারণে লোকেরা নবী (সা) এর সত্যতার স্বীকৃতি দেয়া সত্ত্বেও ঈমান আনতে ভয় করতো এবং কিছু লোক ঈমান আনার ভয়াবহ শাস্তির সম্মুখীন হলে সাহস ও হিম্মতহারা হয়ে কাফেরদের সামনে নতজানু হয়ে যেতো। এ পরিস্থিতি যদিও দৃঢ় ঈমানের অধিকারী সাহাবীগণের অবিচল নিষ্ঠার মধ্যে কোন প্রকার দোদুল্যমানতা সৃষ্টি করেনি তবুও মানবিক প্রকৃতির তাগিদে অধিকাংশ সময় তাদের মধ্যেও একটা মারাত্মক ধরনের চিত্তচাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়ে যেতো। এ ধরনের অবস্থার একটা চিত্র পেশ করে হযরত খাব্বাব ইবনে আরত বর্ণিত একটি হাদীস। হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন বুখারী, আবু দাউদ ও নাসাঈ তাদের গ্রন্থে। তিনি বলেন, যে সময় মুশরিকদের কঠোর নির্যাতনে আমরা ভীষণ দুরবস্থার সম্মুখীন হয়ে পড়েছিলাম সে সময় একদিন আমি দেখলাম নবী (সা) কা'বাঘরের দেয়ালের ছায়ায় বসে রয়েছেন। আমি সেখানে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি আমাদের জন্য দোয়া করেন না। একথা শুনে তার চেহারা আবেগে-উত্তেজনায় রক্তিমবর্ণ ধারণ করলো এবং তিনি বললেন, "তোমাদের পূর্বে যেসব মু'মিনদল অতিক্রান্ত হয়েছে তারা এর চাইতেও বেশি নিগৃহীত হয়েছে। তাদের কাউকে মাটিতে গর্ত করে তার মধ্যে বসিয়ে দেয়া হতো এবং তারপর তার মাথার ওপর করাত চালিয়ে দু'টুকরা করে দেয়া হতো। কারো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সন্ধিস্থলে লোহার চিরুনী দিয়ে আঁচড়ানো হতো, যাতে তারা ঈমান প্রত্যাহার করে। আল্লাহর

www.pathagar.com

কসম, এ কাজ সম্পন্ন হবেই, এমনকি এক ব্যক্তি সান'আ থেকে হাদ্‌রামাউত পর্যন্ত নি:শঙ্ক চিত্তে সফর করবে এবং আল্লাহ ছাড়া আর কারো ভয় তার মনে থাকবে না"।

এ চিত্তচাঞ্চল্যকে অবিচল ধৈর্য ও সহিষ্ণুতায় রূপান্তরিত করার জন্য মহান আল্লাহ মু'মিনদেরকে বুঝান, ইহকালীন ও পরকালীন সাফল্য অর্জনের জন্য আমার যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি রয়েছে কোন ব্যক্তি নিছক মৌখিক ঈমানের দাবীর মাধ্যমে তার অধিকারী হতে পারে না। বরং প্রত্যেক দাবীদারকে অনিবার্যভাবে পরীক্ষার চুল্লী অতিক্রম করতে হবেই। তাকে এভাবে নিজের দাবির সত্যতা পেশ করতে হবে। আমার জান্নাত এত সস্তা নয় এবং দুনিয়াতেও আমার বিশেষ অনুগ্রহ এত আয়াশলব্ধ নয় যে, তোমরা কেবলই মুখে আমার প্রতি ঈমান আনার কথা উচ্চারণ করবে আর অমনিই আমি তোমাদেরকে সেসব কিছুই দান করে দেবো। এসবের জন্য তো পরীক্ষার শর্ত রয়েছে। আমার জন্য কষ্ট বরদাশত করতে হবে। বিভিন্ন ধরনের নিপীড়ন-নির্যাতন সহ্য করতে হবে, বিপদ-মুসিবত ও সংকটের মুকাবিলা করতে হবে। ভীতি ও আশঙ্কা দিয়ে পরীক্ষা করা হবে এবং লোভ-লালসা দিয়েও। এমন প্রত্যেকটি জিনিস যা ভালোবাসো ও পছন্দ করো, আমার সন্তুষ্টির জন্য তাকে উৎসর্গ করতে হবে। আর এমন প্রত্যেকটি কষ্ট যা তোমাদের অনভিপ্রেত এবং তোমরা অপছন্দ করে থাকো, আমার জন্য তা অবশ্যই বরদাশত করতে হবে। তারপরেই তোমরা আমাকে মানার যে দাবি করেছিলে তার সত্য-মিথ্যা যাচাই হবে। কুরআন মাজীদের এমন প্রত্যেকটি জায়গায় যেখানে বিপদ-মুসিবত ও নিগ্রহ-নিপীড়নের সর্বব্যাপী আক্রমণে মুসলমানদের মধ্যে ভীতি সঞ্চারের অবস্থা হয়ে গেছে সেখানেই একথা বলা হয়েছে। হিজরতের পরে মদিনায় মুসলমানদের জীবনের প্রথমাবস্থায় যখন অর্থনৈতিক সংকট, বাইরের বিপদ এবং ইহুদী ও মুনাফিকদের ভিতরের দুস্কৃতি মু'মিনদেরকে ভীষণভাবে পেরেশান করে রেখেছিল তখন আল্লাহ বলেন:

"তোমরা কি মনে করেছো তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করে যাবে, অথচ এখনো তোমরা সে অবস্থার সম্মুখীন হওনি, যে অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী (ঈমানদার) গণ। তারা সম্মুখীন হয়েছিল নির্মমতা ও দুঃখ-ক্লেশের এবং তাদেরকে অস্থির করে তোলা হয়েছিল। এমনকি রাসূল ও তার সাথে যারা ঈমান এনেছিল তারা চিৎকার করে বলে উঠেছিল আল্লাহর সাহায্য কবে আসবে। (তখনই তাদেরকে সুখবর দেয়া হয়েছিল এই মর্মে যে) জেনে রাখো, আল্লাহর সাহায্য নিকটেই"। (আল বাকারাহঃ ২১৪)

অনুরূপভাবে ওহুদ যুদ্ধের পর যখন মুসলমানদের ওপর আবার বিপদ-মুসিবতের একটি দুর্যোগপূর্ণ যুগের অবতারণা হয় তখন বলা হয়:

"তোমরা কি মনে করে নিয়েছো, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করে যাবে, অথচ এখনো আল্লাহ দেখেননি যে, তোমাদের মধ্য থেকে কে জিহাদে প্রাণ উৎসর্গকারী এবং কে সবরকারী"। (আল ইমরানঃ ১৪২)

প্রায় একই বক্তব্য সূরা আলে ইমরানের ১৭৯, সূরা তাওবার ১৬ এবং সূরা মুহাম্মদের ৩১ আয়াতে বলা হয়েছে। এসব বক্তব্যের মাধ্যমে মহান আল্লাহ মুসলমানদের মনে এ

www.pathagar.com

সত্যটি গেঁথে দিয়েছেন যে, পরীক্ষাই হচ্ছে এমন একটি মানদন্ড যার মাধ্যমে ভেজাল ও নির্ভেজাল যাচাই করা যায়। ভেজাল নিজে নিজেই আল্লাহর পথ থেকে সরে যায় এবং নির্ভেজালকে বাছাই করে নিয়ে নেয়া হয়। এভাবে সে আল্লাহর এমনসব পুরস্কার লাভের যোগ্য হয়, যেগুলো কেবলমাত্র সাচ্চা ঈমানদারদের জন্য নির্ধারিত।

২. অর্থাৎ তোমাদের সাথে যা কিছু হচ্ছে , তা কোন নতুন ব্যাপার নয়। ইতিহাসে হরহামেশা এমনটিই হয়ে এসেছে। যে ব্যক্তিই ঈমানের দাবী করেছে তাকে অবশ্যই পরীক্ষার অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করে দগ্ধ করা হয়েছে। আর অন্যদেরকেও যখন পরীক্ষা না করে কিছু দেয়া হয়নি তখন তোমাদের এমন কি বিশেষত্ব আছে যে, কেবলমাত্র মৌখিক দাবীর ভিত্তিতেই তোমাদেরকে দেয়া হবে।

৩. মূল শব্দ হচ্ছে 'ফালা ইয়া'লামান্নাল্লাহু' এর শাব্দিক অনুবাদ হবে, "আল্লাহ অবশ্যই জেনে নেবেন" একথায় কেউ প্রশ্ন করতে পারে, আল্লাহ তো সত্যবাদীর সত্যবাদিতা এবং মিথ্যুকের মিথ্যাচার ভালোই জানেন, পরীক্ষা করে আবার তা জানার প্রয়োজন কেন। এর জবাব হচ্ছে, যতক্ষণ এক ব্যক্তির মধ্যে কোন জিনিসের কেবলমাত্র যোগ্যতা ও কর্মক্ষমতাই থাকে, কার্যত তার প্রকাশ হয় না ততক্ষণ ইনসাফ ও ন্যায়নীতির দৃষ্টিতে সে কোন পুরস্কার বা শাস্তির অধিকারী হতে পারে না। যেমন এক ব্যক্তির মধ্যে আমানতদার হবার যোগ্যতা আছে এবং অন্যজনের মধ্যে যোগ্যতা আছে আত্মসাৎ করার। এরা দু'জন যতক্ষণ না পরীক্ষার সম্মুখীন হয় এবং একজনের থেকে আমানতদারী এবং অন্যজনের থেকে আত্মসাতের কার্যত প্রকাশ না ঘটে ততক্ষণ নিছক নিজের অদৃশ্য জ্ঞানের ভিত্তিতে আল্লাহ একজনকে আমানতদারীর পুরস্কার দিয়ে দেবেন এবং অন্যজনকে আত্মসাতের শাস্তি দিয়ে দেবেন, এটা তার ইনসাফের বিরোধী। তাই মানুষের ভালো কাজ ও মন্দ কাজ করার আগে তাদের কর্মযোগ্যতা ও ভবিষ্যত কর্মনীতি সম্পর্কে আল্লাহর যে পূর্ব জ্ঞান আছে তা ইনসাফের দাবী পূরণ করার জন্য যথেষ্ঠ নয়। অমুক ব্যক্তির মধ্যে চুরির প্রবণতা আছে, সে চুরি করবে অথবা করতে যাচ্ছে, এ ধরনের জ্ঞানের ভিত্তিতে আল্লাহ বিচার করেন না। বরং সে চুরি করেছে এ জ্ঞানের ভিত্তিতে তিনি বিচার করেন। এভাবে অমুক ব্যক্তি উন্নত পর্যায়ের মু'মিন ও মুজাহিদ হতে পারে অথবা হবে এ জ্ঞানের ভিত্তিতে আল্লাহ তার ওপর অনুগ্রহ ও নিয়ামত বর্ষণ করেন না বরং অমুক ব্যক্তির নিজের কাজের মাধ্যমে তার সাচ্চা ঈমানদার হবার কথা প্রমাণ করে দিয়েছে এবং আল্লাহর পথে জীবন সংগ্রাম করে দেখিয়ে দিয়েছে- এরই ভিত্তিতে বর্ষণ করেন। তাই আমি এ আয়াতের অনুবাদ করেছি "আল্লাহ অবশ্যই দেখবেন"।

৪. যদিও আল্লাহর নাফরমানীতে লিপ্ত সকলের উদ্দেশ্যে এখানে বলা হতে পারে তবুও বিশেষভাবে এখানে বক্তব্যের লক্ষ্য হচ্ছে, কুরাইশদের সেই জালেম নেতৃবর্গ যারা ইসলামের বিরোধিতায় নেমে ইসলাম গ্রহণকারীদের ওপর নিগ্রহ চালাবার ক্ষেত্রে অগ্রবর্তী ছিল, যেমন ওয়ালীদ ইবনে মুগীরাহ, আবু জেহেল, উতবাহ, শাইবাহ, উকবাহ ইবনে আবু মু'আইত, হানযালা ইবনে ওয়াইল এবং আরো অনেকে। এখানে পূর্বাপর

www.pathagar.com

বক্তব্যের স্বতস্ফূর্তদাবী এই যে, পরীক্ষা তথা বিপদ-মুসিবত ও জুলুম-নিপীড়নের মুকাবিলায় মুসলমানদেরকে সবর ও দৃঢ়তা অবলম্বন করার নির্দেশ দেবার পর এ সত্যপন্থীদের ওপর যারা জুলুম-নিপীড়ন চালাচ্ছিল তাদেরকে সম্বোধন করে ভীতি ও হুমকিমূলক কিছু কথাও বলা হোক।

৫. এ অর্থও হতে পারে, "আমার পাকড়াও এড়িয়ে অন্য কোথাও পালিয়ে যেতে পারবে"। মূল শব্দ হচ্ছে 'ইয়াসবিকূনা' অর্থাৎ আমার থেকে এগিয়ে যাবে। এর দুটি অর্থ হতে পারে। একটি অর্থ হচ্ছে, যা কিছু আমি করতে চাই (অর্থাৎ আমার রাসূলদের মিশনের সাফল্য) তা করতে আমার সফল না হওয়া এবং যা কিছু তারা করতে চায় (অর্থাৎ আমার রাসূলকে হেয় প্রতিপন্ন করা)তা করতে সফল হওয়া। দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, তাদের বাড়াবাড়ির জন্য আমি তাদেরকে পাকড়াও করতে চাই এবং তারা পালিয়ে আমার ধরা ছোঁয়ার বাইরে চলে যায়।

৬. অর্থাৎ যে ব্যক্তি পরকালীন জীবনে বিশ্বাসই করে না এবং মনে করে, কারো সামনে নিজের কাজের জবাবদিতি করতে হবে না এবং এমন কোন সময় আসবে না যখন নিজের জীবনের যাবতীয় কাজের কোন হিসেব-নিকেশ দিতে হবে, তার কথা আলাদা। সে নিজের গাফলতির মধ্যে পড়ে থাকুক এবং নিশ্চিন্তে যা করতে চায় করে যাক। নিজের আন্দাজ-অনুমানের বিপরীতে নিজের পরিণাম সে নিজেই দেখে নেবে। কিন্তু যারা আশা রাখে, এক সময় তাদেরকে তাদের মা'বুদের সামনে হাজির হতে হবে এবং নিজের কর্ম অনুযায়ী পুরষ্কার ও শাস্তি পেতে হবে, তাদের তো মনে করা উচিত, সে সময় অতি নিকটেই এসে গেছে এবং কাজের অবকাশ খতম হবারই পথে। তাই নিজের শুভ পরিণামের জন্য তারা যা কিছু করতে চায় করে ফেলুক। দীর্ঘ জীবন-কালের ভিত্তিহীন নির্ভরতার ওপর ভরসা করে নিজের সংশোধনে বিলম্ব করা উচিত নয়।

৭. অর্থাৎ তাদের এ ভুল ধারণাও পোষণ করা উচিত নয় যে, এমন কোন বাদশাহর সাথে তাদের ব্যাপার জড়িত, যিনি বিভিন্ন ব্যাপারের কোন খোঁজ খবর রাখেন না। যে আল্লাহর সামনে তাদের জবাবদিহি করার জন্য হাজির হতে হবে তিনি বে-খবর নন বরং সবকিছু শোনেন ও জানেন। তাঁর কাছে তাদের কোন কথা গোপন নেই।

৮. '"মুজাহাদা" শব্দটির মূল অর্থ হচ্ছে, কোন বিরোধী শক্তির মোকাবিলায় দ্বন্দ্ব, সংগ্রাম, প্রচেষ্টা ও সাধনা করা। আর যখন কোন বিশেষ বিরোধী শক্তি চিহ্নিত করা হয় না বরং সাধারণভাবে "মুজাহাদা" শব্দ ব্যবহার করা হয় তখন এর অর্থ হয় একটি সর্বাত্মক ও সর্বব্যাপী দ্বন্দ্ব-সংঘাত। মু'মিনকে এ দুনিয়ায় যে দ্বন্দ্ব-সংগ্রাম করতে হয় তা হচ্ছে এ ধরনের। তাকে শয়তানের সাথেও লড়াই করতে হয়, যে তাকে সর্বক্ষণ সৎকাজের ক্ষতির ভয় দেখায় এবং অসৎকাজের লাভ ও স্বাদ উপভোগের লোভ দেখিয়ে বেড়ায়। তাকে নিজের নফসের বা কু-প্রবৃত্তির সাথেও লড়তে হয়, যে তাকে সর্বক্ষণ নিজের খারাপ ইচ্ছা-আকাঙ্খার দাসে পরিণত করে রাখার জন্য জোর দিতে থাকে। নিজের গৃহ থেকে নিয়ে বিশ্ব-সংসারের এমন সকল মানুষের সাথে তাকে লড়তে হয় যাদের আদর্শ,

www.pathagar.com

মতবাদ, মানসিক প্রবণতা, চারিত্রিক নীতি, রসম-রেওয়াজ, সাংস্কৃতিক ধারা এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিধান সত্য দ্বীনের সাথে সংঘর্ষশীল। তাকে এমন রাষ্ট্রের সাথেও লড়তে হয় যে আল্লাহর আনুগত্যমুক্ত থেকে নিজের ফরমান জারী করে এবং সততার পরিবর্তে অসততাকে বিকশিত করার জন্য শক্তি নিয়োগ করে। এ প্রচেষ্টা-সংগ্রাম এক-দু'দিনের নয়, সারাজীবনের। দিন-রাতের চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে প্রতি মুহূর্তের। কোন একটি ময়দানে নয় বরং জীবনের প্রত্যেকটি ময়দানের ও প্রতিটি দিকে। এ সম্পর্কেই হযরত হাসান বাসরী (র) বলেন: "মানুষ যুদ্ধ করে চলে, যদিও কখনো একবারও তাকে তলোয়ার চালাতে হয় না"।

৯. অর্থাৎ আল্লাহ এ জন্য তোমাদের কাছে এ দ্বন্দ্ব-সংগ্রামের দাবী করছেন না যে, নিজের সার্বভৌম কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করার ও প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য তোমাদের সাহায্যের প্রয়োজন এবং তোমাদের এ যুদ্ধ ছাড়া তার ইলাহী শাসন চলবে না, বরং এটিই তোমাদের উন্নতি ও অগ্রগতির পথ, তাই তিনি তোমাদের এ দ্বন্দ্ব-সংগ্রামে লিপ্ত হবার নির্দেশ দিচ্ছেন। এ পথেই তোমরা দুস্কৃতি ও ভ্রষ্টতার ঘূর্ণাবর্ত থেকে বের হয়ে সৎকর্মশীলতা ও সত্যতার পথে চলতে পারবে। এ পথে অগ্রসর হয়ে তোমরা এমন শক্তির অধিকারী হতে পারো যার ফলে দুনিয়ায় তোমরা কল্যাণ ও সুকৃতির ধারক এবং পরকালে আল্লাহর জান্নাতের অধিকারী হবে। এ সংগ্রাম ও যুদ্ধ চালিয়ে তোমরা আল্লাহর কোন উপকার করবে না বরং তোমরা নিজেরাই উপকৃত হবে।

১০. ঈমান অর্থ এমন সব জিনিসকে আন্তরিকভাবে মেনে নেয়া, যেগুলো মেনে নেবার জন্য আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তাঁর কিতাব দাওয়াত দিয়েছে। আর সৎকাজ হচ্ছে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করা। মানুষের চিন্তাধারা, ধারণা-কল্পনা ও ইচ্ছার পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতাই হচ্ছে মন ও মস্তিষ্কের সৎকাজ। খারাপ কথা না বলা এবং হক-ইনসাফ ও সত্য-সততা অনুযায়ী সব কথা বলাই হচ্ছে কর্ণের সৎকাজ। আর মানুষের সমগ্র জীবন আল্লাহর আনুগত্য ও বন্দেগীর মধ্যে এবং তার বিধানসমূহ মেনে চলে অতিবাহিত করাই হচ্ছে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও ইন্দ্রিয়ের সৎকাজ। এ ঈমান ও সৎকাজের দুটি ফল বর্ণনা করা হয়েছে।

এক: মানুষের দুস্কৃতি ও পাপগুলো তার থেকে দূর করে দেয়া হবে।

দুই: তার সর্বোত্তম কাজসমূহের সর্বোত্তম পুরস্কার তাকে দেয়া হবে।

পাপ ও দস্কৃতির কয়েকটি অর্থ হয়। একটি অর্থ হচ্ছে, ঈমান আনার আগে মানুষ যতই পাপ করে থাকুক না কেন ঈমান আনার সাথে সাথেই তা সব মাফ হয়ে যাবে। দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, ঈমান আনার পর মানুষ বিদ্রোহ প্রবণতা সহকারে নয় বরং মানবিক দুর্বলতা বশত: যেসব ভুল-ত্রুটি করে থাকে, তার সৎকাজের প্রতি নজর রেখে সেগুলো উপেক্ষা করা হবে। তৃতীয় অর্থ হচ্ছে, ঈমান ও সৎকর্মশীলতার জীবন অবলম্বন করার কারণে আপনা-আপনিই মানুষের নফসের সংশোধন হয়ে যাবে এবং তার অনেকগুলো দুর্বলতা দূর হয়ে যাবে। ঈমান ও সৎকাজের প্রতিদান সম্পর্কে যে কথা বলা হয়েছে তা হচ্ছে:

www.pathagar.com

"লা নাজঝিয়ান্নাহুম আহসানাল্লাযী কানু ইয়া'মালুন"।
এর দুটি অর্থ হয়। একটি হচ্ছেঃ মানুষের সৎকাজগুলোর মধ্যে যেটি হবে সবচেয়ে ভালো সৎকাজ, তাকে সামনে রেখে তার জন্য প্রতিদান ও পুরষ্কার নির্ধারণ করা হবে। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, মানুষ তার কার্যাবলীর দৃষ্টিতে যতটা পুরষ্কারের অধিকারী হবে তার চেয়ে বেশি ভালো পুরষ্কার তাকে দেয়া হবে। একথাটি কুরআনের অন্যান্য স্থানেও বলা হয়েছেঃ
"যে ব্যক্তি সৎকাজ নিয়ে আসবে তাকে তার থেকে দশগুণ বেশি দেয়া হবে"। (আনআমঃ ১৬০ আয়াত)
সূরা আল কাসাসে বলা হয়েছেঃ "যে ব্যক্তি সৎকাজ নিয়ে আসবে তাকে তার চেয়ে উত্তম প্রতিদান দেয়া হবে"।
সূরা নিসায় বলা হয়েছেঃ "আল্লাহ তো কণামাত্র ও জুলুম করেন না এবং সৎকাজ হলে তাকে কয়েকগুণ বাড়িয়ে দেন"।
১১. এ আয়াতটি সম্পর্কে মুসলিম, তিরমিযী, আহমাদ, আবু দাউদ ও নাসাঈর বর্ণনা হচ্ছে, এটি হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস এর ব্যাপারে নাযিল হয়। তার বয়স যখন আঠারো উনিশ বছর তখন তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তার মা হামনা বিনতে সুফিয়ান (আবু সুফিয়ানের ভাইঝি) যখন জানতে পারে যে, তার ছেলে মুসলমান হয়ে গেছে তখন সে বলে, যতক্ষণ না তুমি মুহাম্মদকে অস্বীকার করবে ততক্ষণ আমি কিছুই পানাহার করবো না এবং ছায়াতেও বসবো না। মায়ের হক আদায় করা তো আল্লাহর হুকুম। কাজেই তুমি আমার কথা না মানলে আল্লাহরও নাফরমানী করবে। একথায় হযরত সা'দ অত্যন্ত পেরেশান হয়ে পড়েন। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) এর দরবারে হাজির হয়ে নিজের ঘটনা বর্ণনা করেন। এ ঘটনায় এ আয়াত নাযিল হয়। মক্কা মুআ'যযামার প্রথম যুগে যেসব যুবক ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন হতে পারে তারাও একই ধরনের অবস্থার মুখোমুখি হয়েছিলেন। তাই সূরা লুকমানেও পূর্ণ শক্তিতে এ বক্তব্যটির পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে।
আলোচ্য সূরার ১৫ আয়াতে বলা হয়েছে, সৃষ্ট জীবের মধ্যে মানুষের মধ্যে মানুষের ওপর মা-বাপের হক হচ্ছে সবচেয়ে বেশি। কিন্তু সেই মা-বাপই যদি মানুষকে শিরক করতে বাধ্য করে তাহলে তাদের কথা মেনে নেয়া উচিত নয়। কাজেই এ ক্ষেত্রে অন্য কারো কথায় মানুষের এ ধরনের শিরক করার কোন প্রশ্নই ওঠে না। তারপর শব্দগুলি হচ্ছেঃ 'ওয়া ইন জাহাদাকা' অর্থাৎ যদি তারা দু'জন তোমাকে বাধ্য করার জন্য তাদের পূর্ণশক্তি নিয়োগ করে। এ থেকে জানা গেল, কম পর্যায়ের চাপ প্রয়োগ বা বাপ-মায়ের মধ্য থেকে কোন একজনের চাপ প্রয়োগ আরো সহজে প্রত্যাখান করার যোগ্য। এই সঙ্গে "যাকে তুমি আমার শরীক হিসেবে জানো না" বাক্যাংশটিও অনুধাবনযোগ্য। এর মধ্যে তাদের কথা না মানার স্বপক্ষে একটি শক্তিশালী যুক্তি প্রদান করা হয়েছে। অবশ্যই এটা পিতা-মাতার অধিকার যে, ছেলেমেয়েরা তাদের সেবা করবে, তাদেরকে

www.pathagar.com

সম্মান ও শ্রদ্ধা করবে এবং বৈধ বিষয়ে তাদের কথা মেনে চলবে। কিন্তু তাদেরকে এ অধিকার দেয়া হয়নি যে, মানুষ নিজের জ্ঞানের বিরুদ্ধে তাদের অন্ধ অনুসরণ করবে। শুধমাত্র বাপ-মায়ের ধর্ম বলেই তাদের ছেলে বা মেয়ের সেই ধর্ম মেনে চলার কোন কারণ নেই। সন্তান যদি এ জ্ঞান লাভ করে যে, তার বাপ-মায়ের ধর্ম ভুল ও মিথ্যা তাহলে তাদের ধর্ম পরিত্যাগ করে তার সঠিক ধর্ম গ্রহণ করা উচিত এবং তাদের চাপ প্রয়োগের পরও যে পথের ভ্রান্তি তার কাছে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে সে পথ অবলম্বন করা তার উচিত নয়। বাপ-মায়ের সাথে যখন এ ধরনের ব্যবহার করতে হবে তখন দুনিয়ার প্রত্যেক ব্যক্তির সাথেও এ ব্যবহার করা উচিত। যতক্ষণ না কোন ব্যক্তির সত্য পথে থাকা সম্পর্কে জানা যাবে ততক্ষণ তার অনুসরণ করা বৈধ নয়।

১২. অর্থাৎ এ দুনিয়ার আত্মীয়তা এবং আত্মীয়দের অধিকার কেবলমাত্র এ দুনিয়ার সীমা-ত্রিসীমা পর্যন্তই বিস্তৃত। সবশেষে পিতা-মাতা ও সন্তান সবাইকে তাদের স্রষ্টার কাছে ফিরে যেতে হবে। সেখানে তাদের প্রত্যেকের জবাবদিহি হবে তাদের ব্যক্তিগত দায়িত্বের ভিত্তিতে। যদি পিতা-মাতা সন্তানকে পথভ্রষ্ট করে থাকে তাহলে তারা পাকড়াও হবে। যদি সন্তান পিতা-মাতার জন্য পথ ভ্রষ্টতা গ্রহণ করে থাকে তাহলে তাকে শাস্তি পেতে হবে। আর সন্তান যদি সঠিক পথ অবলম্বন করে থাকে এবং পিতা-মাতার বৈধ অধিকার আদায় করার ক্ষেত্রেও কোন প্রকার ত্রুটি না করে থাকে কিন্তু পিতা-মাতা কেবলমাত্র পথভ্রষ্টতার ক্ষেত্রে তাদের সহযোগী না হবার কারণে তাকে নির্যাতন করে থাকে, তাহলে তারা আল্লাহর পাকড়াও থেকে বাঁচতে পারবে না।

১৩. যদিও বক্তা এক ব্যক্তি মাত্র কিন্তু সে "আমি ঈমান এনেছি" বলার পরিবর্তে বলছে, "আমরা ঈমান এনেছি"। ইমাম রাযী এর মধ্যে একটি সূক্ষ্ম অর্থের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। তিনি বলেন, মুনাফিক সবসময় নিজেকে মু'মিনদের মধ্যে শামিল করার চেষ্টা করে থাকে এবং নিজের ঈমানের উল্লেখ এমনভাবে করে থাকে যাতে মনে হয় সেও ঠিক অন্যদের মতই মু'মিন। এর দৃষ্টান্ত হচ্ছে, যেমন কোন কাপুরুষ যদি কোন সেনাদলের সাথে গিয়ে থাকে এবং সেনাদলের অসম সাহসী সৈনিকেরা লড়াই করে শত্রুদলকে বিতাড়িত করে দিয়ে থাকে তাহলে কাপুরুষটি নিজে কোন কাজে অংশ গ্রহণ না করে থাকলেও সে এসে লোকদেরকে বলবে, আমরা গিয়েছি, আমরা ভীষণ যুদ্ধ করেছি এবং শত্রুকে পরাস্ত করেছি। অর্থাৎ সেও যেন সেই অমিত সাহসী যোদ্ধাদের সাথে মিলে যুদ্ধ করেছিল।

১৪. অর্থাৎ আল্লাহর আযাবের ভয়ে যেমন কুফরী ও গোনাহ থেকে বিরত থাকা উচিত এ ব্যক্তি ঠিক তেমনি বান্দা প্রদত্ত নির্যাতন-নিগ্রহের ভয়ে ঈমান ও সৎকাজ থেকে বিরত হয়েছে। ঈমান আনার পর যখন সে কাফেরদের হুমকি, মারধর ও কারানির্যাতনের সম্মুখীন হয় তখন সে মনে করে মরে যাবার পর কুফরীর অপরাধে যে জাহান্নামের আযাব ভোগ করতে হবে আল্লাহর সেই জাহান্নামের আযাব কিছুটা এ ধরনেরই হবে। তাই সে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, সে আযাব তো পরে ভোগ করবো কিন্তু এখন নগদ আযাব

www.pathagar.com

যা পাচ্ছি তার হাত থেকে নিস্তার লাভ করার জন্য আমাকে ঈমান ত্যাগ করে কুফরীর মধ্যে চলে যাওয়া উচিত। এভাবে দুনিয়ার জীবনটাতো নিশ্চিন্তে আরামের মধ্য দিয়ে কেটে যাবে।

১৫. অর্থাৎ আজ সে নিজেকে বাঁচাবার জন্য কাফেরদের সাথে যোগ দিয়েছে এবং মু'মিনদের পক্ষ ত্যাগ করেছে। কারণ সত্য দ্বীনের সম্প্রসারণের জন্য নিজের গায়ে আঁচড়টি লাগাতেও প্রস্তুত নয় কিন্তু যখন এ দ্বীনের জন্য জীবন উৎসর্গকারীদেরকে আল্লাহ সাফল্য ও বিজয়- দান করবেন তখন এ ব্যক্তি বিজয়ের ফল ভাগ করে নেবার জন্য এসে যাবে এবং মুসলমানদের বলবে, আমি তো মনে প্রাণে তোমাদেরই সাথে ছিলাম, তোমাদের সাফল্যের জন্য দোয়া করেছিলাম এবং তোমাদের প্রচেষ্টা, সংগ্রাম ও কুরবানীকে আমি বিরাট মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখেছি।

এ প্রসঙ্গে আরো এতটুকু কথা জেনে রাখতে হবে যে, অসহনীয় নিপীড়ন, ক্ষতি বা মারাত্মক ভীতিজনক অবস্থায় কোন ব্যক্তির কুফরী কথা বলে নিজেকে রক্ষা করা শরীয়াতের দৃষ্টিতে জায়েয। তবে এ জন্য শর্ত হচ্ছে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে আন্তরিকতা সহকারে ঈমানের ওপর অবিচল থাকতে হবে। কিন্তু যে আন্তরিকতা সম্পন্ন মুসলমানটি অক্ষম অবস্থায় প্রাণ বাঁচাবার জন্য কুফরী প্রকাশ করে এবং যে সুবিধাবাদী লোকটি আদর্শ ও মতবাদ হিসেবে ইসলামকে সত্য জানে এবং সে হিসেবে তাকে মানে কিন্তু ঈমানী জীবনধারার বিপদ ও বিঘ্ন-বিপত্তি দেখে কাফেরদের সাথে হাত মিলায় তাদের দু'জনের মধ্যে ফারাকটি অনেক বড়। আপাত দৃষ্টিতে তাদের দু'জনের অবস্থা পরস্পর থেকে কিছু বেশি ভিন্ন মনে হবে না কিন্তু আসলে যে জিনিসটি তাদের মধ্যে আকাশ পাতালের ব্যবধান সৃষ্টি করে সেটি হচ্ছে এই যে, বাধ্য হয়ে কুফরীর প্রকাশকারী আন্তরিকতা সম্পন্ন মুসলমানটি কেবলমাত্র আক্বীদার দিক দিয়ে ইসলামের ভক্ত থাকে না বরং কার্যতও তার আন্তরিক সহানুভূতি ইসলাম ও মুসলমানদের সাথেই থাকে। তাদের সাফল্যে সে খুশি হয় এবং তাদের ব্যর্থতা তাকে অস্থির করে তোলে। অক্ষম অবস্থায়ও সে মুসলমানদের সাহায্য করার কয়েকটি সুযোগের সদ্ব্যবহার করে। তার ওপর ইসলামের শত্রুদের বাঁধন যখনই ঢিলে হয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গেই সে মুসলমানদের সাথে যোগ দেয়, এ সুযোগের অপেক্ষায়ই সে থাকে। পক্ষান্তরে সুযোগ সন্ধানী লোক যখনই দেখে ইসলামের পথ কঠিন হয়ে গেছে এবং খুব ভালভাবে মাপজোক করে দেখে নেয়, ইসলামের সহযোগী হবার ক্ষতি কাফেরদের সাথে সহযোগিতা করার লাভের চেয়ে বেশি তখনই সে নিছক নিরাপত্তা ও লাভের খাতিরে ইসলাম ও মুসলমানদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব পূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করে। নিজের স্বার্থসিদ্ধির লক্ষ্যে তাদের জন্য এমন কোন কাজ করতে সে পিছপা ও হয় না যা ইসলামের মারাত্মক বিরোধী এবং মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। কিন্তু এই সাথে হয়তো কোন সময় ইসলামের বিজয় সাধিত হতে পারে, এ সম্ভাবনার দিক থেকেও সে একেবারে চোখ বন্ধ করে রাখে না। তাই যখনই মুসলমানদের সাথে কথা বলার সুযোগ হয় তখনই সে তাদের আদর্শকে সত্য বলে মেনে নেবার, তাদের সামনে নিজের

www.pathagar.com

ঈমানের অঙ্গীকার করে এবং সত্যের পথে ত্যাগ ও কুরবানীর জন্য তাদেরকে বাহবা দেবার ব্যাপারে একটুও কার্পণ্য করে না। এ মৌখিক স্বীকৃতিকে প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করে প্রয়োজনের সময় সে তাকে কাজে লাগাতে চায়। কুরআন মাজীদে অন্য এক জায়গায় মুনাফিকদের এ বেনিয়া মানসিকতাকে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছেঃ

"এরা হচ্ছে এমন সব লোক যারা তোমাদের ব্যাপারে অপেক্ষা করছে (অর্থাৎ দেখছে, অবস্থা কোনদিকে মোড় নেয়)। যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের বিজয় হয়, তাহলে এসে বলবে, আমরা কি তোমাদের সাথে ছিলাম না। আর যদি কাফেরদের পাল্লা ভারী থাকে, তাহলে তাদেরকে বলবে, আমরা কি তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে সক্ষম ছিলাম না এবং এরপরও তোমাদেরকে মুসলমানদের হাত থেকে বাঁচাইনি। (আন নিসাঃ ১৪১)

১৬. অর্থাৎ মু'মিনদের ঈমান ও মুনাফিকদের মুনাফিকির অবস্থা যাতে উন্মুক্ত হয়ে যায় এবং যার মধ্যে যা কিছু লুকিয়ে আছে সব সামনে এসে যায় সে জন্য আল্লাহ বার বার পরীক্ষার ব্যবস্থা করেন। একথাটিই সূরা আলে ইমরানে বলা হয়েছেঃ
"আল্লাহ মু'মিনদেরকে কখনো এমন অবস্থায় থাকতে দেবেন না, যে অবস্থায় এখন তোমরা আছো (অর্থাৎ সাচ্চা ঈমানদার ও মুনাফিক সবাই মিশ্রিত হয়ে আছো) তিনি পবিত্র লোকদেরকে অপবিত্র লোকদের থেকে সুস্পষ্ট ভাবে আলাদা করে দেবেন"। (আয়াতঃ ১৭৯

www.pathagar.com

২৫ রামাদান
বিষয়: অনুপম উপদেশ
সূরা লোকমান: ১২-১৯

وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (12) وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ (13) وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ (14) وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (15) يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ (16) يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (17) وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ (18) وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ (19)

১২) আমি [১৭] লুকমানকে দান করেছিলাম সূক্ষ্মজ্ঞান। যাতে সে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হয়। [১৮] যে ব্যক্তি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে তার কৃতজ্ঞতা হবে তার নিজেরই জন্য লাভজনক। আর যে ব্যক্তি কুফরী করবে, সে ক্ষেত্রে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ অমুখাপেক্ষী এবং নিজে নিজেই প্রশংসিত। [১৯] ১৩) স্মরণ করো যখন লুকমান নিজের ছেলেকে উপদেশ দিচ্ছিল, সে বললো, "হে পুত্র! আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করো না। [২০] যথার্থই শিরক অনেক বড় জুলুম। [২১] ১৪) আর [২২] প্রকৃতপক্ষে আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার হক চিনে নেবার জন্য নিজেই তাকিদ করেছি। তার মা দুর্বলতা সহ্য করে তাকে নিজের গর্ভে ধারণ করে এবং দু'বছর লাগে তার দুধ ছাড়তে। [২৩] (এ জন্য আমি তাকে উপদেশ দিয়েছি) আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো এবং নিজের পিতা-মাতার প্রতিও, আমার দিকেই তোমাকে ফিরে আসতে হবে। ১৫) কিন্তু যদি তারা তোমার প্রতি আমার সাথে এমন কাউকে শরীক করার জন্য চাপ দেয় যাকে তুমি জানো না, [২৪] তাহলে তুমি তাদের কথা কখনোই মেনে নিয়ো না। দুনিয়ায় তাদের সাথে সদাচার করতে থাকো কিন্তু মেনে চলো সে ব্যক্তির পথ যে আমার দিকে ফিরে এসেছে। তারপর তোমাদের সবাইকে ফিরে আসতে হবে আমারই দিকে। [২৫] সে সময় তোমরা কেমন কাজ করছিলে তা আমি তোমাদের জানিয়ে দেবো। [২৬] ১৬) (আর লুকমান [২৭]

www.pathagar.com

বলেছিল) " হে পুত্র! কোন জিনিস যদি সরিষার দানা পরিমাণও হয় এবং তা লুকিয়ে থাকে পাথরের মধ্যে , আকাশে বা পৃথিবীতে কোথাও, তাহলে আল্লাহ তা বের করে নিয়ে আসবেন। [২৮] তিনি সূক্ষ্মদর্শী এবং সবকিছু জানেন। ১৭) হে পুত্র! নামায কায়েম করো, সৎকাজের হুকুম দাও, খারাপ কাজে নিষেধ করো এবং যা কিছু বিপদই আসুক সে জন্য সবর করো। [২৯] একথাগুলোর জন্য বড়ই তাকিদ করা হয়েছে। [৩০] ১৮) আর মানুষের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে কথা বলো না, [৩১] পৃথিবীর বুকে চলো না উদ্ধত ভঙ্গিতে, আল্লাহ পছন্দ করেন না আত্মম্ভরী ও অহংকারীকে। [৩২] ১৯) নিজের চলনে ভারসাম্য আনো [৩৩] এবং নিজের আওয়াজ নীচু করো। সব আওয়াজের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ হচ্ছে গাধার আওয়াজ। [৩৪]

আয়াত সমূহের ব্যাখ্যা

১৭. একটি শক্তিশালী বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তির মাধ্যমে শিরকের অসারতা প্রমাণ করার পর এখন আরবের লোকদেরকে একথা জানানো হচ্ছে যে, এ যুক্তিসঙ্গত কথা প্রথমবার তোমাদের সামনে তোলা হচ্ছে না বরং পূর্বেও বুদ্ধিমান ও জ্ঞানীরা একথাই বলে এসেছেন এবং তোমাদের নিজেদের বিখ্যাত জ্ঞানী লুকমান আজ থেকে বহুকাল আগে একথাই বলে গেছেন। তাই শিরক যদি কোন অযৌক্তিক বিশ্বাস হয়ে থাকে তাহলে ইতিপূর্বে কেউ একথা বলেনি কেন, মুহাম্মদ (সা) এর দাওয়াতের জবাবে তোমরা একথা বলতে পারো না।

একজন বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী হিসেবে আরবে লুকমান বহুল পরিচিত ব্যক্তিত্ব। জাহিলী যুগের কবিরা যেমন ইমরাউল কায়েস, লবীদ, আ'শা, তারাফাহ প্রমুখ তাদের কবিতায় তার কথা বলা হয়েছে। আরবের কোন কোন লেখাপড়া জানা লোকের কাছে "সহীফা লুকমান" নামে তার জ্ঞানগর্ভ উক্তির একটি সংকলন পাওয়া যেতো। হাদীসে উদ্ধৃত হয়েছে, হিজরতের তিন বছর পূর্বে মদীনার সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি নবী (সা) এর দাওয়াতের প্রভাবিত হন তিনি ছিলেন সুওয়াইদ ইবনে সামেত। তিনি হজ্জ সম্পাদন করার জন্য মক্কায় যান। সেখানে নবী করীম (সা) নিজের নিয়ম মতো বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত হাজীদের আবাসস্থলে গিয়ে ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেককে ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকেন। এ প্রসঙ্গে সুওয়াইদ যখন নবী (সা) এর বক্তৃতা শুনেন, তাকে বলেন, আপনি যে ধরনের কথা বলেছেন তেমনি ধরনের একটি জিনিস আমার কাছেও আছে। তিনি জিজ্ঞেস করেন, সেটা কি? জবাব দেন সেটা লুকমানের পুস্তিকা। তারপর নবী করীমের (সা) অনুরোধে তিনি তার কিছু অংশ পাঠ করে তাকে শুনান। তিনি বলেন, এটা বড়ই চমৎকার কথা। তবে আমার কাছে এর চেয়েও বেশি চমৎকার কথা আছে। এরপর কুরআন শুনান। কুরআন শুনে সুওয়াইদ অবশ্যই স্বীকার করেন, নিঃসন্দেহে এটা লুকমানের পুস্তিকার চেয়ে ভালো। (সীরাতে ইবনে হিশাম, ২ খন্ড, ৬৭-৬৯ পৃ; উসুদুল গাবাহ, ২ খন্ড, ৩৭৮ পৃষ্ঠা)

www.pathagar.com

ঐতিহাসিকগণ বলেন, এই সুওয়াইদ ইবনে সামেত তার যোগ্যতা, বীরত্ব, সাহিত্য ও কাব্য মনীষা এবং বংশ মর্যাদার কারণে মদীনায় "কামেল" নামে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু নবী (সা) এর সাথে সাক্ষাতের পর যখন তিনি মদীনায় ফিরে যান তার কিছুদিন পর বুয়াসের যুদ্ধ শুরু হয়ে যায় এবং তাতে তিনি মারা যান। তার গোত্রের লোকদের সাধারণভাবে এ ধারণা ছিল যে, নবী (সা) এর সাক্ষাতের পর তিনি মুসলমান হয়ে যান। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে লুকমানের ব্যক্তিত্বের ব্যাপারে ব্যাপক মতবিরোধ দেখা যায়। জাহেলিয়াতের অন্ধকার যুগে কোন লিখিত ইতিহাসের অস্তিত্ব ছিল না। শত শত বছর থেকে মুখে মুখে শ্রুত যেসব তথ্য স্মৃতির ভান্ডারে লোককাহিনী গল্প-গাঁথার আকারে সংগৃহীত হয়ে আসছিল সেগুলোর ওপর ছিল এর ভিত্তি। এসব বর্ণনার প্রেক্ষিতে কেউ কেউ হযরত লকুমানকে আ'দ জাতির অন্তর্ভুক্ত ইয়ামেনের বাদশাহ মনে করতো। মাওলানা সাইয়েদ সুলাইমান নদভী এসব বর্ণনার ওপর নির্ভর করে তার "আরদুল কুরআন" গ্রন্থে এ মত প্রকাশ করেছেন যে, আ'দ জাতির ওপর আল্লাহর আযাব নাযিল হবার পর হযরত হুদের (আ) সাথে তাদের যে ঈমানদার অংশটি বেঁচে গিয়েছিল লুকমান ছিলেন তাদেরই বংশোদ্ভূত। ইয়ামেনে এ জাতির যে শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তিনি ছিলেন তার অন্যতম শাসক ও বাদশাহ। কিন্তু কতিপয় প্রবীণ সাহাবী ও তাবেঈদের মাধ্যমে প্রাপ্ত অন্য বর্ণনাগুলো এর সম্পূর্ণ বিপরীত। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, লুকমান ছিলেন একজন হাবশী গোলাম। হযরত আবু হুরায়রা (রা), মুজাহিদ, ইকরিমাহ ও খালেদুর রাব'ঈও একথাই বলেন। হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ আনসারী (রা) বলেন, তিনি ছিলেন নূবার অধিবাসী। সাঈদ ইবনে মুসাইয়েবের উক্তি হচ্ছে, তিনি মিসরের কালো লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এ তিনটি বক্তব্য প্রায় কাছাকাছি অবস্থান করছে। কারণ আরবের লোকেরা কালো বর্ণের মানুষদেরকে সেকালে প্রায়ই হাবশী বলতো। আর নূবা হচ্ছে মিসরের দক্ষিণে এবং সুদানের উত্তরে অবস্থিত একটি এলাকা। তাই তিনটি উক্তিতে একই ব্যক্তিকে নূবী, মিসরীয় ও হাবশী বলা কেবলমাত্র শাব্দিক বিরোধ ছাড়া আর কিছুই নয়। অর্থের দিক দিয়ে এখানে কোন বিরোধ নেই। তারপর রাওদাতুল আনাফে সুহাইলির ও মরূজুয যাহাবে মাস'উদীর বর্ণনা থেকে এ সূদানী গোলামের কথা আরবে কেমন করে ছড়িয়ে পড়লো এ প্রশ্নের ওপরও আলোকপাত হয়। এ উভয় বর্ণনায় বলা হয়েছে, এ ব্যক্তি আসলে ছিলেন নূবী। কিন্তু তিনি বাসিন্দা ছিলেন মাদযান ও আইল (বর্তমান আকাবাহ) এলাকার। এ কারণে তার ভাষা ছিল আরবী এবং তার জ্ঞানের কথা আরবে ছড়িয়ে পড়ে। তাছাড়া সুহাইলী আরো বিস্তারিতভাবে বলেছেন যে, লুকমান হাকীম ও লুকমান ইবনে আদ দু'জন আলাদা ব্যক্তি। তাদেরকে এক ব্যক্তি মনে করা ঠিক নয়। (রাওদাতুল আনাফ, ১ম খন্ড, ২৬৬ পৃষ্ঠা এবং মাস'উদী: ১ম খন্ড, ৫৭ পৃষ্ঠা।)

এখানে একথাটিও সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে দেয়া প্রয়োজন যে, প্রাচ্যবিদ ডিরেনবুর্গ (Derenbourg) প্যারিস লাইব্রেরীর যে আরবী পান্ডুলিপিটি "লুকমান হাকীমের গাঁথা" নামে প্রকাশ করেছেন সেটি আসলে বানোয়াট। "লুকমানের সহীফা"র সাথে তার দূরতম

www.pathagar.com

কোন সম্পর্কও নেই। ত্রয়োদশ ঈসায়ী শতকে এ গাঁথাগুলো কেউ সংকলন করেছিলেন। তার আরবী সংস্করণ বড়ই ত্রুটিপূর্ণ। সেগুলো পড়লে পরিষ্কার অনুভব করা যাবে যে, আসলে অন্যকোন ভাষা থেকে অনুবাদ করে গ্রন্থকার নিজের পক্ষ থেকে সেগুলোর সম্পর্ক লুকমান হাকীমের সাথে জুড়ে দিয়েছেন। প্রাচ্যবিদরা এ ধরণের জাল ও বানোয়াট জিনিসগুলো বের করে যে উদ্দেশ্যে সামনে আনেন তা এ ছাড়া আর কিছুই নয় যে, কুরআন বর্ণিত কাহিনীগুলোকে যে কোনভাবেই অনৈতিহাসিক কাহিনী প্রমাণ করে অনির্ভরযোগ্য গণ্য করা। যে ব্যক্তিই ইনসাইক্লোপিডিয়া অব ইসলামে "লুকমান" শিরোনামে (B.Heller) হেলারের নিবন্ধটি পড়বেন তার কাছেই তাদের মনোভাব অস্পষ্ট থাকবে না।

১৮. অর্থাৎ আল্লাহ প্রদত্ত এ জ্ঞান ও অন্তরদৃষ্টির প্রাথমিক চাহিদা এই ছিল যে, মানুষ তার রবের মোকাবিলায় কৃতজ্ঞ ও অনুগৃহীত হবার নীতি অবলম্বন করবে, অনুগ্রহ অস্বীকার করার ও বিশ্বাসঘাতকতার নীতি অবলম্বন করবে না। আর তার কৃতজ্ঞতা নিছক মৌখিক হিসেব-নিকেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না।

১৯. অর্থাৎ যে ব্যক্তি কুফরী করে তার কুফরী তার নিজের জন্য ক্ষতিকর। এতে আল্লাহর কোন ক্ষতি হয় না। তিনি অমুখাপেক্ষী। কারো কৃতজ্ঞতার মুখাপেক্ষী নন। কারো কৃতজ্ঞতা তার সার্বভৌম কর্তৃত্বে কোন বৃদ্ধি ঘটায় না। বান্দার যাবতীয় নিয়ামত যে একমাত্র তার দান কারো অকৃতজ্ঞতা ও কুফরী এ জাজ্বল্যমান সত্যে কোন পরিবর্তন ঘটাতে পারে না। কেউ তার প্রশংসা করুক বা নাই করুক তিনি আপনা আপনিই প্রশংসিত। বিশ্ব-জাহানের প্রতিটি অণু-কণিকা তার পূর্ণতা ও সৌন্দর্য এবং তার স্রষ্টা ও অন্নদাতা হবার সাক্ষ্য দিচ্ছে এবং প্রত্যেকটি সৃষ্ট বস্তু নিজের সমগ্র সত্তা দিয়ে তার প্রশংসা গেয়ে চলেছে।

২০. লুকমানের পান্ডিত্যপূর্ণ উপদেশমালা থেকে এ বিশেষ উপদেশ বাণীটিকে এখানে উদ্ধৃত করা হয়েছে দুটি বিশেষ সম্পর্কের ভিত্তিতে। **এক:** তিনি নিজ পুত্রকে এ উপদেশটি দেন। আর একথা সুস্পষ্ট, মানুষ যদি দুনিয়ায় সবচেয়ে বেশি কারো ব্যাপারে আন্তরিক হতে পারে তাহলে সে হচ্ছে তার নিজের সন্তান। এক ব্যক্তি অন্যকে ধোঁকা দিতে পারে, তার সাথে মুনাফিকী আচরণ করতে পারে কিন্তু সবচেয়ে নিকৃষ্ট প্রকৃতির লোকটিও নিজ পুত্রকে এ নসীহত করা অকাট্যভাবে প্রমাণ করে যে, তার মতে শিরক যথার্থই একটি নিকৃষ্ট কাজ এবং এ জন্যই তিনি সর্বপ্রথম নিজের প্রাণাধিক পুত্রকে এ গোমরাহীটি থেকে দূরে থাকার উপদেশ দেন। **দুই:** মক্কার কাফেরদের অনেক পিতা-মাতা সে সময় নিজের সন্তানদেরকে শিরকী ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার এবং মুহাম্মদ (সা) এর তাওহীদের দাওয়াত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবার জন্য বাধ্য করছিল। সামনের দিকে একথা বর্ণনা করা হয়েছে। তাই সেই অজ্ঞদেরকে শুনানো হচ্ছে, তোমাদের দেশেরই বহুল পরিচিত জ্ঞানী পন্ডিত তো তার নিজের পুত্রের মঙ্গল করার দায়িত্বটা তাকে শিরক থেকে দূরে থাকার নসিহত করার মাধ্যমেই পালন করেন। এখন তোমরা যে তোমাদের সন্তানদেরকে শিরক করতে বাধ্য করছো, এটা কি তাদের প্রতি শুভেচ্ছা না তাদের অমঙ্গল কামনা।

www.pathagar.com

২১. জুলুমের প্রকৃত অর্থ হচ্ছে, কারো অধিকার হরণ করা এবং ইনসাফ বিরোধী কাজ করা। শিরক এ জন্য বৃহত্তর জুলুম যে, মানুষ এমন সব সত্তাকে তার নিজের স্রষ্টা, রিযিকদাতা ও নিয়ামতদানকারী হিসেবে বরণ করে নেয়, তার সৃষ্টিতে যাদের কোন অংশ নেই তাকে রিযিক দান করার ক্ষেত্রে যাদের কোন দখল নেই এবং মানুষ এ দুনিয়ায় যেসব নিয়ামত লাভে ধন্য হচ্ছে সেগুলো প্রদান করার ব্যাপারে যাদের কোন ভূমিকাই নেই। এটা এত অন্যায়, যার চেয়ে বড় কোন অন্যায়ের কথা চিন্তাই করা যায় না। তারপর মানুষ একমাত্র তার স্রষ্টারই বন্দেগী ও পূজা-অর্চনা করে তার অধিকার হরণ করে। তারপর স্রষ্টা ছাড়া অন্য সত্তার বন্দেগী ও পূজা করতে গিয়ে মানুষ যে কাজই করে তাতে সে নিজের দেহ ও মন থেকে শুরু করে পৃথিবী ও আকাশের বহু জিনিস ব্যবহার করে। অথচ এ সমস্ত জিনিস এক লা-শারীক আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন এবং এর মধ্যে কোন জিনিসকে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো বন্দেগীতে ব্যবহার করার অধিকার তার নেই। তারপর মানুষ নিজেকে লাঞ্ছনা ও দুর্ভোগের মধ্যে ঠেলে দেবে না, তার নিজের ওপর এ অধিকার রয়েছে। কিন্তু সে স্রষ্টাকে বাদ দিয়ে সৃষ্টির বন্দেগী করে নিজেকে লাঞ্ছিত ও অপমানিতও করে এবং এই সঙ্গে শাস্তির যোগ্যও বানায়। এভাবে একজন মুশরিকের সমগ্র জীবন একটি সর্বমুখী ও সার্বক্ষণিক জুলুমে পরিণত হয়। তার কোন একটি মুহূর্তও জুলুম মুক্ত নয়।

২২. এখান থেকে প্যারার শেষ পর্যন্ত অর্থাৎ ১৪ ও ১৫ আয়াত দুটি প্রসঙ্গক্রমে বলা হয়েছে। আল্লাহ নিজের পক্ষ থেকে লুকমানের উক্তির অতিরিক্ত ব্যাখ্যা হিসেবে একথা বলেছেন।

২৩. এ শব্দগুলো থেকে ইমাম শাফে'ঈ (র), ইমাম আহমাদ (র), ইমাম আবু ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র) এ অর্থ গ্রহণ করেছেন যে, শিশুর দুধ পান করার মেয়াদ ২ বছরে পূর্ণ হয়ে যায়। এ মেয়াদকালে কোন শিশু যদি কোন স্ত্রীলোকের দুধপান করে তাহলে দুধ পান করার "হুরমাত" (অর্থাৎ দুধপান করার কারণে স্ত্রীলোকটি তার মায়ের মর্যাদায় উন্নীত হয়ে যাওয়া এবং তার জন্য তার সাথে বিবাহ হারাম হয়ে যাওয়া) প্রমাণিত হয়ে যাবে। অন্যথায় পরবর্তীকালে কোন প্রকার দুধ পান করার ফলে কোন "হুরমাত" প্রতিষ্ঠিত হবে না। এ উক্তির স্বপক্ষে ইমাম মালেকেরও একটি বর্ণনা রয়েছে। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা (র) অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করার উদ্দেশ্যে এ মেয়াদকে বাড়িয়ে আড়াই বছর করার অভিমত ব্যক্ত করেন। এই সঙ্গে ইমাম সাহেব একথাও বলেন, যদি দু'বছর বা এর চেয়ে কম সময়ে শিশুর দুধ ছাড়িয়ে দেয়া হয় এবং খাদ্যের ব্যাপারে শিশু কেবল দুধের ওপর নির্ভরশীল না থাকে, তাহলে এরপর কোন স্ত্রীলোকের দুধ পান করার ফলে কোন দুধপান জনিত হুরমাত প্রমাণিত হবে না। তবে যদি শিশুর আসল খাদ্য দুধই হয়ে থাকে তাহলে অন্যান্য খাদ্য কম বেশি কিছু খেয়ে নিলেও এ সময়ের মধ্যে দুধ পানের কারণে হুরমাত প্রমাণিত হয়ে যাবে। কারণ শিশুকে অপরিহার্যভাবে দু'বছরেই দুধপান করাতে হবে, আয়াতের উদ্দেশ্য এটা নয়। সূরা

www.pathagar.com

বাক্বারায় বলা হয়েছে:"মায়েরা শিশুদেরকে পুরো দু'বছর দুধ পান করাবে, তার জন্য যে দুধপান করার মেয়াদ পূর্ণ করতে চায়" । (২৩৩ আয়াত)

ইবনে আব্বাস (রা) এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন এবং উলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে তার সাথে একমত হয়েছেন যে, গর্ভধারণের সর্বনিম্ন মেয়াদ ছ'মাস । কারণ কুরআনের অন্য এক জায়গায় বলা হয়েছে, "তার পেটের মধ্যে অবস্থান করা ও দুধ ছেড়ে দেয়ার কাজ হয় ৩০ মাসে । (আল আহকাফ, আয়াত ১৫) এটি একটি সূক্ষ্ম আইনগত বিধান এবং এর ফলে বৈধ ও অবৈধ গর্ভের অনেক বিতর্কের অবসান ঘটে ।

২৪. অর্থাৎ তোমার জানা মতে যে আমার সাথে শরীক নয় ।

২৫. অর্থাৎ সন্তান ও পিতা-মাতা সবাইকে ।

২৬. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা আনকাবূত, ১১ ও ১২ টীকা ।

২৭. লুকমানের অন্যান্য উপদেশমালার উল্লেখ এখানে একথা বলার জন্য করা হচ্ছে যে, আক্বীদা-বিশ্বাসের মতো নৈতিকতার যে শিক্ষা নবী (সা) পেশ করেছেন তাও আরবে নতুন ও অজানা কথা নয় ।

২৮. অর্থাৎ আল্লাহর জ্ঞান ও তাঁর পাকড়াও এর বাইরে কেউ যেতে পারে না । পাথরের মধ্যে ছোট্ট একটি কণা দৃষ্টির অগোচরে থাকতে পারে কিন্তু তার কাছে তা সুস্পষ্ট । আকাশ মন্ডলে একটি ক্ষুদ্রতম কণিকা তোমার থেকে বহু দূরবর্তী হতে পারে কিন্তু তা আল্লাহর বহু নিকটতর । ভূমির বহু নিম্নস্তরে পতিত কোন জিনিস তোমার কাছে গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত । কিন্তু তার কাছে তা রয়েছে উজ্জ্বল আলোর মধ্যে । কাজেই তুমি কোথাও কোন অবস্থায়ও এমন কোন সৎ বা অসৎ কাজ করতে পারো না যা আল্লাহর অগোচরে থেকে যায় । তিনি কেবল তা জানেন তাই নয় বরং যখন হিসেব-নিকেশের সময় আসবে তখন তিনি তোমাদের প্রত্যেকটি কাজের ও নড়াচড়ার রেকর্ড সামনে নিয়ে আসবেন ।

২৯. এর মধ্যে এদিকে একটি সূক্ষ্ম ইঙ্গিত রয়েছে যে, সৎকাজের হুকুম দেয়া এবং অসৎকাজে নিষেধ করার দায়িত্ব যে ব্যক্তিই পালন করবে তাকে অনিবার্যভাবে বিপদ আপদের মুখোমুখি হতে হবে । এ ধরনের লোকের পেছনে দুনিয়া কোমর বেঁধে লেগে যাবে এবং সব ধরনের কষ্টের সম্মুখীন তাকে হতেই হবে ।

৩০. এর দ্বিতীয় অর্থ হতে পারে, এটি বড়ই হিম্মতের কাজ । মানবতার সংশোধন এবং তার সংকট উত্তরণে সাহায্য করার কাজ কম হিম্মতের অধিকারী লোকদের পক্ষে সম্ভব নয় । এসব কাজ করার জন্য শক্ত বুকের পাটা দরকার ।

৩১. মূল শব্দগুলো হচ্ছে, "সা'আর" বলা হয় আরবী ভাষায় একটি রোগকে । এ রোগটি হয় উটের ঘাড়ে । এ রোগের কারণে উট তার ঘাড় সবসময় একদিকে ফিরিয়ে রাখে । এ থেকেই "অমুক ব্যক্তি উটের মতো তার মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে" । অর্থাৎ অহংকারপূর্ণ ব্যবহার করলো এবং মুখ ফিরিয়ে কথা বললো । এ ব্যাপারেই তাগলাব গোত্রের কবি আমর ইবনে হাই বলেন:

www.pathagar.com

"আমরা এমন ছিলাম কোন দাম্ভিক স্বৈরাচারী আমাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে কথা বললো তখন আমরা তার বক্রতার এমন দফারফা করলাম যে একেবারে সোজা হয়ে গেলো"।

৩২. মূল শব্দগুলো হচ্ছে مُخْتَالٌ ও فَخُوْر "মুখতাল" মানে হচ্ছে, এমন ব্যক্তি যে নিজেই নিজেকে কোন বড় কিছু মনে করে। আর ফাখূর তাকে বলে ,যে নিজের বড়াই করে অন্যের কাছে। মানুষের চালচলনে অহংকার, দম্ভ ও ঔদ্ধত্যের প্রকাশ তখনই অনিবার্য হয়ে উঠে, যখন তার মাথায় নিজের শ্রেষ্ঠত্বের বিশ্বাস ঢুকে যায় এবং সে অন্যদেরকে নিজের বড়াই ও শ্রেষ্ঠত্ব অনুভব করাতে চায়।

৩৩. কোন কোন মুফাসসির এর এই অর্থ গ্রহণ করেছেন যে, "দ্রুতও চলো না এবং ধীরেও চলো না বরং মাঝারি চলো"। কিন্তু পরবর্তী আলোচনা থেকে পরিষ্কার জানা যায়, এখানে ধীরে বা দ্রুত চলা আলোচ্য বিষয় নয়। ধীরে বা দ্রুত চলার মধ্যে কোন নৈতিক গুণ বা দোষ নেই এবং এ জন্য কোন নিয়মও বেঁধে দেয়া যায় না। কাউকে দ্রুত কোন কাজ করতে হলে সে দ্রুত ও জোরে চলবে না কেন। আর যদি নিছক বেড়াবার জন্য চলতে থাকে তাহলে এ ক্ষেত্রে ধীরে চলায় ক্ষতি কি। মাঝারি চালে চলার যদি কোন মানদন্ড থেকেই থাকে, তাহলে প্রত্যেক অবস্থায় প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য তাকে একটি সাধারণ নিয়মে পরিণত করা যায় কেমন করে। আসলে এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে, প্রবৃত্তির এমন অবস্থার সংশোধন যার প্রভাবে চলার মধ্যে দম্ভ অথবা দীনতার প্রকাশ ঘটে। বড়াই করার অহমিকা যদি ভেতরে থেকে যায় তাহলে অনিবার্যভাবে তা একটি বিশেষ ধরনের চাল-চলনের মাধ্যমে বের হয়ে আসে ; এ অবস্থা দেখে লোকটি যে কেবল অহংকারে মত্ত হয়েছে, একথাই জানা যায় না, বরং তার চাল-চলনের রং ঢং তার অহংকারের স্বরূপটিও তুলে ধরে। ধন-দৌলত, ক্ষমতা-কর্তৃত্ব, সৌন্দর্য, জ্ঞান, শক্তি এবং এ ধরনের অন্যান্য যতো জিনিসই মানুষের মধ্যে অহংকার সৃষ্টি করে তার প্রত্যেকটির দম্ভ তার চাল-চলনে একটি বিশেষ ভঙ্গি ফুটিয়ে তোলে। পক্ষান্তরে চাল-চলনে দীনতার প্রকাশ ও কোন না কোন দূষণীয় মানসিক অবস্থার প্রভাবজাত হয়ে থাকে। কখনো মানুষের মনের সুপ্ত অহংকার একটি লোক দেখানো বিনয় এবং কৃত্রিম দরবেশী ও আল্লাহ প্রেমিকের রূপ লাভ করে এবং এ জিনিসটি তার চাল-চলনে সুস্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। আবার কখনো মানুষ যথার্থই দুনিয়া ও তার অবস্থার মোকাবিলায় পরাজিত হয় এবং নিজের চোখে নিজেই হেয় হয়ে দুর্বল চালে চলতে থাকে। লুকমানের উপদেশের উদ্দেশ্য হচ্ছে, নিজের মনের এসব অবস্থার পরিবর্তন করো এবং একজন সোজা-সরল- যুক্তিসঙ্গত ভদ্রলোকের মতো চলো, যেখানে নেই কোন অহংকার ও দম্ভ এবং কোন দুর্বলতা, লোক দেখানো বিনয় ও ত্যাগ।

এ ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের রুচি যে পর্যায়ে গড়ে উঠেছিল তা এ ঘটনাটি থেকেই অনুমান করা যেতে পারে। হযরত উমর (রা) একবার এক ব্যক্তিকে মাথা হেঁট করে চলতে দেখলেন। তিনি তাকে ডেকে বললেন, "মাথা উঁচু করে চলো। ইসলাম রোগী নয়"। আর একজনকে তিনি দেখলেন যে কুঁকড়ে চলছে। তিনি বললেন, "ওহে

www.pathagar.com

জালেম! আমাদের দ্বীনকে মেরে ফেলছো কেন"। এ দুটি ঘটনা থেকে জানা যায় , হযরত উমরের কাছে দ্বীনদারীর অর্থ মোটেই এটা ছিল না যে, পথ চলার সময় রোগীর মতো আচরণ করবে এবং অযথা নিজেকে দীনহীন করে মানুষের সামনে পেশ করবে। কোন মুসলমানকে এভাবে চলতে দেখে তার ভয় হতো, এভাবে চললে অন্যদের সামনে ইসলামের ভুল প্রতিনিধিত্ব করা হবে এবং মুসলমানদের মধ্যেই নিস্তেজ ভাব সৃষ্টি হয়ে যাবে। এমনই ঘটনা হযরত আয়েশার (রা) ব্যাপারে একবার ঘটে। তিনি দেখলেন একজন লোক কুঁকড়ে মুকড়ে রোগীর মতো চলছে। জিজ্ঞেস করলেন, কি হয়েছে। বলা হলো, ইনি একজন ক্বারী (অর্থাৎ কুরআন অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করেন এবং শিক্ষাদান ও ইবাদত করার মধ্যে মশগুল থাকেন) এ কথা শুনে হযরত আয়েশা (রা) বললেন, "উমর ছিলেন ক্বারীদের নেতা। কিন্তু তার অবস্থা ছিল, পথে চলার সময় জোরে জোরে হাঁটতেন। যখন কথা বলতেন, জোরে জোরে বলতেন। যখন মারধর করতেন খুব জোরেশোরে মারধর করতেন"। (আরো বেশি ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, বনী ইসরাঈল, ৪৩ টীকা এবং আল ফুরকান, ৭৯ টীকা।)

৩৪. এর মানে এ নয় যে, মানুষ সবসময় আস্তে নীচু স্বরে কথা বলবে এবং কখনো জোরে কথা বলবে না। বরং গাধার আওয়াজের সাথে তুলনা করে কোন ধরনের ভাব-ভঙ্গিমা ও কোন ধরনের আওয়াজে কথা বলা থেকে বিরত থাকতে হবে তা পরিষ্কার করে বলে দেয়া হয়েছে। ভঙ্গী ও আওয়াজের এক ধরনের নিম্নগামিতা ও উঁচুগামিতা এবং কঠোরতা ও কোমলতা হয়ে থাকে স্বাভাবিক ও প্রকৃত প্রয়োজনের খাতিরে। যেমন কাছের বা কম সংখ্যক লোকের সাথে কথা বললে আস্তে ও নীচু স্বরে বলবেন। দূরের অথবা অনেক লোকের সাথে কথা বলতে হলে অবশ্যই জোরে বলতে হবে। উচারণভঙ্গীর ফারাকের ব্যাপারটাও এমনি স্থান-কালের সাথে জড়িত। প্রশংসা বাক্যের উচারণভঙ্গী নিন্দা বাক্যের উচারণভঙ্গী থেকে এবং সন্তোষ প্রকাশের কথার ঢং এবং অসন্তোষ প্রকাশের কথার ঢং বিভিন্ন হওয়াই উচিত। এ ব্যাপারটা কোন অবস্থায়ই আপত্তিকর নয়। হযরত লুকমানের নসীহতের অর্থ এ নয় যে, এ পার্থক্যটা উঠিয়ে দিয়ে মানুষ সবসময় একই ধরনের নীচু স্বরে ও কোমল ভঙ্গীমায় কথা বলবে। আসলে আপত্তিকর বিষয়টি হচ্ছে অহংকার প্রকাশ, ভীতি প্রদর্শন এবং অন্যকে অপমানিত ও সন্ত্রস্ত করার জন্য গলা ফাটিয়ে গাধার মতো বিকট স্বরে কথা বলা। বুখারী ও মুসলিম

www.pathagar.com

২৬ রামাদান
বিষয়: আখেরাতের চিত্র
সূরা ইনফিত্বার: ০১-১৯

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

إِذَا السَّمَاءُ انفَطَرَتْ (1) وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ (2) وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ (3) وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ (4) عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ (5) يَا أَيُّهَا الإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ (6) الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ (7) فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ (8) كَلاَّ بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ (9) وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ (10) كِرَامًا كَاتِبِينَ (11) يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ (12) إِنَّ الأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ (13) وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ (14) يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ (15) وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ (16) وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ (17) ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ (18) يَوْمَ لا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا وَالأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ (19)

১) যখন আকাশ ফেটে যাবে, ২) যখন তারকারা চারদিকে বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে, ৩) যখন সমুদ্র ফাটিয়ে ফেলা হবে [১] ৪) এবং যখন কবরগুলো খুলে ফেলা হবে,[২] ৫) তখন প্রত্যেক ব্যক্তি তার সামনের ও পেছনের সবকিছু জেনে যাবে।[৩] ৬) হে মানুষ! কোন জিনিষ তোমাকে তোমার মহান রবের ব্যাপারে ধোঁকায় ফেলে রেখেছে, ৭) যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, তোমাকে সুঠাম ও সুসামঞ্জস্য করে গড়েছেন ৮) এবং যে আকৃতিতে চেয়েছেন তোমাকে গঠন করেছেন।[৪] ৯) কখনো না,[৫] বরং (আসল কথা হচ্ছে এই যে), তোমরা শাস্তি ও পুরস্কারকে মিথ্যা মনে করছো।[৬] ১০) অথচ তোমাদের ওপর পরিদর্শক নিযুক্ত রয়েছে, ১১) এমন সম্মানিত লেখকবৃন্দ, ১২) যারা তোমাদের প্রত্যেকটি কাজ সম্পর্কে জানে।[৭] ১৩) নি:সন্দেহে নেক লোকেরা পরমানন্দে থাকবে ১৪) আর পাপীরা অবশ্যই যাবে জাহান্নামে। ১৫) কর্মফলের দিন তারা তার মধ্যে প্রবেশ করবে ১৬) এবং সেখান থেকে কোনক্রমেই সরে পড়তে পারবে না। ১৭) আর তোমরা কি জানো, ঐ কর্মফল দিনটি কি? ১৮) হ্যাঁ, তোমরা কি জানো, ঐ কর্মফল দিনটি কি? ১৯) এটি সেই দিন যখন কারোর জন্য কোন কিছু করার সাধ্য কারোর থাকবে না।[৮] ফায়সালা সেদিন একমাত্র আল্লাহর ইখতিয়ারে থাকবে।

www.pathagar.com

আয়াত সমূহের ব্যাখ্যা

১. সূরা তাকভীরে বলা হয়েছে, সমুদ্রগুলোতে আগুন ধরিয়ে দেয়া হবে এবং এখানে বলা হয়েছে, সমুদ্রগুলোকে ফাটিয়ে ফেলা হবে। এই উভয় আয়াতকে মিলিয়ে দেখলে একটি বিশেষ এলাকায় সীমাবদ্ধ থাকবে না বরং একই সময় সারা দুনিয়াকে প্রচন্ডভাবে আলোড়িত করে দেবে, এ বিষয়টিকেও সামনে রাখলে সমুদ্রগুলোর ফেটে চৌচির হয়ে যাওয়ার ও তার মধ্যে আগুন লেগে যাবার প্রকৃত অবস্থাটি আমরা অনুধাবন করতে পারি। আমরা বুঝতে পারি, প্রথমে ঐ মহাভূমিকম্পনের ফলে সমুদ্রের তলদেশ ফেটে যাবে এবং সমুদ্রের পানি ভূগর্ভের অভ্যন্তর ভাগে নেমে যেতে থাকবে যেখানে সর্বক্ষণ প্রচন্ড গরম লাভা টগবগ করে ফুটছে। এই গরম লাভার সাথে সংযুক্ত হবার পর পানি তার প্রাথমিক অবস্থায় অর্থাৎ প্রাথমিক দু'টি মৌলিক উপাদান অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনে পরিণত হবে। এর মধ্যে অক্সিজেন আগুন জ্বালানোয় সাহায্য করে এবং হাইড্রোজেন নিজে জ্বলে উঠে। এভাবে প্রাথমিক মৌলিক উপাদানে পরিণত হওয়া ও আগুন লেগে যাওয়ার একটি ধারাবাহিক প্রতিক্রিয়া (chine reaction) চলতে থাকবে। এভাবে দুনিয়ার সবগুলো সাগরে আগুন লেগে যাবে। এটা আমাদের তাত্ত্বিক পর্যালোচনা ভিত্তিক অনুমান। তবে এর সঠিক জ্ঞান আল্লাহ ছাড়া আর করোর নেই।

২. প্রথম তিনটি আয়াতে কিয়ামতের প্রথম পর্বের উল্লেখ করা হয়েছে এবং এই আয়াতে দ্বিতীয় পর্বের কথা বলা হয়েছে। কবর খুলে ফেলার মানে হচ্ছে, মানুষকে আবার নতুন করে জীবিত করে উঠানো।

৩. আসল শব্দ হচ্ছে (ما قدمت وأخرت) এ শব্দগুলোর কয়েকটি অর্থ হতে পারে এবং সবগুলো অর্থই এখানে প্রযোজ্য। যেমন (১) যে ভালো ও মন্দ কাজ করে মানুষ আগে পাঠিয়ে দিয়েছে তাকে (ما قدمت) এবং যেগুলো করতে সে বিরত থেকেছে তাকে (ما أخرت) বলা যায়। এ দিক দিয়ে এ শব্দগুলো ইংরেজী Commission বা omission এর মতো একই অর্থবোধক। (২) যা কিছু প্রথমে করেছে তা (ما قدمت) এবং যা কিছু পরে করেছে তা (ما أخرت) এর অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ সম্পাদনের ধারাবাহিকতা ও তারিখ অনুসারে মানুষের প্রত্যেকটি কাজের হিসেব সম্বলিত আমলনামা তার সামনে এসে যাবে (৩) যেসব ভালো বা মন্দ কাজ মানুষ তার জীবনে করেছে সেগুলো (ما قدمت) এর অন্তর্ভুক্ত এবং মানুষের সামাজে এসব কাজের যে প্রভাব ও ফলাফল সে নিজের পেছনে রেখে এসেছে সেগুলো (ما أخرت) এর অন্তর্ভুক্ত

৪. অর্থাৎ প্রথমে তো তোমার উচিত ছিল সেই পরম করুণাময় ও অনুগ্রহকারীর অনুগ্রহ লাভ করে তাঁর শোকরগুজারী করা এবং তাঁর সমস্ত হুকুম মেনে চলা। তাঁর নাফরমানী করতে গিয়ে তোমার লজ্জিত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু নিজের যাবতীয় যোগ্যতা ও

www.pathagar.com

কর্মক্ষমতাকে তুমি নিজের কৃতিত্ব মনে করায় ধোঁকায় পড়ে গেছো। তোমাকে যিনি অস্তিত্ব দান করেছেন তাঁর অনুগ্রহের স্বীকৃতি দেবার চিন্তা তোমার মনে একবারও উদয় হয় না। দ্বিতীয়তঃ দুনিয়ায় তুমি যা ইচ্ছে করে ফেলতে পারো, এটা তোমার রবের অনুগ্রহ। তবে কখনো এমন হয়নি যে, যখনই তুমি কোন ভুল করেছো অমনি তিনি তোমাকে পক্ষাঘাতে আক্রান্ত করে বিকল করে দিয়েছেন। অথবা তোমার চোখ অন্ধ করে দিয়েছেন বা তোমাকে বজ্রপাতে হত্যা করেছেন। কিন্তু তাঁর এ অনুগ্রহ ও কোমলতাকে তুমি দুর্বলতা ভেবে বসেছো। এবং তোমার আল্লাহর উলুহিয়াতে ইনসাফের নামগন্ধও নেই মনে করে নিজেকে প্রতারিত করেছো।

৫. অর্থাৎ এই ধরনের ধোঁকা খেয়ে যাওয়ার কোন যুক্তিসংগত কারণ নেই। তোমার অস্তিত্ব নিজেই ঘোষণা করছে যে, তুমি নিজে নিজেই সৃষ্টি হয়ে যাওনি। তোমার বাপ মাও তোমাকে সৃষ্টি করেনি। তোমার মধ্যে যেসব উপাদান আছে সেগুলো নিজে নিজে একত্র হয়ে যাওয়ার ফলেও ঘটনাক্রমে তুমি মানুষ হিসেবে তৈরী হয়ে যাওনি। বরং এক মহাজ্ঞানী ও মহাশক্তিধর আল্লাহ তোমাকে এই পূর্ণাঙ্গ মানবিক আকৃতি দান করেছেন। তোমার সামনে সব রকমের প্রাণী রয়েছে, তাদের মোকাবিলায় তোমার সবচেয়ে সুন্দর শারীরিক কাঠামো এবং শ্রেষ্ঠ ও উন্নত শক্তি একেবারেই সুস্পষ্ট। বুদ্ধির দাবী তো এই ছিল, এসব কিছু দেখে কৃতজ্ঞতায় তোমার মাথা নত হয়ে যাবে এবং সেই মহান রবের মোকাবিলায় তুমি কখনো নাফরমানী করার দুঃসাহস করবে না। তুমি এও জানো যে, তোমার রব কেবলমাত্র রহীম ও করীম করুণাময় ও অনুগ্রহশীলই নন, তিনি জাব্বার ও কাহহার-মহাপরাক্রমশালী এবং কঠোর শাস্তি দানকারীও। তাঁর পক্ষ থেকে যখন কোন ভূমিকম্প, তুফান বা বন্যা আসে তখন তার প্রতিরোধের জন্য তোমরা যতই ব্যবস্থা অবলম্বন করো না কেন সবকিছুই নিষ্ফল হয়ে যায়। তুমি একথাও জানো, তোমার রব মূর্খ বা অজ্ঞ নন বরং তিনি মহাজ্ঞানী ও মহাবিজ্ঞ। জ্ঞান ও বিজ্ঞতার অপরিহার্য দাবী হচ্ছে এই যে, যাকে বুদ্ধি জ্ঞান দান করা হবে তাকে তার কাজের জন্য দায়ীও করতে হবে। যাকে ক্ষমতার ইখতিয়ার দেয়া হবে সেই ক্ষমতার ইখতিয়ার সে কিভাবে ব্যবহার করেছে তার হিসেবও তার কাজ থেকে নিতে হবে। যাকে নিজ দায়িত্বে সৎ ও অসৎকাজ করার ক্ষমতা দেয়া হবে তাকে তার সৎকাজের জন্য পুরষ্কার ও অসৎকাজের জন্য শাস্তি ও দিতে হবে। এসব সত্য তোমার কাছে দিনের আলোর মতো সুস্পষ্ট। তাই তোমার মহান রবের পক্ষ থেকে তুমি যে ধোঁকায় পড়ে গেছো তার পেছনে কোন যুক্তিসংগত কারণ রয়েছে, একথা তুমি বলতে পারবে না। তুমি নিজে যখন কারোর কর্মকর্তা হবার দায়িত্ব পালন করে থাকো তখন তোমার নিজের অধীন ব্যক্তি যদি তোমার ভদ্রতা ও কোমল ব্যবহারকে দুর্বলতা মনে করে তোমার মাথায় চড়ে বসে, তাহলে তখন তুমি তাকে নীচ প্রকৃতির বলে মনে করে থাকো। কাজেই তোমার প্রকৃতি একথা সাক্ষ্য দেবার জন্য যথেষ্ট যে, প্রভুর দয়া, করুণা ও মহানুভবতার কারণে তার চাকর ও কর্মচারীর কখনো তার মোকাবিলায় দুঃসাহসী হয়ে যাওয়া উচিত নয়। তার এ

www.pathagar.com

ভুল ধারণা পোষণ করা উচিত নয় যে, সে যা ইচ্ছা তাই করে যাবে এবং এ জন্য কেউ তাকে পাকড়াও করতে ও শাস্তি দিতে পারবে না।

৬. অর্থাৎ যে জিনিসটি তোমাকে ধোঁকায় ফেলে দিয়েছে তার পেছনে আসলে কোন শক্তিশালী যুক্তি নেই। বরং দুনিয়ার এই কর্মজগতের পরে আর কোন কর্মফল লাভ করার জগত নেই, নিছক তোমার এ নির্বোধ ধারণাই এর পেছনে কাজ করেছে। এ বিভ্রান্তও ভিত্তিহীন ধারণাই তোমাকে আল্লাহ থেকে গাফেল করে দিয়েছে। এরই ফলে তুমি আল্লাহর ন্যায় বিচারের ভয়ে ভীত হও না এবং এটিই তোমার নৈতিক আচরণকে দায়িত্বহীন বানিয়ে দিয়েছে।

৭. অর্থাৎ তোমরা চাইলে কর্মফল দিবসকে অস্বীকার করতে পারো, তাকে মিথ্যা বলতে পারো, তার প্রতি বিদ্রুপ বাণ নিক্ষেপ করতে পারো কিন্তু এতে প্রকৃত সত্য বদলে যাবে না। প্রকৃত সত্য হচ্ছে এই যে, তোমাদের রব এই দুনিয়ায় তোমাদেরকে লাগামহীনভাবে ছেড়ে দেননি। বরং তিনি তোমাদের প্রত্যেকের ওপর অত্যন্ত সত্যনিষ্ঠ তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করে রেখেছেন। তারা নিরপেক্ষভাবে তোমাদের সমস্ত ভালো ও মন্দ কাজ রেকর্ড করে যাচ্ছে। তোমাদের কোন কাজ তাদের দৃষ্টির অগোচরে থাকছে না। তোমরা অন্ধকারে, একান্ত নির্জনে, জনমানবহীন গভীর জংগলে অথবা এমন যে কোন অবস্থায় কোন কাজ করে থাকলে যে সম্পর্কে তোমরা পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকছো যে, তা সকল সৃষ্টির অগোচরে রয়ে গেছে, তারপরও তা তাদের কাছ থেকে গোপন থাকছে না। এই তত্ত্বাবধায়ক ফেরেশতাদের জন্য আল্লাহ "কিরামান কাতেবীন" শব্দ ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ লেখকবৃন্দ যারা কারীম (অত্যন্ত সম্মানিত ও মর্যাদাবান)। তাদের কারোর সাথে ব্যক্তিগত ভালোবাসা বা শত্রুতা নেই। ফলে একজনের প্রতি অন্যায় পক্ষপাতিত্ব এবং অন্যজনের অযথা বিরোধিতা করে সত্য বিরোধী ঘটনা রেকর্ড করার কোন অবকাশই সেখানে নেই। তারা খেয়ানতকারীও নয়। ডিউটি ফাঁকি দিয়ে নিজেদের তরফ থেকে খাতায় উল্টা সিধে লিখে দেয়া তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তারা ঘুষখোরও নয়। নগদ কিছু নিয়ে কারো পক্ষে বা কারো বিপক্ষে মিথ্যা রিপোর্ট দেবার কোন প্রশ্নই তাদের ব্যাপারে দেখা দেয় না। এসব যাবতীয় নৈতিক দুর্বলতা থেকে তারা মুক্ত। তারা এসবের অনেক উর্ধে। কাজেই সৎ ও অসৎ উভয় ধরনের মানুষের নিশ্চিত থাকা উচিত যে, তাদের প্রত্যেকের সৎকাজ হুবহু রেকর্ড হবে এবং কারোর ঘাড়ে এমন কোন অসৎকাজ চাপিয়ে দেয়া হবে না, যা সে করেনি তারপর এই ফেরেশতাদের দ্বিতীয় যে গুণটি বর্ণনা করা হয়েছে তা হচ্ছেঃ "তোমরা যা কিছু করো তা তারা জানে"। অর্থাৎ তাদের অবস্থা দুনিয়ার সি, আই , ডি ও তথ্য সরবরাহ এজেনিগুলোর মতো নয়। সব রকমের প্রচেষ্টা ও সাধ্য-সাধনার পরও অনেক কথা তাদের কাছ থেকে গোপন থেকে যায়। কিন্তু এ ফেরেশতারা প্রত্যেক ব্যক্তির প্রত্যেকটি কাজ সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত। সব জায়গায় সব অবস্থায় সকল ব্যক্তির সাথে তারা এমন ভাবে লেগে আছে যে, তারা জানতেই পারছে না যে, কেউ তাদের কাজ পরিদর্শন করছে। কোন ব্যক্তি কোন নিয়তে কি কাজ

www.pathagar.com

করেছে তাও তারা জানতে পারে। তাই তাদের তৈরি করা রেকর্ড একটি পূর্ণাঙ্গ রেকর্ড। এই রেকর্ডের বাইরে কোন কথা নেই। এ সম্পর্কেই সূরা কাহাফের ৪৯ আয়াতে বলা হয়েছেঃ কিয়ামতের দিন অপরাধীরা অবাক হয়ে দেখবে তাদের সামনে যে আমলনামা পেশ করা হচ্ছে তার মধ্যে তাদের ছোট বড় কোন একটি কাজও অলিখিত থেকে যায়নি। যা কিছু তারা করেছিল সব হুবহু ঠিক তেমনিভাবেই তাদের সামনে আনা হয়েছে।

৮. অর্থাৎ কাউকে সেখানে তার কর্মফল ভোগ করার হাত থেকে নিস্কৃতি দান করার ক্ষমতা কারোর থাকবে না। কেউ সেখানে এমন প্রভাবশালী বা আল্লাহর প্রিয়ভাজন হবে না যে, আল্লাহর আদালতে তাঁর রায়ের বিরুদ্ধে বেঁকে বসে একথা বলতে পারে, অমুক ব্যক্তি আমার আত্মীয়, প্রিয় বা আমার সাথে সম্পর্কিত, কাজেই দুনিয়ায় সে যত খারাপ কাজ করে থাকুক না কেন তাকে তো মাফ করতেই হবে।

www.pathagar.com

২৭ রামাদান
বিষয়: মর্যাদাপূর্ণ রাত
সূরা আল কদর: ০১-০৫

بسم الله الرحمن الرحيم

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (1) وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ (2) لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ (3) تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ (4) سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ (5)

১) আমি এটা (কুরআন) নাযিল করেছি কদরের রাতে।[১] ২) তুমি কি জানো,কদরের রাত কি? ৩) কদরের রাত হাজার মাসের চাইতেও বেশী উত্তম।[২] ৪) ফেরেশতারা ও রূহ [৩] এই রাতে তাদের রবের অনুমতিক্রমে প্রত্যেকটি হুকুম নিয়ে নাযিল হয়।[৪] ৫) এ রাতটি পুরোপুরি শান্তিময়, ফজরের উদয় পর্যন্ত।[৫]

আয়াত সমূহের ব্যাখ্যা

১. মূল শব্দ হচ্ছে আনযালনাহু "আমি একে নাযিল করেছি" কিন্তু আগে কুরআনের কোন উল্লেখ না করেই কুরআনের দিকে ইংগিত করা হয়েছে। এর কারণ হচ্ছে, "নাযিল করা" শব্দের মধ্যেই কুরআনের অর্থ রয়ে গেছে। যদি আগের বক্তব্য বা বর্ণনাভঙ্গী থেকে কোন সর্বনাম কোন বিশেষ্যের জায়গায় বসেছে তা প্রকাশ হয়ে যায় তাহলে এমন অবস্থায় আগে বা পরে কোথাও সেই বিশেষ্যটির উল্লেখ না থাকলেও সর্বনামটি ব্যবহার করা যায়। কুরআনে এর একাধিক দৃষ্টান্ত রয়ে গেছে। (এ ব্যাপারে আরো বেশী জানার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আন-নাজম ৯ টীকা)

এখানে বলা হয়েছে আমি কদরের রাতে কুরআন নাযিল করেছি আবার সূরা বাকারায় বলা হয়েছে "রমযান মাসে কুরআন নাযিল করা হয়েছে"। (১৮৫ আয়াতে) এ থেকে জানা যায়, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হেরা গুহায় যে রাতে আল্লাহর ফেরেশতা অহী নিয়ে এসেছিলেন সেটি ছিল রমযান মাসের একটি রাত। এই রাতকে এখানে কদরের রাত বলা হয়েছে। সূরা দুখানে একে মুবারক রাত বলা হয়েছে। বলা হয়েছে "অবশ্যই আমি একে একটি বরকতপূর্ণ রাতে নাযিল করেছি"। (আয়াত:৩)
এই রাতে কুরআন নাযিল করার দু'টি অর্থ হতে পারে। **এক:** এই রাতে সমগ্র কুরআন অহীর ধারক ফেরেশতাদেরকে দিয়ে দেয়া হয়। তারপর অবস্থা ও ঘটনাবলী অনুযায়ী তেইশ বছর ধরে বিভিন্ন সময়ে আল্লাহর হুকুমে তার আয়াত ও সূরাগুলো রসূলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর নাযিল করতে থাকেন। ইবনে আব্বাস (রা) এ অর্থটি বর্ণনা করেছেন। (ইবনে জারীর,ইবনুল মুনযির,ইবনে আবী হাতেম, হাকেম, ইবনে মারদুইয়া ও বায়হাকী) এর **দ্বিতীয় অর্থ** হচ্ছে,এই রাত থেকেই কুরআন

www.pathagar.com

নাযিলের সূচনা হয়। এটি ইমাম শা'বীর উক্তি। অবশ্য ইবনে আব্বাসের (রা) ওপরে বর্ণিত বক্তব্যের মতো তাঁর একটি উক্তিও উদ্ধৃত করা হয়। (ইবনে জারীর) যা হোক, উভয় অবস্থায় কথা একই থাকে। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর কুরআন নাযিলের সিলসিলা এই রাতেই শুরু হয় এবং এই রাতেই সূরা আলাকের প্রথম পাঁচটি আয়াত নাযিল হয়। তবুও এটি একটি অভ্রান্ত সত্য, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এবং তাঁর ইসলামী দাওয়াতের জন্য কোন ঘটনা বা ব্যাপারে সঠিক নির্দেশ লাভের প্রয়োজন দেখা দিলে তখনই আল্লাহ কুরআনের সূরা ও আয়াতগুলো রচনা করতেন না। বরং সমগ্র বিশ্ব-জাহান সৃষ্টির পূর্বে অনাদিকালে মহান আল্লাহ পৃথিবীতে মানব জাতির সৃষ্টি, তাদের মধ্যে নবী প্রেরণ, নবীদের ওপর কিতাব নাযিল, সব নবীর পরে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পাঠানো এবং তাঁর প্রতি কুরআন নাযিল করার সমস্ত পরিকল্পনা তৈরি করে রেখেছিলেন। কদরের রাতে কেবলমাত্র এই পরিকল্পনার শেষ অংশের বাস্তবায়ন শুরু হয়। এই সময় যদি সমগ্র কুরআন অহী ধারক ফেরেশতাদের হাতে তুলে দেয়া হয়ে থাকে তাহলে তা মোটেই বিস্ময়কর নয়।

কোন কোন তাফসীরকার কদরকে তাকদীর অর্থে গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ এই রাতে আল্লাহ তাকদীরের ফয়সালা জারী করার জন্য তা ফেরেশতাদের হাতে তুলে দেন। সূরা দুখানের নিম্নোক্তআয়াতটি এই বক্তব্য সমর্থন করেঃ

"এই রাতে সব ব্যাপারে জ্ঞানগর্ভ ফয়সালা প্রকাশ করা হয়ে থাকে"। (আয়াতঃ ৪) অন্যদিকে ইমাম যুহরী বলেনঃ কদর অর্থ হচ্ছে শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা। অর্থাৎ এটি অত্যন্ত মর্যাদাশালী রাত। এই অর্থ সমর্থন করে এই সূরার নিম্নোক্ত আয়াতটি "কদরের রাত হাজার মাসের চাইতেও উত্তম"।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এটা কোন রাত ছিল? এ ব্যাপারে ব্যাপক মতবিরোধ দেখা যায়। এ সম্পর্কে প্রায় ৪০টি মতের সন্ধান পাওয়া যায়। তবে আলেম সমাজের সংখ্যাগুরু অংশের মতে রমযানের শেষ দশ তারিখের কোন একটি বেজোড় রাত হচ্ছে এই কদরের রাত। আবার তাদের মধ্যেও বেশীরভাগ লোকের মত হচ্ছে সেটি সাতাশ তারিখের রাত। এ প্রসঙ্গে বর্ণিত নির্ভরযোগ্য হাদীসগুলো এখানে উল্লেখ করেছি।
হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়া সাল্লাম লাইলাতুল কদর সম্পর্কে বলেনঃ সেটি সাতাশের বা উনত্রিশের রাত। (আবু দাউদ)
হযরত আবু হুরায়রার (রা) অন্য একটি রেওয়ায়াতে বলা হয়েছে সেটি রমযানের শেষ রাত। (মুসনাদে আহমাদ)
যির ইবনে হুবাইশ হযরত উবাই ইবনে কা'বকে (রা) কদরের রাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তিনি হলফ করে কোন কিছুকে ব্যতিক্রম হিসেবে দাঁড় না করিয়ে বলেন, এটা সাতাশের রাত। (আহমাদ, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনে হিব্বান)

www.pathagar.com

হযরত আবু যারকে (রা) এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়। তিনি বলেন, হযরত উমর (রা), হযরত হুযাইফা (রা) এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বহু সাহাবার মনে এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ ছিল না যে, এটি রমযানের সাতাশতম রাত। (ইবনে আবী শাইবা)

হযরত উবাদাহ ইবনে সামেত (রা) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, রমযানের শেষ দশ রাতের বেজোড় রাতগুলোর যেমন একুশ, তেইশ,পঁচিশ, সাতাশ বা শেষ রাতের মধ্যে রয়েছে কদরের রাত। (মুসনাদে আহমাদ)
হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তাকে খোঁজ রমযানের শেষ দশ রাতের মধ্যে যখন মাস শেষ হতে আর নয় দিন বাকি থাকে। অথবা সাত দিন বা পাঁচ দিন বাকি থাকে। (বুখারী)
অধিকাংশ আলেম এর অর্থ করেছেন এভাবে যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে বেজোড় রাতের কথা বলতে চেয়েছেন।
হযরত আবু বকর (রা) রেওয়ায়াত করেছেন, নয় দিন বাকি থাকতে বা সাত দিন বা পাঁচ দিন বা এক দিন বাকি থাকতে শেষ রাত। তাঁর বক্তব্যের অর্থ ছিল, এই তারিখগুলোতে কদরের রাতকে তালাশ করো। (তিরমিযী, নাসায়ী)

হযরত আয়েশা (রা) বর্ননা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ কদরের রাতকে রমযানের শেষ দশ রাতের বেজোড় রাতগুলোর মধ্যে তালাশ করো। (বুখারী, মুসলিম, আহমাদ, তিরমিযী)
হযরত আয়েশা (রা) ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) এও বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইন্তেকালের পূর্ব পর্যন্ত রমযানের শেষ দশ রাতে ই'তিকাফ করেছেন।

এ প্রসংগে হযরত মু'আবিয়া (রা) হযরত ইবনে উমর, হযরত ইবনে আব্বাস (রা) এবং অন্যান্য সাহাবীগণ যে রেওয়ায়াত করেছেন তার ভিত্তিতে পূর্ববর্তী আলেমগণের বিরাট অংশ সাতাশ রমযানকেই কদরের রাত বলে মনে করেন। সম্ভবত কদরের রাতের শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম থেকে লাভবান হবার আগ্রহে যাতে লোকেরা অনেক বেশী রাত ইবাদতে কাটাতে পারে এবং কোন একটি রাতকে যথেষ্ট মনে না করে সে জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে কোন একটি রাত নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়নি। এখানে প্রশ্ন দেখা দেয়, যখন মক্কা মু'আযযমায় রাত হয় তখন দুনিয়ার একটি বিরাট অংশে থাকে দিন, এ অবস্থায় এসব এলাকার লোকেরা তো কোন দিন কদরের রাত লাভ করতে পারবে না। এর জবাব হচ্ছে, আরবী ভাষায় 'রাত' শব্দটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে দিন ও রাতের সমষ্টিকে বলা হয়। কাজেই রমযানের এই তারিখগুলোর মধ্য থেকে যে তারিখটিই দুনিয়ার কোন অংশে পাওয়া যাবে তার দিনের পূর্বেকার রাতটিই সেই এলাকার জন্য কদরের রাত হতে পারে।

www.pathagar.com

২. মুফাসসিরগণ সাধারণভাবে এর অর্থ করেছেন, এ রাতের সৎকাজ হাজার মাসের সৎকাজের চেয়ে ভালো। কদরের রাত এ গণনার বাইরে থাকবে। সন্দেহ নেই এ কথাটির মধ্যে যথার্থ সত্য রয়ে গেছে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই রাতের আমলের বিপুল ফযীলত বর্ণনা করেছেন। কাজেই বুখারী ও মুসলিমে হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

"যে ব্যক্তি কদরের রাতে ঈমানের সাথে এবং আল্লাহর সাথে এবং আল্লাহর কাছ থেকে প্রতিদান লাভের উদ্দেশ্যে ইবাদতের জন্যে দাঁড়ালো তার পিছনের সমস্ত গোনাহ মাফ করা হয়েছে"।

মুসনাদে আহমাদে হযরত উবাদাহ ইবনে সামেত (রা) বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ "কদরের রাত রয়েছে রমযানের শেষ দশ রাতের মধ্যে। যে ব্যক্তি প্রতিদান লাভের আকাঙ্খা নিয়ে এসব রাতে ইবাদতের জন্য দাঁড়িয়ে থাকে আল্লাহ তার আগের পিছনের সব গোনাহ মাফ করে দেবেন। "কিন্তু আয়াতে উচ্চারিত শব্দগুলোর একথা বলা হয়নি (কদরের রাতের আমল হাজার রাতের আমলের চেয়ে ভালো) বরং বলা হয়েছে, "কদরের রাত হাজার মাসের চেয়ে ভালো"। আর মাস বলতে একেবারে গুণে গুণে তিরাশি বছর চার মাস নয়। বরং আরববাসীদের কথার ধরনই এ রকম ছিল, কোন বিপুল সংখ্যার ধারণা দেবার জন্য তারা "হাজার" শব্দটি ব্যবহার করতো। তাই আয়াতের অর্থ হচ্ছে,এই একটি রাতে এত বড় নেকী ও কল্যাণের কাজ হয়েছে যা মানবতার সুদীর্ঘ ইতিহাসে কোন দীর্ঘতম কালেও হয়নি।

৩. রূহ বলতে জিব্রাঈল আলাইহিস সালামকে বুঝানো হয়েছে। তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার কারণে সমস্ত ফেরেশতা থেকে আলাদা করে তাঁর উল্লেখ করা হয়েছে।

৪. অর্থাৎ তারা নিজেদের তরফ থেকে আসে না। বরং তাদের রবের অনুমতিক্রমে আসে। আর প্রত্যেকটি হুকুম বলতে সূরা দুখানের ৫ আয়াতে "আমরে হাকীম" (বিজ্ঞতাপূর্ণ কাজ) বলতে যা বুঝনো হয়েছে এখানে তার কথাই বলা হয়েছে।

৫. অর্থাৎ সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত সারাটা রাত শুধু কল্যাণে পরিপূর্ণ। সেখানে ফিতনা, দুস্কৃতি ও অনিষ্টকারিতার ছিটে ফোঁটাও নেই।

www.pathagar.com

২৮ রামাদান
বিষয়: ইয়াতিম
সূরা নিসা: ২৪-২৭

وَآتُواْ الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَتَبَدَّلُواْ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا (2) وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ (3) وَآتُواْ النِّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا (4) وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِيَاماً وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا (5) وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللّهِ حَسِيبًا (6)

২) ইয়াতিমদেরকে তাদের ধন-সম্পদ ফিরিয়ে দাও। [২] ভালো সম্পদের সাথে মন্দ সম্পদ বদল করো না। [৩] আর তাদের সম্পদ তোমাদের সম্পদের সাথে মিশিয়ে গ্রাস করো না। এটা মহাপাপ।

৩) আর যদি তোমরা ইয়াতিমদের (মেয়েদের) সাথে বেইনসাফী করার ব্যাপারে ভয় করো, তাহলে যেসব মেয়েদের তোমরা পছন্দ করো তাদের মধ্যে থেকে দুই, তিন বা চারজনকে বিয়ে করো। [৪] কিন্তু যদি তোমরা তাদের সাথে ইনসাফ করতে পারবে না বলে আশংকা করো, তাহলে একজনকেই বিয়ে করো। [৫] অথবা তোমাদের অধিকারে যেসব মেয়ে আছে তাদেরকে বিয়ে করো। [৬] বেইনসাফীর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এটিই অধিকতর সঠিক পদ্ধতি।

৪) আর আনন্দের সাথে (ফরয মনে করে) স্ত্রীদের মোহরানা আদায় করে দাও। তবে যদি তারা নিজেরাই নিজেদের ইচ্ছায় মোহরানার কিছু অংশ মাফ করে দেয়, তাহলে তোমরা সানন্দে তা খেতে পারো। [৭]

৫) আর তোমরা যে ধন-সম্পদকে আল্লাহ তোমাদের জীবন ধারণের মাধ্যমে পরিণত করেছেন, তা নির্বোধদের হাতে তুলে দিয়ো না। তবে তাদের খাওয়া পরার ব্যবস্থা করো এবং সদুপদেশ দাও। [৮]

৬) আর এতিমদের পরীক্ষা করতে থাকো, যতদিন না তারা বিবাহযোগ্য বয়সে পৌঁছে যায়। [৯] তারপর যদি তোমরা তাদের মধ্যে যোগ্যতার সন্ধান পাও, তাহলে তাদের সম্পদ তাদের হাতে সোর্পদ করে দাও। [১০] তারা বড় হয়ে নিজেদের অধিকার দাবী করবে, এ ভয়ে কখনো ইনসাফের সীমানা অতিক্রম করে তাদের সম্পদ তাড়াতাড়ি

www.pathagar.com

খেয়ে ফেলো না। এতিমদের যে অভিভাবক সম্পদশালী হবে সে যেন পরহেজগারী অবলম্বন করে (অর্থাৎ অর্থ গ্রহণ না করে) আর যে গরীব হবে সে যেন প্রচলিত উত্তম পদ্ধতিতে খায়। [১১] তারপর তাদের সম্পদ যখন তাদের হাতে সোপর্দ করতে যাবে তখন তাতে লোকদেরকে সাক্ষী বানাও। আর হিসেব নেবার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।

আয়াত সমূহের ব্যাখ্যা

২. অর্থাৎ যতদিন তারা শিশু ও নাবালেগ থাকে ততদিন তাদের ধন-সম্পদ তাদের স্বার্থে ব্যয় করো। আর প্রাপ্ত বয়স্ক হয়ে যাবার পর তাদের হক তাদের কাছে ফিরিয়ে দাও।

৩. একটি ব্যাপক অর্থবোধক বাক্য। এর একটি অর্থ হচ্ছে, হালালের পরিবর্তে হারাম উপার্জন করো না এবং দ্বিতীয় অর্থটি হচ্ছে, এতিমদের ভালো সম্পদের সাথে নিজেদের খারাপ সম্পদ বদল করো না।

৪. মুফাসসিরগণ এর তিনটি অর্থ বর্ণনা করেছেনঃ

এক: হযরত আয়েশা (রা:) এর ব্যাখ্যায় বলেছেন: জাহেলী যুগে যেসব এতিম মেয়ে লোকদের অভিভাবকত্বাধীন থাকতো তাদের সম্পদ ও সৌন্দর্যের কারণে অথবা তাদের ব্যাপারে তো উচ্চবাচ্য করার কেউ নেই, যেভাবে ইচ্ছা তাদের দাবিয়ে রাখা যাবে এই ধারণার বশবর্তী হয়ে অনেক অভিভাবক নিজেরাই তাদেরকে বিয়ে করতো, তারপর তাদের ওপর জুলুম করতে থাকতো। এরই পরিপ্রেক্ষিতে বলা হয়েছে, তোমরা যদি আশংকা করো যে তাদের সাথে ইনসাফ করতে পারবে না, তাহলে সমাজে আরো অনেক মেয়ে আছে, তাদের মধ্যে থেকে নিজের পছন্দমতো মেয়েদেরকে বিয়ে করো। এ সূরার ১৯ রুকূ'র প্রথম আয়াতটি এ ব্যাখ্যা সমর্থন করে।

দুই: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা:) ও তাঁর ছাত্র ইকরামা এর ব্যাখ্যায় বলেছেন: জাহেলী যুগে স্ত্রী গ্রহণের ব্যাপারে কোন নির্ধারিত সীমা ছিল না। এক একজন লোক দশ দশটি বিয়ে করতো। স্ত্রীদের সংখ্যাধিক্যের কারণে সংসার খরচ বেড়ে যেতো। তখন বাধ্য হয়ে তারা নিজেদের এতিম ভাইঝি ও ভাগ্নীদের এবং অন্যান্য অসহায় আত্মীয়াদের অধিকারের দিকে হাত বাড়াতো। এ কারণে আল্লাহ বিয়ের জন্য চারটির সীমা নির্ধারিত করে দিয়েছেন। জুলুম ও বেইনসাফী থেকে বাঁচার পন্থা এই যে, এক থেকে চারটি পর্যন্ত স্ত্রী গ্রহণ করবে যাতে তাদের সাথে সুবিচার করতে পার।

তিন: সাঈদ ইবনে জুবাইর, কাতাদাহ এবং অন্যান্য কোন কোন মুফাসসির বলেন: ইয়াতিমদের সাথে বেইনসাফী করাকে জাহেলী যুগের লোকেরাও সুনজরে দেখতো না। কিন্তু মেয়েদের ব্যাপারে ইনসাফ ও ন্যায়নীতির কোন ধারণাই তাদের মনে স্থান পায়নি। তারা যতগুলো ইচ্ছা বিয়ে করতো। তারপর তাদের ওপর জুলুম-অত্যাচার চালাতো ইচ্ছে মতো। তাদের এ ব্যবহারের প্রেক্ষিতে বলা হয়েছে, যদি তোমরা ইয়াতিমদের ওপর জুলুম ও বেইনসাফী করতে ভয় করে থাকো, তাহলে মেয়েদের সাথেও বেইনসাফী করার ব্যাপারে ভয় করো। প্রথমত চারটির বেশী বিয়েই করো না। আর

www.pathagar.com

চারের সংখ্যার মধ্যেও সেই ক'জনকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করতে পারবে যাদের সাথে ইনসাফ করতে পারবে।

আয়াতের শব্দাবলী এমনভাবে গ্রথিত হয়েছে, যার ফলে সেখান থেকে এ তিনটি ব্যাখ্যারই সম্ভাবনা রয়েছে। এমনকি একই সংগে আয়াতটির এ তিনটি অর্থই যদি এখানে উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে, তাহলে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। এ ছাড়া এর আর একটা অর্থও হতে পারে। অর্থাৎ ইয়াতিমদের সাথে যদি এভাবে ইনসাফ না করতে পারো তাহলে যেসব মেয়ের সাথে এতিম শিশু সন্তান রয়েছে তাদেরকে বিয়ে করো।

৫. এ আয়াতের ওপর মুসলিম ফকীহগণের 'ইজমা' অনুষ্ঠিত হয়েছে। তাঁরা বলেন, এ আয়াতের মাধ্যমে স্ত্রীর সংখ্যা সীমিত করে দেয়া হয়েছে এবং একই সংগে এক ব্যক্তির চারজনের বেশী স্ত্রী রাখা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। হাদীস থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। হাদীসে বলা হয়েছেঃ তায়েফ প্রধান গাইলানের ইসলাম গ্রহণকালে নয়জন স্ত্রী ছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে চারজন স্ত্রী রেখে দিয়ে বাকি পাঁচজনকে তালাক দেবার নির্দেশ দেন। এভাবে আর এক ব্যক্তির (নওফল ইবনে মু'আবীয়া) ছিল পাঁচজন স্ত্রী। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার এক স্ত্রীকে তালাক দেবার হুকুম দেন।

এছাড়াও এ আয়াতে একাধিক স্ত্রী রাখার বৈধতাকে ইনসাফ ও ন্যায়নিষ্ঠ ব্যবহারের শর্ত সাপেক্ষ করা হয়েছে। যে ব্যক্তি ইনসাফ ও ন্যায়নিষ্ঠতার শর্ত পূরণ না করে একাধিক স্ত্রী রাখার বৈধতার সুযোগ ব্যবহার করে সে মূলত আল্লাহর সাথে প্রতারণা করে। যে স্ত্রী বা যেসব স্ত্রীর সাথে সে ইনসাফ করে না ইসলামী সরকারের আদালতসমূহ তাদের অভিযোগ শুনে সে ব্যাপারে সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

কোন কোন লোক পাশ্চাত্যবাসীদের খৃষ্টবাদী ধ্যান-ধারণার প্রভাবে আড়ষ্ট ও পরাজিত মনোভাব নিয়ে একথা প্রমাণ করার চেষ্টা করে থাকে যে, একাধিক বিয়ের পদ্ধতি (যা আসলে পাশ্চাত্যের দৃষ্টিতে একটি খারাপ পদ্ধতি) বিলুপ্ত করে দেয়াই কুরআনের আসল উদ্দেশ্য। কিন্তু সমাজে এ পদ্ধতির খুব বেশী প্রচলনের কারণে এর ওপর কেবলমাত্র বিধি-নিষেধ আরোপ করেই ছেড়ে দেয়া হয়েছে। এ ধরনের কথাবার্তা মূল নিছক মানসিক দাসত্বের ফলশ্রুতি ছাড়া আর কিছুই নয়। একাধিক স্ত্রী গ্রহণকে মূলগতভাবে অনিষ্টকর মনে করা কোনক্রমেই সঠিক হতে পারে না। কারণ কোন কোন অবস্থায় এটি একটি নৈতিক ও তামাদ্দুনিক প্রয়োজনে পরিণত হয়। যদি এর অনুমতি না থাকে তাহলে যারা এক স্ত্রীতে তুষ্ট হতে পারে না, তারা বিয়ের সীমানার বাইরে এসে যৌন বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিতে তৎপর হবে। এর ফলে সমাজ-সংস্কৃতি-নৈতিকতার মধ্যে যে অনিষ্ট সাধিত হবে তা হবে একাধিক স্ত্রী গ্রহনের অনিষ্টকারিতার চাইতে অনেক বেশী। তাই যারা এর প্রয়োজন অনুভব করে কুরআন তাদেরকে এর অনুমতি দিয়েছে। তবুও যারা মূলগতভাবে একাধিক বিয়েকে একটি অনিষ্টকারিতা মনে করেন, তাদেরকে অবশ্যই এ ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে যে, তারা কুরআনের রায়ের বিরুদ্ধে এ মতবাদের নিন্দা করতে পারেন এবং একে রহিত করারও পরামর্শ দিতে পারেন। কিন্তু নিজেদের মনগড়া রায়কে

www.pathagar.com

অনর্থক কুরআনের রায় বলে ঘোষণা করার কোন অধিকার তাদের নেই। কারণ কুরআন সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় একে বৈধ ঘোষণা করেছে। ইশারা ইংগিতে ও এর নিন্দায় এমন একটি শব্দ ব্যবহার করেনি, যা থেকে বুঝা যায় যে, সে এর পথ বন্ধ করতে চায়। (আরো বেশী জানার জন্য আমার "সুন্নাতের আইনগত মর্যাদা" গ্রন্থটি পড়ুন)

৬. এখানে ক্রীতদাসী বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ যেসব নারী যুদ্ধ-বন্দিনী হিসেবে আসে এবং সরকারের পক্ষ থেকে তাদেরকে জনগণের মধ্যে বিতরণ করা হয়। একথা বলার অর্থ হচ্ছে এই যে, একজন সম্ভ্রান্তপরিবারের স্বাধীন মহিলাকে বিয়ে করার দায়িত্ব পালন করতে না পারলে একজন যুদ্ধ-বন্দিনী হিসেবে আনীত বাঁদীকে বিয়ে করো। সামনের দিকে চতুর্থ রুকূ'তে একথাই বলা হয়েছে। অথবা যদি তোমাদের একাধিক স্ত্রীর প্রয়োজন হয়ে পড়ে এবং সম্ভ্রান্তপরিবারের স্বাধীন মেয়েদের বিয়ে করলে তাদের মধ্যে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা তোমাদের পক্ষে কঠিন হয়ে থাকে, তাহলে ক্রীতদাসীদেরকে গ্রহণ করো। কারণ তাদের ব্যাপারে তোমাদের ওপর তুলনামূলকভাবে কম দায়িত্ব আসবে। (সামনের দিকে ৪৪ টীকায় ক্রীতদাসীদের বিধান সম্পর্কে আরো বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে)।

৭. হযরত উমর (রা:) ও কাযী শুরাইহর ফয়সালা হচ্ছে: যদি কোন স্ত্রী তার স্বামীকে সম্পূর্ণ মোহরানা বা তার অংশ বিশেষ মাফ করে দেয় এবং তারপর আবার তা দাবী করে, তাহলে তা আদায়করার জন্য স্বামীকে বাধ্য করা হবে। কেননা তার দাবী করাই একথা প্রমাণ করে যে, সে নিজের ইচ্ছায় মোহরানার সমুদয় অর্থ বা তার অংশ বিশেষ ছাড়তে রাজী নয়। (এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য আমার "স্বামী-স্ত্রীর অধিকার" বইটির 'মোহরানা' অধ্যায়টি পড়ুন)।

৮. এ আয়াতটি ব্যাপক অর্থবোধক। এর মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহকে একটি পরিপূর্ণ বিধান দেয়া হয়েছে। তাদেরকে বলা হয়েছে: অর্থ জীবন যাপনের একটি মাধ্যম। যে কোন অবস্থায়ই তা এমন ধরনের অজ্ঞ ও নির্বোধ লোকদের হাতে তুলে দেয়া উচিত নয়, যারা এ অর্থ-সম্পদের ত্রুটিপূর্ণ ব্যবহারের মাধ্যমে তামাদ্দুনিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে এবং শেষ পর্যন্ত নৈতিক ব্যবস্থাকেও ধ্বংসের পথে নিয়ে যায়। কোন ব্যক্তির নিজের সম্পদের ওপর তার মালিকানা অধিকার থাকে ঠিকই। কিন্তু তা এত বেশী সীমাহীন নয় যে, যদি সে ঐ সমস্ত অধিকার সঠিকভাবে ব্যবহার করার যোগ্যতা না রাখে এবং তার ত্রুটিপূর্ণ ব্যবহারের কারণে সামাজিক বিপর্যয় দেখা দেয় তারপরও তার কাছ থেকে ঐ অধিকার হরণ করা যাবে না। মানুষের জীবন যাপনের প্রয়োজনীয় সামগ্রীর চাহিদা অবশ্যই পূর্ণ হতে হবে। তবে মালিকানা অধিকারের অবাধ ব্যবহারের ক্ষেত্রে অবশ্যই বিধি-নিষেধ আরোপিত হওয়া উচিত যে, এ ব্যবহার নৈতিক ও তামাদ্দুনিক জীবন এবং সামগ্রিক অর্থনীতির জন্য সুস্পষ্টভাবে ক্ষতিকর হতে পারবে না। এ বিধান অনুযায়ী প্রত্যেক সম্পদ-সম্পত্তির মালিককে ক্ষুদ্র পরিসরে এদিকে অবশ্যই নজর রাখতে হবে যে, নিজের সম্পদ সে যার হাতে সোপর্দ করছে সে তা ব্যবহারের যোগ্যতা রাখে কিনা। আর বৃহত্তর পরিসরে এটা ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত

www.pathagar.com

হতে হবে যে, যারা নিজেদের সম্পদ ব্যবহারের যোগ্যতা রাখে না অথবা যারা অসৎপথে নিজেদের ধন-সম্পদ ব্যবহার করছে, তাদের ধন-সম্পত্তি সে নিজের পরিচালনাধীনে নিয়ে নেবে এবং তাদের জীবন নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর ব্যবস্থা করে দেবে।

৯. অর্থাৎ যখন তারা সাবালক হয়ে যেতে থাকে তখন তাদের বুদ্ধি-জ্ঞান কি পর্যায়ে বিকশিত হয়েছে তা দেখতে হবে এবং তারা নিজেদের বিষয়াদি আপন দায়িত্বে পরিচালনা করার যোগ্যতা কতটুকু অর্জন করেছে সে দিকেও তীক্ষ্ণ পর্যালোচনার দৃষ্টিতে নজর রাখতে হবে।

১০. ধন-সম্পদ তাদের হাতে সোপর্দ করার জন্য দু'টি শর্ত আরোপ করা হয়েছে। একটি হচ্ছে, সাবালকত্ব আর দ্বিতীয়টি যোগ্যতা, অর্থাৎ অর্থ-সম্পদ সঠিকভাবে ব্যবহার করার যোগ্যতা। প্রথম শর্তটির ব্যাপারে উম্মতের ফকীহগণ একমত। দ্বিতীয় শর্তটির ব্যাপারে ইমাম আবু হানীফা (র.) এর মত হচ্ছে এই যে, সাবালক হবার পরও যদি এতিমের মধ্যে 'যোগ্যতা' না পাওয়া যায়,তাহলে তার অভিভাবককে সর্বাধিক আরো সাত বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। তারপর 'যোগ্যতা' পাওয়া যাক বা না যাক সর্বাবস্থায় ইয়াতিমকে তার ধন-সম্পদের দায়িত্ব দিতে হবে। ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মাদ ও ইমাম শাফেঈ রাহিমাহুমুল্লাহর মতে ধন-সম্পদ ইয়াতিমের হাতে সোপর্দ করার জন্য অবশ্যই 'যোগ্যতা' একটি অপরিহার্য শর্ত। সম্ভবত এঁদের মতে এ ব্যাপারে শরীয়তের বিষয়সমূহের ফয়সালাকারী কাযীর শরণাপন্ন হওয়াই অধিকতর যুক্তিযুক্ত। যদি কাযীর সামনে একথা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে,সংশ্লিষ্ট ইয়াতিমের মধ্যে যোগ্যতা পাওয়া যাচ্ছে না, তাহলে তার বিষয় সম্পত্তি দেখাশুনার জন্য তিনি নিজেই কোন ভালো ব্যবস্থা করবেন।

১১. অর্থাৎ সম্পত্তি দেখাশুনার বিনিময়ে নিজের পারিশ্রমিক ঠিক ততটুকু পরিমাণ গ্রহণ করতে পারে যতটুকু গ্রহণ করাকে একজন নিরপেক্ষ ও সুবিবেচক ব্যক্তি সংগত বলে মনে করতে পারে। তাছাড়া নিজের পারিশ্রমিক হিসেবে সে যতটুকু গ্রহণ করবে, তা গোপনে গ্রহণ করবে না বরং প্রকাশ্যে নির্ধারিত করে গ্রহণ করবে এবং তার হিসাব রাখবে।

www.pathagar.com

২৯ রামাদান
বিষয়: আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের পথ
সূরা তাওবা: ১৭-২৪

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ (17) إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ (18) أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (19) الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ (20) يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ (21) خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ (22) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (23) قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (24)

১৭) মুশরিকরা যখন নিজেরাই নিজেদের কুফরীর সাক্ষ্য দিচ্ছে তখন আল্লাহর মসজিদসমূহের রক্ষণাবেক্ষণকারী ও খাদেম হওয়া তাদের কাজ নয়। [১৯] তাদের সমস্ত আমল বরবাদ হয়ে গেছে [২০] এবং তাদেরকে চিরকাল জাহান্নামে থাকতে হবে।

১৮) তারাই হতে পারে আল্লাহর মসজিদ আবাদকারী (রক্ষণাবেক্ষণকারী ও সেবক) যারা আল্লাহ ও পরকালকে মানে, নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহকে ছাড়া আর কাউকে ভয় করেনা। তাদেরই ব্যাপারে আশা করা যেতে পারে যে, তারা সঠিক সোজা পথে চলবে।

১৯) তোমরা কি হাজীদের পানি পান করানো এবং মসজিদে হারামের রক্ষণাবেক্ষণ করাকে এমন ব্যক্তিদের কাজের সমান মনে করে নিয়েছ যারা ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি ও পরকালের প্রতি এবং সংগ্রাম-সাধনা করেছে আল্লাহর পথে? [২১]

২০) এ উভয় দল আল্লাহর কাছে সমান নয়। আল্লাহ জালেমদের পথ দেখান না। আল্লাহর কাছে তো তারাই উচ্চ মর্যাদার অধিকারী, যারা ঈমান এনেছে এবং তার পথে ঘর-বাড়ি ছেড়েছে ও ধন-প্রাণ সমর্পণ করে জিহাদ করেছে। তারাই সফলকাম।

www.pathagar.com

২১) তাদের রব তাদেরকে নিজের রহমত, সন্তোষ ও এমন জান্নাতের সুখবর দেন, যেখানে তাদের জন্য রয়েছে চিরস্থায়ী সুখের সামগ্রী।

২২) সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। অবশ্যই আল্লাহর কাছে কাজের প্রতিদান দেবার জন্য অনেক কিছুই রয়েছে।

২৩) হে ঈমানদারগণ! তোমাদের বাপ ও ভাইয়েরা যদি ঈমানের ওপর কুফরীকে প্রাধান্য দেয় তাহলে তাদেরকেও নিজেদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না। তোমাদের মধ্যে যারা তাদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবে তারাই জালেম।

২৪) হে নবী! বলে দাও, যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান ও তোমাদের ভাই তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের আত্মীয়-স্বজন, তোমাদের উপার্জিত সম্পদ, তোমাদের যে ব্যবসায়ে মন্দা দেখা দেয়ার ভয়ে তোমরা তটস্থ থাক এবং তোমাদের যে বাসস্থানকে তোমরা খুবই পছন্দ কর-এসব যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এবং তার পথে জিহাদ করার চাইতে তোমাদের কাছে বেশী প্রিয় হয়, তাহলে আল্লাহর ফয়সালা তোমাদের কাছে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর[২২] আল্লাহ ফাসেকদেরকে কখনো সত্য পথের সন্ধান দেন না।

আয়াত সমূহের ব্যাখ্যা

১৯. অর্থাৎ এক আল্লাহর ইবাদত করার জন্য যেসব মসজিদ তৈরী করা হয়েছে সেগুলোর মুতাওয়াল্লী, রক্ষণাবেক্ষণকারী ও সেবক এমন ধরনের লোক হতে পারে না যারা আল্লাহর গুণাবলী, অধিকার ও ক্ষমতা-ইখতিয়ারের ক্ষেত্রে অন্যদের শরিক করে। তারপর তারা নিজেরাই যখন তাওহীদের দাওয়াত গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছে এবং পরিষ্কার বলে দিয়েছে, আমরা নিজেদের ইবাদত বন্দেগী এক আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করতে রাযী নই, তখন একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করার জন্য যে ইবাদত গৃহ তৈরী করা হয়েছে তার মুতাওয়াল্লী হবার অধিকার তারা কোথা থেকে পায়?

এখানে যদিও কথাটা সাধারণভাবেই বলা হয়েছে এবং তাৎপর্যের দিক দিয়েও এটি সর্বক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, তবুও বিশেষভাবে এখানে এর উল্লেখের উদ্দেশ্য হচ্ছে,কাবাঘর ও মসজিদে হারামের ওপর থেকে মুশরিকদের মুতাওয়াল্লীগিরির পাট একেবারে চুকিয়ে দিয়ে সেখানে চিরকালের জন্য তাওহীদবাদীদের অভিভাবকত্ব প্রতিষ্ঠিত করা।

২০. অর্থাৎ প্রকৃত অর্থে বায়তুল্লাহর যে সামান্য কিছু সেবা তারা করেছিল তাও বরবাদ হয়ে গেছে। কারণ এ সেবা কাজের সাথে তারা শিরক ও জাহেলী পদ্ধতি মিশিয়ে একাকার করে ফেলেছিলো। তাদের সেই সামান্য পরিমাণ ভাল কাজকে নস্যাত করে দিয়েছে, তাদের অনেক বড় আকারের অসৎকাজ।

২১. অর্থাৎ কোন তীর্থ কেন্দ্রে পূর্বপুরুষদের গদিনশীন হওয়া, তার রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং এমন কিছু লোক দেখানো ধর্মীয় কাজ করা যার ওপর লোকেরা বৈষয়িক পর্যায়ে

www.pathagar.com

সাধারণত মর্যাদা ও পবিত্রতার ভিত গড়ে তোলে আল্লাহর কাছে এগুলোর কোন মূল্য ও মর্যাদা নেই। আল্লাহর পতি ঈমান আনা ও তার পথে কুরবানী ও ত্যাগ স্বীকার করাই যথার্থ মূল্য ও মর্যাদার অধিকারী। যে ব্যক্তি এসব গুণের অধিকারী হয়, সে কোন উচ্চ বংশ ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের সাথে সম্পর্কিত না হলেও এবং তার কপালে কোন বিশেষ গুণের তকমা, আঁটা না থাকলেও সে-ই যথার্থ মর্যাদাবান ব্যক্তি। কিন্তু যারা এসব গুণের অধিকারী নয়, তারা নিছক বিরাট সম্মানিত ও বুজুর্গ ব্যক্তির সন্তান, দীর্ঘকাল থেকে তাদের পরিবারে গদিনশীনী প্রথা চলে আসছে এবং বিশেষ সময়ে তারা বেশ ধুমধাম সহকারে কিছু ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করে থাকে বলেই কোন প্রকার মর্যাদার অধিকারী হবে না। উপরন্তু এ ধরনের মেকী মৌরুসী অধিকারকে স্বীকৃতি দান করে পবিত্র স্থানসমূহ ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো এ অযোগ্য ও অপাংক্তেয় লোকদের হাতে রেখে দেয়াও কোনক্রমেই বৈধ হতে পারে না।

২২. অর্থাৎ তোমাদের হটিয়ে দিয়ে সেখানে আল্লাহ অন্য কোন দলকে দ্বীনের নিয়ামত দান করবেন। তাদেরকে দ্বীনের ধারক ও বাহক হবার মর্যাদায় উন্নীত করবেন। এ সঙ্গে মানুষকে সৎপথে পরিচালনা করার নেতৃত্বও তাদের হাতে সোপর্দ করবেন।

www.pathagar.com

৩০ রামাদান
বিষয়: দয়াময়ের বান্দার গুণাবলী
সূরা আল-ফুরকান: ৬১-৭৭

تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا (61) وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا (62) وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا (63) وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا (64) وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا (65) إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا (66) وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا (67) وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (68) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا (69) إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (70) وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا (71) وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا (72) وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا (73) وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا (74) أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا (75) خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا (76) قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا (77)

৬১) অসীম বরকত সম্পন্ন তিনি, যিনি আকাশে বুরুজ নির্মাণ করেছেন [৭৫] এবং তার মধ্যে একটি প্রদীপ [৭৬] ও একটি আলোকময় চাঁদ উজ্জ্বল করেছেন।

৬২) তিনিই রাত ও দিনকে পরস্পরের স্থলাভিষিক্ত করেছেন এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য যে শিক্ষা গ্রহণ করতে অথবা কৃতজ্ঞ হতে চায়।[৭৭]

৬৩) রহমানের (আসল) বান্দা তারাই [৭৮] যারা পৃথিবীর বুকে নম্রভাবে চলাফেরা করে [৭৯] এবং মূর্খরা তাদের সাথে কথা বলতে থাকলে বলে দেয়,

৬৪) তোমাদের সালাম।[৮০] তারা নিজেদের রবের সামনে সিজদায় অবনত হয়ে ও দাঁড়িয়ে রাত কাটিয়ে দেয়।[৮১]

৬৫) তারা দোয়া করতে থাকে: "হে আমাদের রব! জাহান্নামের আযাব থেকে আমাদের বাঁচাও, তার আযাব তো সর্বনাশা"।

www.pathagar.com

৬৬) "আশ্রয়স্থল ও আবাস হিসেবে তা বড়ই নিকৃষ্ট জায়গা"। [৮২]

৬৭) তারা যখন ব্যয় করে তখন অযথা ব্যয় করে না এবং কার্পণ্যও করেনা বরং উভয় প্রান্তিকর মাঝামাঝি তাদের ব্যয় ভারসাম্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে।[৮৩]

৬৮) তারা আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপাস্যকে ডাকে না, আল্লাহ যে প্রাণকে হারাম করেছেন কোন সঙ্গত কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করেনাএবং ব্যভিচার করে না। [৮৪] এসব যে-ই করে সে তার গোনাহের শাস্তি ভোগ করবে।

৬৯) কিয়ামতের দিন তাকে উপর্যপুরি শাস্তি দেয়া হবে [৮৫] এবং সেখানেই সে পড়ে থাকবে চিরকাল লাঞ্ছিত অবস্থায়।

৭০) তবে তারা ছাড়া যারা (ঐসব গোনাহের পর) তাওবা করেছে এবং ইমান এনে সৎকাজ করতে থেকেছে।[৮৬] এ ধরনের লোকদের সৎ কাজগুলোকে আল্লাহ সৎকাজের দ্বারা পরিবর্তন করে দেবেন [৮৭] এবং আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও মেহেরবান।

৭১) যে ব্যক্তি তাওবা করে সৎকাজের পথ অবলম্বন করে, সে তো আল্লাহর দিকে ফিরে আসার মতই ফিরে আসে।[৮৮]

৭২) (আর রহমানের বান্দা হচ্ছে তারা) যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না [৮৯] এবং কোন বাজে জিনিসের কাছ দিয়ে পথ অতিক্রম করতেথাকলে ভদ্রলোকের মত অতিক্রম করে যায়।[৯০]

৭৩) তাদের যদি তাদের রবের আয়াত শুনিয়ে উপদেশ দেয় হয় তাহলে তারা তার প্রতি অন্ধ বধির হয়ে থাকে না।[৯১]

৭৪) তারা প্রার্থনা করে থাকে, "হে আমাদের রব! আমাদের নিজেদের স্ত্রীদের ও নিজেদের সন্তানদেরকে নয়ন শীতলকারী বানাও [৯২] এবং আমাদের করে দাও মুত্তাকীদের ইমাম"। [৯৩]

৭৫) (এরাই নিজেদের সবরের [৯৪] ফল উন্নত মনজিলের আকারে পাবে।[৯৫] অভিবাদন ও সালাম সহকারে তাদের সেখানে অভ্যর্থনা জানানো হবে।

৭৬) তারা সেখানে থাকবে চিরকাল। কী চমৎকার সেই আশ্রয় এবং সেই আবাস!

৭৭) হে মুহাম্মদ! লোকদের বলো, "আমার রবের তোমাদের কি প্রয়োজন, যদি তোমারা তাকে না ডাকো।[৯৬] এখন যে তোমরা মিথ্যা আরোপ করেছো, শিগগীর এমন শাস্তি পাবে যে, তার হাত থেকে নিস্তার পাওয়া সম্ভব হবে না।

আয়াত সমূহের ব্যাখ্যা

৭৫. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল হিজর ৮-১২ টীকা।

www.pathagar.com

৭৬. অর্থাৎ সূর্য। যেমন সূরা নূহে পরিষ্কার করে বলা হয়েছে। (আর সূর্যকে প্রদীপ বানিয়েছেন) [আয়াতঃ ১৬]

৭৭. এ দু'টি ভিন্ন ধরনের মর্যাদা কিন্তু স্বভাবের দিক দিয়ে এরা পরস্পরের জন্য অপরিহার্য। দিন-রাত্রির আবর্তন ব্যবস্থা সম্পর্কে চিন্তা করার ফলে মানুষ প্রথমে এ থেকে তাওহীদের শিক্ষা লাভ করে এবং আল্লাহ থেকে গাফেল হয়ে গিয়ে থাকলে সংগে সংগেই সজাগ হয়ে যায়। এর দ্বিতীয় ফল হয়, আল্লাহর রবুবীয়াতের অনুভূতি জাগ্রত হয়ে মানুষ আল্লাহর সমীপে মাথা নত করে এবং কৃতজ্ঞতার প্রতিমূর্তিতে পরিণত হয়।

৭৮. অর্থাৎ যে রহমানকে সিজদা করার জন্য তোমাদের বলা হচ্ছে এবং তোমরা তা অস্বীকার করছো, সবাই তো তাঁর জন্মগত বান্দা কিন্তু সচেতনতা সহকারে বন্দেগীর পথ অবলম্বন করে যারা এসব বিশেষ গুণাবলী নিজেদের মধ্যে সৃষ্টি করে তারাই তাঁর প্রিয় ও পছন্দনীয় বান্দা। তাছাড়া তোমাদের যে সিজদা করার দাওয়াত দেয়া হচ্ছে তার ফলাফল তার বন্দেগীর পথ অবলম্বনকারীদের জীবনে দেখা যাচ্ছে এবং তা অস্বীকার করার ফলাফল তোমাদের নিজেদের জীবন থেকে পরিস্ফুটিত হচ্ছে। এখানে আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে চরিত্র ও নৈতিকতার দু'টি আদর্শের তুলনা করা। একটি আদর্শ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসারীদের মধ্যে সৃষ্টি হচ্ছিল এবং দ্বিতীয় আদর্শটি জাহেলীয়াতের অনুসারী লোকদের মধ্যে সর্বত্র পাওয়া যাচ্ছিল। কিন্তু এ তুলনামূলক আলোচনার জন্য শুধুমাত্র প্রথম আদর্শ চরিত্রের সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলো সামনে রাখা হয়েছে। দ্বিতীয় আদর্শকে প্রত্যেক চক্ষুষ্মান ও চিন্তাশীল ব্যক্তির দৃষ্টিশক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে, যাতে সে নিজেই প্রতিপক্ষের ছবি দেখে নেয় এবং নিজেই উভয়ের তুলনামূলক পর্যালোচনা করে। তার চিত্র পৃথকভাবে পেশ করার প্রয়োজন ছিল না। কারণ চারপাশের সকল সমাজে তার সোচ্চার উপস্থিতি ছিল।

৭৯. অর্থাৎ অহংকারের সাথে বুক ফুলিয়ে চলে না। গর্বিত স্বৈরাচারী ও বিপর্যয়কারীর মতো নিজের চলার মাধ্যমে নিজের শক্তি প্রকাশ করার চেষ্টা করে না। বরং তাদের চালচলন হয় একজন ভদ্র, মার্জিত ও সৎস্বভাব সম্পন্ন ব্যক্তির মতো। নম্রভাবে চলার মানে দুর্বল ও রুগীর মতো চলা নয় এবং একজন প্রদর্শন অভিলাষী নিজের বিনয় প্রদর্শন করার বা নিজের আল্লাহ ভীতি দেখাবার জন্য যে ধরনের কৃত্রিম চলার ভঙ্গী সৃষ্টি করে সে ধরনের কোন চলাও নয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে চলার সময় এমন শক্তভাবে পা ফেলতেন যেন মনে হতো উপর থেকে ঢালুর দিকে নেমে যাচ্ছেন। উমরের ব্যাপারে হাদীসে বলা হয়েছে, তিনি এক যুবককে দুর্বলভাবে হেঁটে যেতে দেখে তাকে থামিয়ে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি অসুস্থ। সে বলে, না। তিনি ছড়ি উঠিয়ে তাকে ধমক দিয়ে বলেন, শক্ত হয়ে সবল ব্যক্তির মতো চলো। এ থেকে জানা যায়, নম্রভাবে চলা মানে, একজন ভালো মানুষের স্বাভাবিকভাবে চলা। কৃত্রিম বিনয়ের সাহায্যে যে চলার ভঙ্গী সৃষ্টি করা হয় অথবা যে চলার মধ্য দিয়ে বানোয়াট দীনতা ও দুর্বলতার প্রকাশ ঘটানো হয় তাকে নম্রভাবে চলা বলে না।

www.pathagar.com

কিন্তু চিন্তার বিষয় হচ্ছে, মানুষের চলার মধ্যে এমন কি গুরুত্ব আছে যে কারণে আল্লাহর সৎ বান্দাদের বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ প্রসঙ্গে সর্বপ্রথম এর কথা বলা হয়েছে। এ প্রশ্নটিকে যদি একটু গভীর দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করা হয় তাহলে বুঝা যায় যে, মানুষের চলা শুধুমাত্র তার হাঁটার একটি ভঙ্গির নাম নয় বরং আসলে এটি হয় তার মন-মানস, চরিত্র ও নৈতিক কার্যাবলীর প্রত্যক্ষ প্রতিফলন। একজন আত্মমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তির চলা, একজন গুন্ডা ও বদমায়েশের চলা, একজন স্বৈরাচারী ও জালেমের চলা, একজন আত্মম্ভরী অহংকারীর চলা, একজন সভ্য-ভব্য ব্যক্তির চলা, একজন দরিদ্র-দীনহীনের চলা এবং এভাবে অন্যান্য বিভিন্ন ধরনের লোকদের চলা পরস্পর থেকে এত বেশী ভিন্ন হয় যে, তাদের প্রত্যেককে দেখে কোন ধরনের চলার পেছনে কোন ধরনের ব্যক্তিত্ব কাজ করছে তা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে। কাজেই আয়াতের মূল বক্তব্য হচ্ছে, রহমানের বান্দাদের তোমরা সাধারণ লোকদের মধ্যে চলাফেরা করতে দেখেই তারা কোন ধরনের লোক পূর্ব পরিচিত ছাড়াই আলাদাভাবে তা চিহ্নিত করতে পারবে। এ বন্দেগী তাদের মানসিকতা ও চরিত্র যেভাবে তৈরী করে দিয়েছে তার প্রভাব তাদের চালচলনেও সুস্পষ্ট হয়। এক ব্যক্তি তাদের দেখে প্রথম দৃষ্টিতে জানতে পারে, তারা ভদ্র, ধৈর্যশীল ও সহানুভূতিশীল হৃদয়বৃত্তির অধিকারী, তাদের দিক থেকে কোন প্রকার অনিষ্টের আশংকা করা যেতে পারে না। (আরো বেশি ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা বনি ইসরাঈল ৪৩, সূরা লোকমান ৩৩ টীকা)

৮০. মূর্খ মানে অশিক্ষিত বা লেখাপড়া না জানা লোক নয় বরং এমন লোক যারা জাহেলী কর্মকান্ডে লিপ্ত হবার উদ্যোগ নিয়েছে এবং কোন ভদ্রলোকের সাথে অশালীন ব্যবহার করতে শুরু করেছে। রহমানের বান্দাদের পদ্ধতি হচ্ছে, তারা গালির জবাবে গালি এবং দোষারোপের জবাবে দোষারোপ করে না। এভাবে প্রত্যেক বেহুদাপনার জবাবে তারাও সমানে বেহুদাপনা করে না। বরং যারাই তাদের সাথে এহেন আচরণ করে তাদের সালাম দিয়ে তারা অগ্রসর হয়ে যায়, যেমন কুরআনের অন্য জায়গায় বলা হয়েছেঃ

"আর যখন তারা কোন বেহুদা কথা কথা শোনে, তা উপেক্ষা করে যায়। বলে, আরে ভাই, আমাদের কাজের ফল আমরা পাবো এবং তোমাদের কাজের ফল তোমরা পাবে। সালাম তোমাদের, আমরা জাহেলদের সাথে কথা বলি না"। (আল কাসাসঃ ৫৫) [ব্যাখ্যার জন্য দেখুন- তাফহীমুল কুরআন, আল কাসাস ৭২ ও ৭৮ টীকা]

৮১. অর্থাৎ ওটা ছিল তাদের দিনের জীবন এবং এটা হচ্ছে রাতের জীবন। তাদের রাত আরাম-আয়েশে, নাচ-গানে, খেলা-তামাশায়, গপ-সপে এবং আড্ডাবাজী ও চুরি-চামারিতে অতিবাহিত হয় না। জাহেলীয়াতের এসব পরিচিত বদ কাজগুলোর পরিবর্তে তারা এ সমাজে এমন সব সৎকর্ম সম্পাদনকারী যাদের রাত কেটে যায় আল্লাহর দরবারে দাঁড়িয়ে, বসে শুয়ে দোয়া ও ইবাদাত করার মধ্য দিয়ে। কুরআন মাজীদের

www.pathagar.com

বিভিন্ন স্থানে তাদের জীবনের এ দিকগুলো সুস্পষ্ট করে তুলে ধরা হয়েছে। যেমন সূরা সাজদায় বলা হয়েছে:

"তাদের পিঠ বিছানা থেকে আলাদা থাকে, নিজেদের রবকে ডাকতে থাকে আশায় ও আশংকায়"। (১৬ আয়াত)

সূরা যারিয়াতে বলা হয়েছে: "এ সকল জান্নাতবাসী ছিল এমন সব লোক যারা রাতে সামান্যই ঘুমাতো এবং ভোর রাতে মাগফিরাতের দোয়া করতো"। (১৭-১৮ আয়াত)

সূরা যুমারে বলা হয়েছে: "যে ব্যক্তি হয় আল্লাহর হুকুম পালনকারী, রাতের বেলা সিজদা করে ও দাঁড়িয়ে থাকে, আখেরাতকে ভয় করে এবং নিজের রবের রহমতের প্রত্যাশা করে তার পরিণাম কি মুশরিকের মতো হতে পারে"। (আয়াত: ৯)

৮২. অর্থাৎ এ ইবাদাত তাদের মধ্যে কোন অহংকারের জন্ম দেয় না। আমরা তো আল্লাহর প্রিয়, কাজেই আগুন আমাদের কেমন করে স্পর্শ করতে পারে, এ ধরনের আত্মগর্বও তাদের মনে সৃষ্টি হয় না। বরং নিজেদের সমস্ত সৎকাজ ও ইবাদত-বন্দেগী সত্ত্বেও তারা এ ভয়ে কাঁপতে থাকে যে, তাদের কাজের ভুল-ত্রুটিগুলো বুঝি তাদের আযাবের সম্মুখীন করলো। নিজেদের তাক্ওয়ার জোরে জান্নাত জয় করে নেবার অহংকার তারা করে না। বরং নিজেদের মানবিক দুর্বলতাগুলো মনে করে এবং এজন্যও নিজেদের কার্যাবলীর উপর নয় বরং আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহের উপর থাকে তাদের ভরসা।

৮৩. অর্থাৎ তাদের অবস্থা এমন নয় যে, আরাম-আয়েশ, বিলাস-ব্যসন, মদ-জুয়া, ইয়ার-বন্ধু, মেলা-পার্বন ও বিয়ে-শাদীর পেছনে অঢেল পয়সা খরচ করছে এবং নিজের সামর্থের চেয়ে অনেক বেশী করে নিজেকে দেখাবার জন্য খাবার-দাবার, পোষাক-পরিচ্ছদ, বাড়ি-গাড়ি, সাজগোজ ইত্যাদির পেছনে নিজের টাকা-পয়সা ছড়িয়ে চলছে। আবার তারা নিজেরা অর্থলোভীর মতো নয় যে এক একটা একটা পয়সা গুণে রাখে। এমন অবস্থাও তাদের নয় যে, নিজেও খায় না, নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী নিজের ছেলেমেয়ে ও পরিবারের লোকজনদের প্রয়োজনও পূর্ণ করে না এবং প্রাণ খুলে কোন ভালো কাজে কিছু ব্যয়ও করে না। আরবে এ দু'ধরনের লোক বিপুল সংখ্যায় পাওয়া যেতো। একদিকে ছিল একদল লোক যারা প্রাণ খুলে খরচ করতো। কিন্তু প্রত্যেকটি খরচের উদ্দেশ্য হতো ব্যক্তিগত বিলাসিতা ও আরাম-আয়েশ অথবা গোষ্ঠির মধ্যে নিজেকে উঁচু মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত রাখা এবং নিজের দানশীলতা ও ধনাঢ্যতার ডংকা বাজানো। অন্যদিকে ছিল সর্বজন পরিচিত কৃপণের দল। ভারসাম্যপূর্ণ নীতি খুব কম লোকের মধ্যে পাওয়া যেতো। আর এই কম লোকদের মধ্যে সবচেয়ে অগ্রগণ্য ছিলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণ।

এ প্রসংগে অমিতব্যয়িতা ও কার্পণ্য কি জিনিস তা জানা উচিত। ইসলামের দৃষ্টিতে তিনটি জিনিসকে অমিতব্যয়িতা বলা হয়। এক: অবৈধ কাজে অর্থ ব্যয় করা, তা একটি

www.pathagar.com

পয়সা হলেও। **দুই:** বৈধ কাজে ব্যয় করতে গিয়ে সীমা ছাড়িয়ে যাওয়া। এ ক্ষেত্রে সে নিজের সামর্থের চাইতে বেশী ব্যয় করে অথবা নিজের প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশী যে অর্থসম্পদ সে লাভ করেছে তা নিজেরই বিলাস-ব্যসনে ও বাহ্যিক আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানে ব্যয় করতে পারে। **তিন:** সৎকাজে ব্যয় করা। কিন্তু আল্লাহর জন্য নয় বরং অন্য মানুষকে দেখাবার জন্য। পক্ষান্তরে কার্পণ্য বলে বিবেচিত হয় দু'টি জিনিস। **এক:** মানুষ নিজের ও নিজের পরিবার-পরিজনদের প্রয়োজন পূরণের জন্য নিজের সামর্থ ও মর্যাদা অনুযায়ী ব্যয় করে না। **দুই:** ভালো ও সৎকাজে তার পকেট থেকে পয়সা বের হয় না। এ দু'টি প্রান্তিকতার মাঝে ইসলামই হচ্ছে ভারসাম্যের পথ। এ সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

"নিজের অর্থনৈতিক বিষয়াদিতে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা মানুষের ফকীহ (জ্ঞানবান) হবার অন্যতম আলামত"। (আহমদ ও তাবারানী, বর্ণনাকারী আবু দারদা)

৮৪. অর্থাৎ আরববাসীরা যে তিনটি বড় গোনাহের সাথে বেশী করে জড়িত থাকে সেগুলো থেকে তারা দূরে থাকে। একটি হলো শির্ক, দ্বিতীয়টি অন্যায়ভাবে হত্যা করা এবং তৃতীয়টি যিনা। এ বিষয়বস্তুটিই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিপুল সংখ্যক হাদীসে বর্ণনা করেছেন। যেমন আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণিত হাদীস। তাতে বলা হয়েছে: একবার নবীকে (সা) জিজ্ঞেস করা হলো, সবচেয়ে বড় গোনাহ কি। তিনি বললেন: "তুমি যদি কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ প্রতিদ্বন্দী দাঁড় করাও। অথচ আল্লাহই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন"। জিজ্ঞেস করা হলো, তারপর। বললেন: "তুমি যদি তোমার সন্তানকে হত্যা কর এই ভয়ে যে সে তোমার সাথে আহারে অংশ নেবে"। জিজ্ঞেস করা হলো, তারপর। বললেন: "তুমি যদি তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে যিনা কর"। (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ ও আহমদ) যদিও আরো অনেক কবীরা গোনাহ আছে কিন্তু সেকালের আরব সমাজে এ তিনটি গোনাহই সবচেয়ে বেশী জেঁকে বসেছিল। তাই এক্ষেত্রে মুসলমানদের এ বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট করে তুলে ধরা হয়েছিল যে, সমগ্র আরব সমাজে মাত্র এ গুটিকয় লোকই এ পাপগুলো থেকে মুক্ত আছে।

এখানে প্রশ্ন করা যেতে পারে, মুশরিকদের দৃষ্টিতে তো শির্ক থেকে দূরে থাকা ছিল একটি মস্ত বড় দোষ, এক্ষেত্রে একে মুসলমানদের একটি প্রধান গুণ হিসেবে তাদের সামনে তুলে ধরার যৌক্তিকতা কি ছিল। এর জবাব হচ্ছে আরববাসীরা যদিও শির্কে লিপ্ত ছিল এবং এ ব্যাপারে তারা অত্যন্ত কঠোর মনোভাবের অধিকারী ছিল কিন্তু আসলে এর শিকড় উপরিভাগেই সীমাবদ্ধ ছিল, গভীর তলদেশে পৌঁছেনি। দুনিয়ার কোথাও কখনো শির্কের শিকড় মানব প্রকৃতির গভীরে প্রবিষ্ট থাকে না। বরং নির্ভেজাল আল্লাহ বিশ্বাসের মহত্ব তাদের মনের গভীরে শিকড় গেড়ে বসেছিল। তাকে উদ্দীপিত করার জন্য শুধুমাত্র উপরিভাগে একটুখানি আঁচড় কাটার প্রয়োজন ছিল। জাহেলিয়াতের ইতিহাসের বহুতর ঘটনাবলী এ দু'টি কথার সাক্ষ্য দিয়ে থাকে। যেমন আবরাহার হামলার সময় কুরাইশদের প্রত্যেকটি শিশুও জানতো যে, কাবাগৃহে রক্ষিত মূর্তিগুলো এ

www.pathagar.com

বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারবে না বরং একমাত্র এ গৃহের মালিক আল্লাহই এ বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারেন। হাতি সেনাদের ধ্বংসের পর সমকালীন কবিরা যে সব কবিতা ও কাসীদা পাঠ করেছিলেন এখনো সেগুলো সংরক্ষিত আছে। সেগুলোর প্রতিটি শব্দ সাক্ষ্য দিচ্ছে, তারা এ ঘটনাকে নিছক মহান আল্লাহর শক্তির প্রকাশ মনে করতো এবং এতে তাদের উপাস্যদের কোন কৃতিত্ব আছে বলে ভুলেও মনে করতো না। এ সময় কুরাইশ ও আরবের সমগ্র মুশরিক সমাজের সামনে শির্কের নিকৃষ্টতম পরাকাষ্ঠাও প্রদর্শিত হয়েছিল। আবরাহা মক্কা যাওয়ার পথে তায়েফের কাছাকাছি পৌঁছে গেলে তায়েফবাসীরা আবরাহা কর্তৃক তাদের 'লাত' দেবতার মন্দির বিধ্বস্থ হওয়ার আশংকায় তাকে কাবা ধ্বংসের কাজে সহযোগিতা করার আশ্বাস দিয়েছিল এবং পার্বত্য পথে তার সৈন্যদের নিরাপদে মক্কায় পৌঁছিয়ে দেবার জন্য পথ প্রদর্শকও হয়েছিল। এ ঘটনার তিক্ত স্মৃতি কুরাইশদেরকে দীর্ঘদিন পর্যন্ত মানসিকভাবে পীড়ন করতে থাকে এবং বছরের পর বছর তারা তায়েফের পথ প্রদর্শকের কবরে প্রস্তর নিক্ষেপ করতে থাকে। তাছাড়া কুরাইশ ও অন্যান্য আরববাসীরা নিজেদের দ্বীনকে হযরত ইবরাহীমের আনীত দ্বীন মনে করতো। নিজেদের বহু ধর্মীয় ও সামাজিক রীতিনীতি এবং বিশেষ করে হজ্জের নিয়মকানুন ও রসম রেওয়াজকে ইবরাহীমের দ্বীনের অংশ গণ্য করতো। তারা একথাও মানতো যে, হযরত ইবরাহীম একমাত্র আল্লাহর বন্দেগী করতেন এবং তিনি কখনো মূর্তিপূজা করেননি। তাদের মধ্যে যেসব কথা ও কাহিনী প্রচলিত ছিল তাতে মূর্তি পূজার প্রচলন তাদের দেশে কবে থেকে শুরু হয়েছিল এবং কোন মূর্তিটিকে কবে কোথায় থেকে এনেছিলেন তার বিস্তারিত বিবরণ সংরক্ষিত ছিল। একজন সাধারণ আরবের মনে নিজের উপাস্য দেবতাদের প্রতি যে ধরনের ভক্তি-শ্রদ্ধা ছিল তা এভাবে অনুমান করা যেতে পারে যে, কখনো তার প্রার্থনা ও আশা-আকাঙ্খা বিরোধী কোন ঘটনা ঘটে গেলে অনেক সময় নিজের উপাস্য দেবতাদেরকেই সে তিরস্কার করতো, তাদেরকে অপমান করতো এবং তাদের সামনে নযরানা পেশ করতো না। একজন আরব নিজের পিতার হত্যাকারী থেকে প্রতিশোধ নিতে চাচ্ছিল। 'যুল খালাসাহ' নামক ঠাকুরের আস্তানায় গিয়ে সে ধর্ণা দেয় এবং এ ব্যাপারে তার ভবিষ্যত কর্মপন্থা জানতে চায়। সেখান থেকে এ ধরনের কাজ না করার জবাব আসে। এতে আরবটি ক্রুদ্ধ হয়ে বলতে থাকেঃ

অর্থাৎ "হে যুল খালাস! তুমি যদি হতে আমার জায়গায়

নিহত হতো যদি তোমার পিতা

তাহলে কখনো তুমি মিথ্যাচারী হতে না

বলতে না প্রতিশোধ নিয়ো না জালেমদের থেকে"।

অন্য একজন আরব তার উটের পাল নিয়ে যায় সা'দ নামক দেবতার আস্তানায় তাদের জন্য বরকত লাভ করার উদ্দেশ্যে। এটি ছিল একটি লম্বা ও দীর্ঘ মূর্তি। বলির পশুর ছোপ ছোপ রক্ত তার গায়ে লেপেছিল। উটেরা তা দেখে লাফিয়ে ওঠে এবং চারিদিকে

www.pathagar.com

ছুটে পালিয়ে যেতে থাকে। আরবটি তার উটগুলো এভাবে চারিদিকে বিশৃঙ্খলভাবে ছুটে যেতে দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। সে মূর্তিটির গায়ে পাথর মারতে মারতে বলতে থাকে: "আল্লাহ তোর সর্বনাশ করুক। আমি এসেছিলাম বরকত নেবার জন্য কিন্তু তুই তো আমার এই বাকি উটগুলোকেও ভাগিয়ে দিয়েছিস"। অনেক মূর্তি ছিল যেগুলো সম্পর্কে বহু ন্যাক্কারজনক গল্প প্রচলিত ছিল। যেমন ছিল আসাফ ও নায়েলার ব্যাপার। এ দু'টি মূর্তি ছিল সাফা ও মারওয়াও ওপর। এদের সম্পর্কে প্রচলিত ছিল যে, এরা দু'জন ছিল মূলত একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোক। এরা কাবাঘরের মধ্যে যিনা করে। ফলে আল্লাহ তাদেরকে পাথরে পরিণত করে দেন। যেসব দেবতার এ হচ্ছে আসল রূপ, তাদের পূজারী ও ভক্তদের মনে তাদের কোন যথার্থ মর্যাদা থাকতে পারে না। এসব দিক সামনে রাখলে এ কথা সহজে অনুধাবন করা যায় যে, আল্লাহর প্রতি নির্ভেজাল আনুগত্যের একটি সুগভীর মূল্যবোধ তাদের অন্তরের অন্তস্থলে বিরাজিত ছিল। কিন্তু একদিকে অন্ধ রক্ষণশীলতা তাকে দমিয়ে রেখেছিল এবং অন্যদিকে কুরাইশ পুরোহিতরা এর বিরুদ্ধে হিংসা ও বিদ্বেষ উদ্দীপিত করে তুলছিল। কারণ তারা আশংকা করছিল দেবতাদের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা খতম হয়ে গেলে আরবে তাদের যে কেন্দ্রীয় প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে তা খতম হয়ে যাবে এবং তাদের অর্থোপার্জনও বাধাগ্রস্থ হবে। এসব উপাদানের ভিত্তিতে যে মুশরিকী প্রতিষ্ঠিত ছিল তা তাওহীদের দাওয়াতের মোকাবিলায় কোন গুরুত্ব ও মর্যাদা সহকারে দাঁড়াতে পারতো না। তাই কুরআন নিজেই মুশরিদেরকে সম্বোধন করে উদাত্ত কণ্ঠে বলেছে: তোমাদের সমাজে যেসব কারণে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসারীরা শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে তার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে, তারা শির্কমুক্ত এবং নির্ভেজাল আল্লাহর বন্দেগী ও আনুগত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এদিক থেকে মুসলমানদের শ্রেষ্ঠত্বকে মুশরিকরা মুখে মেনে নিতে না চাইলেও মনে মনে তারা এর ভারীত্ব অনুভব করতো"।

৮৫. এর দু'টি অর্থ হতে পারে। **এক:** এ শাস্তির ধারা খতম হবে না বরং একের পর এক জারী থাকবে। **দুই:** যে ব্যক্তি কুফরী, শির্ক বা নাস্তিক্যবাদের সাথে হত্যা ও অন্যান্য গোনাহের বোঝা মাথায় নিয়ে যাবে সে বিদ্রোহের শাস্তি আলাদাভাবে ভোগ করবে এবং অন্যান্য প্রত্যেকটি অপরাধের শাস্তি ভোগ করবে আলাদা আলাদাভাবে। তার ছোট বড় প্রত্যেকটি অপরাধ শুমার করা হবে। কোন একটি ভুলও ক্ষমা করা হবে না। হত্যার জন্য একটি শাস্তি দেয়া হবে না বরং হত্যার প্রত্যেকটি কর্মের জন্য পৃথক পৃথক শাস্তি দেয়া হবে। যিনার শাস্তিও একবার হবে না বরং যতবারই সে এ অপরাধটি করবে প্রত্যেকবারের জন্য পৃথক পৃথক শাস্তি পাবে। তার অন্যান্য অপরাধ ও গোনাহের শাস্তিও এ রকমই হবে।

৮৬. যারা ইতিপূর্বে নানা ধরনের অপরাধ করেছে এবং এখন সংশোধন প্রয়াসী হয়েছে তাদের জন্য এটি একটি সুসংবাদ। এটি ছিল সাধারণ ক্ষমার (General Amnesty) একটি ঘোষণা। এ ঘোষণাটিই সেকালের বিকৃত সমাজের লাখো লাখো লোককে স্থায়ী

www.pathagar.com

বিকৃতি থেকে বাঁচাতে সাহায্য করে। এটিই তাদেরকে আশার আলো দেখায় এবং অবস্থা সংশোধনে উদ্বুদ্ধ করে। অন্যথায় যদি তাদেরকে বলা হতো, তোমরা যে পাপ করেছো তার শাস্তি থেকে এখন কোন প্রকারেই নিস্কৃতি পেতে পারো না, তাহলে এটি তাদেরকে হতাশ করে চিরকালের জন্য পাপ সাগরে ডুবিয়ে দিতো এবং তাদের সংশোধনের আর কোন সম্ভাবনাই থাকতো না। অপরাধীকে একমাত্র ক্ষমার আশাই অপরাধের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করতে পারে। নিরাশ হবার পর সে ইবলিসে পরিণত হয়। তাওবার এ নিয়ামতটি আরবের বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট লোকদেরকে কিভাবে সঠিক পথে এনেছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আমলে সংঘটিত বিভিন্ন ঘটনা থেকে তা অনুমান করা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে। ইবনে জারীর ও তাবারানী এ ঘটনাটি উদ্ধৃত করেছেন। হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, একদিন আমি মসজিদে নববী থেকে এশার নামায পড়ে ফিরছি এমন সময় দেখি এক ভদ্রমহিলা আমার দরজায় দাঁড়িয়ে। আমি তাকে সালাম দিয়ে আমার কামরায় চলে গেলাম এবং দরজা বন্ধ করে নফল নামাজ পড়তে থাকলাম। কিছুক্ষণ পর সে দরজার কড়া নাড়লো। আমি উঠে দরজা খুলে দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম কি চাও। সে বলতে লাগলো, আমি আপনার কাছে একটি প্রশ্ন করতে এসেছি। আমি যিনা করেছি। আমার পেটে অবৈধ সন্তান ছিল। সন্তান ভূমিষ্ট হবার পরে আমি তাকে মেরে ফেলেছি। এখন আমি জানতে চাই আমার গোনাহ মাফ হবার কোন পথ আছে কি না। আমি বললাম, না কোনক্রমেই মাফ হবে না। সে বড়ই আক্ষেপ সহকারে হা-হুতাশ করতে করতে চলে গেলো। সে বলতে থাকলো : "হায়! এ সৌন্দর্য আগুনের জন্য সৃষ্টি হয়েছিল"। সকালে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পেছনে নামায শেষ করার পর আমি তাঁকে রাতের ঘটনা শুনালাম। তিনি বললেন: আবু হুরায়রা, তুমি বড়ই ভুল জবাব দিয়েছো। তুমি কি কুরআনে এ আয়াত পড়নি:-

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ জবাব শুনে আমি সংগে সংগেই বের হয়ে পড়লাম। মহিলাটিকে খুঁজতে লাগলাম। রাতে এশার সময়ই তাকে পেলাম। আমি তাকে সুখবর দিলাম। তাকে বললাম, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমার প্রশ্নের এ জওয়াব দিয়েছেন। শোনার সাথে সাথেই সে সিজদানত হলো এবং বলতে থাকলো, সেই আল্লাহর শোকর যিনি আমার জন্য ক্ষমার দরজা খুলে দিয়েছেন। তারপর সে গোনাহ থেকে তাওবা করলো এবং নিজের বাঁদীকে তার পুত্রসহ মুক্ত করে দিল। হাদীসে প্রায় একই ধরনের অন্য একটি ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। সেটি একটি বৃদ্ধের ঘটনা। তিনি এসে রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে আরজ করছিলেন: হে আল্লাহর রাসূল! সারা জীবন গোনাহের মধ্যে কেটে গেলো। এমন কোন গোনাহ নেই যা করিনি। নিজের গোনাহ যদি দুনিয়ার সমস্ত লোকদের মধ্যে ভাগ করে দেই তাহলে সবাইকে গোনাহের সাগরে ডুবিয়ে দেবে। এখনো কি আমার ক্ষমার পথ আছে।। জবাব দিলেন: তুমি কি ইসলাম গ্রহণ করেছো। বৃদ্ধ বললেন: আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই এবং মুহাম্মাদ (সা) আল্লাহর রাসূল। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন: যাও, আল্লাহ

www.pathagar.com

গোনাহ মাফ করবেন এবং তোমার গোনাহগুলোকে নেকীতে পরিণত করে দেবেন। বৃদ্ধ বললেনঃ আমার সমস্ত অপরাধ ও পাপ কি ক্ষমা করবেন। জবাব দিলেনঃ হ্যাঁ, তোমার সমস্ত অপরাধ ও পাপ ক্ষমা করে দেবেন। (ইবনে কাসীর, ইবনে আবী হাতেমের বরাত দিয়ে)

৮৭. এর দু'টি অর্থ হয়। **এক**ঃ যখন তারা তাওবা করবে তখন ইতিপূর্বে কুফরী জীবনে তারা যে সমস্ত খারাপ কাজ করতো তার জায়গায় এখন ঈমান আনুগত্যের জীবনে মহান আল্লাহ তাদের সৎকাজ করার সুযোগ দেবেন এবং তারা সৎকাজ করতে থাকবে। ফলে সৎকাজ তাদের অসৎ কাজের জায়গা দখল করে নেবে। **দুই**ঃ তাওবার ফলে কেবল তাদের আমলনামা থেকে তারা কুফরী ও গোনাহগারির জীবনে যেসব অপরাধ করেছিল সেগুলো কেটে দেয়া হবে না বরং তার পরিবর্তে প্রত্যেকের আমলনামায় এ নেকী লেখা হবে যে, এ হচ্ছে সেই বান্দা যে বিদ্রোহ ও নাফরমানির পথ পরিহার করে আনুগত্য ও হুকুম মেনে চলার পথ অবলম্বন করেছে। তারপর যতবারই সে নিজের পূর্ববর্তী জীবনের খারাপ কাজগুলো স্মরণ করে লজ্জিত হতে থাকবে এবং নিজের প্রভূ রাব্বুল আলামীনের কাছে তাওবা করতে থাকবে ততটাই নেকী তার ভাগ্যে লিখে দেয়া হবে। কারণ ভুলের জন্য লজ্জিত হওয়া ও ক্ষমা চাওয়াই একটি নেকীর কাজ। এভাবে তার আমলনামায় পূর্বেকার সমস্ত পাপের জায়গা দখল করে নেবে পরবর্তীকালের নেকীসমূহ এবং কেবলমাত্র শাস্তি থেকে নিস্কৃতি পাওয়ার মধ্যেই তার পরিণাম সীমিত থাকবে না বরং উল্টো তাকে পুরস্কৃতও করা হবে।

৮৮. অর্থাৎ প্রকৃতিগতভাবে তাঁর দরবারই বান্দার আসল ফিরে আসার জায়গা এবং নৈতিক দিক দিয়েও তাঁর দরবারই এমন একটি জায়গা যেদিকে তার ফিরে আসা উচিত। আবার ফলাফলের দিক দিয়েও তাঁর দরবারের দিকে ফিরে আসা লাভজনক। নয়তো দ্বিতীয় এমন কোন জায়গা নেই যেখানে এসে মানুষ শাস্তি থেকে বাঁচতে পারে অথবা পুরস্কার পেতে পারে। এছাড়া এর অর্থ এও হয় যে, এমন একটি দরবারের দিকে ফিরে যায় যেখানে সত্যি ফিরে যাওয়া যেতে পারে, যেটি সর্বোত্তম দরবার, সমস্ত কল্যাণ যেখান থেকে উৎসারিত হয়, যেখান থেকে লজ্জিত অপরাধীকে খেদিয়ে দেওয়া হয় না বরং ক্ষমা ও পুরস্কৃত করা হয়, যেখানে ক্ষমা প্রার্থনাকারীর অপরাধ গণনা করা হয় না বরং দেখা হয় সে তাওবা করে নিজের কতটুকু সংশোধন করে নিয়েছে এবং যেখানে বান্দা এমন প্রভুর সাক্ষাত পায় যিনি প্রতিশোধ নেবার জন্য উঠে পড়ে লাগেন না বরং নিজের লজ্জাবনত গোলামের জন্য রহমতের দরজা খুলে দেন।

৮৯. এরও দু'টি অর্থ হয়। **এক**ঃ তারা কোন মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না এবং এমন কোন জিনিসকে প্রকৃত ঘটনা ও সত্য হিসেবে গণ্য করে না যাকে প্রকৃত ঘটনা ও সত্য বলে তারা জানে না। অথবা তারা যাকে প্রকৃত ঘটনা ও সত্যের বিরোধী ও বিপরীত বলে নিশ্চিতভাবে জানে। **দুই**ঃ তারা মিথ্যা প্রত্যক্ষ করে না, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মিথ্যাচার দেখে না এবং তা দেখার সংকল্প করে না। এ দ্বিতীয় অর্থের দিক দিয়ে মিথ্যা শব্দটি বাতিল ও

www.pathagar.com

অকল্যাণের সমার্থক। খারাপ কাজের গায়ে শয়তান যে বাহ্যিক স্বাদ, চাকচিক্য ও লাভের প্রলেপ লাগিয়ে রেখেছে তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েই মানুষ সেদিকে যায়। এ প্রলেপ অপসৃত হলে প্রত্যেকটি অসৎ কাজ মিথ্যা ও কৃত্রিমতায় পরিপূর্ণ দেখা যায়। এ ধরনের মিথ্যার জন্য মানুষ কখনো প্রাণপাত করতে পারে না। কাজেই প্রত্যেকটি বাতিল, গোনাহ ও খারাপ কাজ এদিক দিয়ে মিথ্যা যে, তা মিথ্যা চাকচিক্যের কারণে মানুষকে নিজের দিকে টেনে নেয়। মু'মিন যেহেতু সত্যের পরিচয় লাভ করে তাই এ মিথ্যা যতই হৃদয়গ্রাহী যুক্তি অথবা দৃষ্টিনন্দন শিল্পকারিতা কিংবা শ্রুতিমধুর সুকণ্ঠের পোষাক পরিহিত হয়ে আসুক না কেন এসব যে তার নকল রূপ, তা সে চিনে ফেলে।

৯০. এখানে মূলে لغو শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। উপরে যে মিথ্যার ব্যাখ্যা করা হয়েছে لغو শব্দটি তার উপরও প্রযুক্ত হয় এবং এই সংগে সমস্ত অর্থহীন, আজেবাজে ফালতু কথাবার্তা ও কাজও এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। আল্লাহর সৎ বান্দাদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তারা জেনে শুনে এ ধরনের কথা ও কাজ দেখতে বা শুনতে অথবা তাতে অংশ গ্রহণ করতে যায় না। আর যদি কখনো তাদের পথে এমন কোন জিনিস এসে যায়, তাহলে তার প্রতি একটা উড়ো নজর না দিয়েও তারা এভাবে সে জায়গা অতিক্রম করে যেমন একজন অত্যন্ত সু-রুচিসম্পন্ন ব্যক্তি কোন ময়লার স্তুপ অতিক্রম করে চলে যায়। ময়লা ও পঁচা দুর্গন্ধের ব্যাপারে একজন কু-রুচিসম্পন্ন ও নোংরা ব্যক্তিই আগ্রহ পোষণ করতে পারে কিন্তু একজন সু-রুচিসম্পন্ন ভদ্রলোক বাধ্যতামূলক পরিস্থিতির শিকার হওয়া ছাড়া কখনো তার ধারে কাছে যাওয়াও বরদাশত করতে পারে না। দুর্গন্ধের স্তুপের কাছে বসে আনন্দ পাওয়ার তো প্রশ্নই উঠে না। (আরো বেশি ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল মু'মিনূন ৪ টীকা।)

৯১. এর শাব্দিক তরজমা হচ্ছে, "তারা তার ওপর অন্ধ ও বোবা হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে না"। কিন্তু এখানে 'ঝাঁপিয়ে পড়া' আভিধানিক অর্থে নয় বরং পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন আমরা কথায় বলি, "জিহাদের হুকুম শুনে বসে রইলো"। এখানে বসে থাকা শব্দটি আভিধানিক অর্থে নয় বরং জিহাদের জন্য না ওঠা ও নড়াচড়া না করা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কাজেই আয়াতের অর্থ হচ্ছে, তারা এমন লোক নয় যারা আল্লাহর আয়াত শুনে একটুও নড়ে না বরং তারা তার দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়। সংশ্লিষ্ট আয়াতগুলোতে যেসব নির্দেশ দেয়া হয়েছে তারা সেগুলো মেনে চলে। যেটি ফরয করা হয়েছে তা অবশ্য পালন করে। যে কাজের নিন্দা করা হয়েছে তা থেকে বিরত থাকে। যে আযাবের ভয় দেখানো হয়েছে তার কল্পনা করতেই তাদের হৃদয় কেঁপে ওঠে।

৯২. অর্থাৎ তাদেরকে ঈমান ও সৎকাজের তাওফীক দান করো এবং পবিত্র-পরিচ্ছন্ন চারিত্রিক গুণাবলীর অধিকারী করো, কারণ একজন মু'মিন তার স্ত্রী ও সন্তানদের দৈহিক সৌন্দর্য ও আয়েশ-আরাম থেকে নয় বরং সদাচার ও সচ্চরিত্রতা থেকেই মানসিক প্রশান্তি লাভ করে। দুনিয়ায় যারা তার সবচেয়ে প্রিয় তাদেরকে দোজখের ইন্ধনে পরিণত হতে দেখার চাইতে বেশী কষ্টকর জিনিস তার কাছে আর কিছুই নেই। এ

www.pathagar.com

অবস্থায় স্ত্রীর সৌন্দর্য ও সন্তানদের যৌবন ও প্রতিভা তার জন্য আরো বেশী মর্মজ্বালার কারণ হবে। কারণ সে সব সময় এ মর্মে দু:খ করতে থাকবে যে, এরা সবাই নিজেদের এসব যোগ্যতা ও গুণাবলী সত্ত্বেও আল্লাহর আযাবের শিকার হবে।

এখানে বিশেষ করে এ বিষয়টি দৃষ্টি সমক্ষে রাখা উচিত যে, এ আয়াতটি যখন নাযিল হয় তখন মক্কার মুসলমানদের মধ্যে এমন একজনও ছিলেন না যার প্রিয়তম আত্মীয় কুফরী ও জাহেলিয়াতের মধ্যে অবস্থান করছিল না। কোন স্বামী ঈমান এনে থাকলে তার স্ত্রী তখনো কাফের ছিল। কোন স্ত্রী ঈমান এনে থাকলে তার স্বামী তখনো কাফের ছিল। কোন যুবক ঈমান এনে থাকলে তার মা-বাপ, ভাই, বোন সবাই তখনো কাফের ছিল। আর কোন বাপ ঈমান এনে থাকলে তার যুবক পুত্ররা কুফরীর ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। এ অবস্থায় প্রত্যেকটি মুসলমান একটি কঠিন আত্মিক যন্ত্রণা ভোগ করছিল এবং তার অন্তর থেকে যে দোয়া বের হচ্ছিল তার সর্বোত্তম প্রকাশ এ আয়াতে করা হয়েছে।

"চোখের শীতলতা" শব্দ দু'টি এমন একটি অবস্থার চিত্র অংকন করেছে যা থেকে বুঝা যায়, নিজের প্রিয়জনদেরকে কুফরী ও জাহেলিয়াতের মধ্যে ডুবে থাকতে দেখে এক ব্যক্তি এতই কষ্ট অনুভব করছে যেন তার চোখ ব্যথায় টনটন করছে এবং সেখানে খচখচ করে কাঁটার মতো বিঁধছে। দ্বীনের প্রতি তারা যে ঈমান এনেছে তা যে পূর্ণ আন্তরিকতা সহকারেই এনেছে- একথাই এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। তাদের অবস্থা এমন লোকদের মতো নয় যাদের পরিবারের লোকেরা বিভিন্ন ধর্মীয় দল ও উপদলে যোগ দেয় এবং সব ব্যাংকে আমাদের কিছু না কিছু পুঁজি আছে এই ভেবে সবাই নিশ্চিন্ত থাকে।

৯৩. অর্থাৎ তাক্ওয়া-আল্লাহভীতি ও আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের ক্ষেত্রে আমরা সবার চেয়ে এগিয়ে যাবো। কল্যাণ ও সৎকর্মশীলতার ক্ষেত্রে সবার অগ্রগামী হবো। নিছক সৎকর্মশীলই হবো না বরং সৎকর্মশীলদের নেতা হবো এবং আমাদের বদৌলতে সারা দুনিয়ায় কল্যাণ ও সৎকর্মশীলতা প্রসারিত হবে। একথার মর্মার্থ এই যে, এরা এমন লোক যারা ধন-দৌলত ও গৌরব-মাহাত্মের ক্ষেত্রে নয় বরং আল্লাহভীতি ও সৎকর্মশীলতার ক্ষেত্রে পরস্পরের অগ্রবর্তী হবার চেষ্টা করে। কিন্তু আমাদের যুগে কিছু লোক এ আয়াতটিকেও নেতৃত্ব লাভের জন্য প্রার্থী হওয়া ও রাষ্ট্রক্ষমতা লাভের জন্য অগ্রবর্তী হওয়ার বৈধতার প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করেছে। তাদের মতে আয়াতের অর্থ হচ্ছে, "হে আল্লাহ! মুত্তাকীদেরকে আমাদের প্রজা এবং আমাদেরকে তাদের শাসকে পরিণত করো"। বস্তুত, ক্ষমতা ও পদের প্রার্থীরা ছাড়া আর কারো কাছে এ ধরনের ব্যাখ্যা প্রশংসনীয় হতে পারে না।

৯৪. সবর শব্দটি এখানে ব্যাপকতর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন সত্যের শত্রুদের জুলুম-নির্যাতনের মোকাবিলা সহিষ্ণুতা ও দৃঢ়তার সাথে করা। সত্য দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত ও তার মর্যাদা সমুন্নত রাখার প্রচেষ্টা ও সংগ্রামে সব ধরনের বিপদ-আপদ ও কষ্ট বরদাশত করা। সব রকমের ভীতি ও লোভ-লালসার মোকাবিলায় সঠিক পথে দৃঢ়পদ থাকা।

www.pathagar.com

শয়তানের সমস্ত প্ররোচনা ও প্রবৃত্তির যাবতীয় কামনা সত্ত্বেও কর্তব্য সম্পাদন করা। হারাম থেকে দূরে থাকা এবং আল্লাহ নির্ধারিত সীমার মধ্যে অবস্থান করা। গোনাহের যাবতীয় স্বাদ ও লাভ প্রত্যাখ্যান করা এবং সৎকাজে ও সঠিক পথে অবস্থানের প্রত্যেকটি ক্ষতি ও তার বদৌলতে অর্জিত প্রতিটি বঞ্চনা মেনে নেওয়া। মোটকথা এ একটি শব্দের মধ্যে দ্বীন এবং দ্বীনী মনোভাব, কর্মনীতি ও নৈতিকতার একটি বিশাল জগত আবদ্ধ করে রাখা হয়েছে।

৯৫ মানে উঁচু দালান। সাধারণত এর অনুবাদে "বালাখানা" শব্দটি ব্যবহার করা হয়। এ থেকে একতলা বা দোতলা করে ধারণা মনের পাতায় ভেসে ওঠে। অথচ সত্য বলতে কি দুনিয়ায় মানুষ যতই বৃহদাকার ও উচ্চতম ইমারত তৈরি করুক না কেন এমন কি মানুষের অবচেতন মনে জান্নাতের ইমারতের যেসব নকশা সংরক্ষিত আছে ভারতের তাজমহল ও আমেরিকার আকাশচুম্বী ইমারতগুলো ও তার কাছে নিছক কতিপয় কদাকার কাঠামো ছাড়া আর কিছুই নয়।

www.pathagar.com

নির্বাচিত
আয়াত মুখস্ত করণ

রামাদান ম্যানুয়েল- ২০৭

www.pathagar.com

মুখস্ত করণ: প্রথম আয়াত

১-৩ রামাদান: ৩ দিন

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَى أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلا تَنَابَزُوا بِالأَلْقَابِ بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (11)

হে ঈমানদারগণ, পুরুষরা যেন অন্য পুরুষদের বিদ্রুপ না করে। হতে পারে তারাই এদের চেয়ে উত্তম। আর মহিলারাও যেন অন্য মহিলাদের বিদ্রুপ না করে। হতে পারে তারাই এদের চেয়ে উত্তম। তোমরা একে অপরকে বিদ্রুপ করো না এবং পরস্পরকে খারাপ নামে ডেকো না। ঈমান গ্রহণের পর গোনাহর কাজে প্রসিদ্ধি লাভ করা অত্যন্ত জঘন্য ব্যাপার। যারা এ আচরণ পরিত্যাগ করেনি তারাই জালেম। সূরা হুজুরাত: ১১

মুখস্ত করণ: দ্বিতীয় আয়াত

৪-৬ রামাদান: ৩ দিন

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلا تَجَسَّسُوا وَلا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ (12)

হে ঈমানদাগণ, বেশী ধারণা ও অনুমান করা থেকে বিরত থাকো। কারণ কোন কোন ধারণা ও অনুমান গোনাহ। দোষ অন্বেষণ করো না। আর তোমাদের কেউ যেন কারো গীবত না করে। এমন কেউ কি তোমাদের মধ্যে আছে, যে তার নিজের মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া পছন্দ করবে? দেখো, তা খেতে তোমাদের ঘৃণা হয়। আল্লাহকে ভয় করো। আল্লাহ অধিক পরিমাণে তাওবা কবুলকারী এবং দয়ালু। সূরা হুজুরাত: ১২

www.pathagar.com

মুখস্ত করণ: তৃতীয় আয়াত

৭-৯ রামাদান: ৩ দিন

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (60)

এ সাদকাগুলো তো আসলে ফকীর মিসকীনদের জন্য। আর যারা সাদকা সংক্রান্ত কাজে নিযুক্ত এবং যাদের মন জয় করা প্রয়োজন তাদের জন্য। তাছাড়া দাস মুক্ত করার, ঋণগ্রস্তের ঋণ পরিশোধ করার জন্য, আল্লাহর পথে এবং মুসাফিরদের উপকারে ব্যয় করার জন্য। এটা আল্লাহর পক্ষে থেকে একটি বিধান এবং আল্লাহর সবকিছু জানেন, তিনি বিজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ। সূরা তাওবা : ৬০

মুখস্ত করণ: চতুর্থ আয়াত

১০-১২ রামাদান: ৩ দিন

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (23)

তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে তোমাদের মা, কন্যা, বোন, ফুফু, খালা, ভাতিজি, ভাগিনী ও তোমাদের সেই সমস্ত মাকে যারা তোমাদেরকে দুধ পান করিয়েছেন এবং তোমাদের দুধ বোন, তোমাদের স্ত্রীদের মা ও তোমাদের স্ত্রীদের মেয়েদেরকে, যারা তোমাদের কোলে মানুষ হয়েছে, সেই সমস্ত স্ত্রীদের মেয়েদেরকে যাদের সাথে তোমাদের স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, অন্যথায় যদি (শুধুমাত্র বিয়ে হয় এবং) স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত না হয়, তাহলে (তাদেরকে বাদ দিয়ে তাদের মেয়েদেরকে বিয়ে করলে) তোমাদের কোন জবাবদিহি করতে হবে না, এবং তোমাদের ঔরসজাত পুত্রদের স্ত্রীদেরকেও। আর দুই বোনকে একসাথে বিয়ে করাও তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে। তবে যা প্রথমে হয়ে গেছে তা হয়ে গেছে। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়। সূরা নিসা : ২৩

www.pathagar.com

মুখস্ত করণ: পঞ্চম আয়াত

১৩-১৫ রামাদান: ৩ দিন

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا (63) وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا (64)

রহমানের (আসল) বান্দা তারাই যারা পৃথিবীর বুকে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং মূর্খরা তাদের সাথে কথা বলতে থাকলে বলে দেয়, তোমাদের সালাম। তারা নিজেদের রবের সামনে সিজদায় অবনত হয়ে ও দাঁড়িয়ে রাত কাটিয়ে দেয়। সূরা আল ফোরকান : ৬৩-৬৪

মুখস্ত করণ: ষষ্ঠ আয়াত

১৬-১৮ রামাদান: ৩ দিন

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (24)

২৪) হে নবী! বলে দাও, যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান ও তোমাদের ভাই তোমাদের স্ত্রী,তোমাদের আত্মীয়-স্বজন, তোমাদের উপার্জিত সম্পদ, তোমাদের যে ব্যবসায়ে মন্দা দেখা দেয়ার ভয়ে তোমরা তটস্থ থাক এবং তোমাদের যে বাসস্থানকে তোমরা খুবই পছন্দ কর, এসব যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এবং তার পথে জিহাদ করার চাইতে তোমাদের কাছে বেশী প্রিয় হয়, তাহলে আল্লাহর ফয়সালা তোমাদের কাছে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর। আল্লাহ ফাসেকদেরকে কখনো সত্য পথের সন্ধান দেন না। সূরা তাওবা : ২৪

www.pathagar.com

মুখস্ত করণ: সপ্তম আয়াত

১৯-২১ রামাদান: ৩ দিন

وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (12) وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ (13

১২) আমি লুকমানকে দান করেছিলাম সূক্ষ্মজ্ঞান। যাতে সে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হয়। যে ব্যক্তি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে তার কৃতজ্ঞতা হবে তার নিজেরই জন্য লাভজনক। আর যে ব্যক্তি কুফরী করবে, সে ক্ষেত্রে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ অমুখাপেক্ষী এবং নিজে নিজেই প্রশংসিত। ১৩) স্মরণ করো যখন লুকমান নিজের ছেলেকে উপদেশ দিচ্ছিল, সে বললো, "হে পুত্র! আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করো না। নিশ্চয়ই শির্ক অনেক বড় জুলুম। সূরা লোকমান: ১২-১৩

মুখস্ত করণ: অষ্টম আয়াত

২২-২৪ রামাদান: ৩ দিন

وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا (23) وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا (24)

তোমার রব ফয়সালা করে দিয়েছেন, তোমরা কারোর ইবাদাত করো না, একমাত্র তাঁরই ইবাদাত করা ছাড়া। পিতামাতার সাথে ভালো ব্যবহার করো। যদি তোমাদের কাছে তাদের কোনো একজন বা উভয় বৃদ্ধ অবস্থায় থাকে, তাহলে তাদেরকে "উহ" পর্যন্তও বলো না এবং তাদেরকে ধমকের সুরে জবাব দিয়ো না বরং তাদের সাথে মর্যাদা সহকারে নম্রতার সাথে কথা বলো

আর দয়া ও কোমলতা সহকারে তাদের সামনে বিনম্র থাকো এবং দোয়া করতে থাকো এই বলে: হে আমার প্রতিপালক! তাদের প্রতি দয়া করো, যেমন তারা দয়া, মায়া, মমতা সহকারে শৈশবে আমাকে প্রতিপালন করেছিলেন। সূরা বনি ইসরাইল: ২৩-২৪

www.pathagar.com

মুখস্ত করণ: নবম আয়াত

২৫-২৭ রামাদান: ৩ দিন

وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالاً فَخُورًا (36)

আর তোমরা সবাই আল্লাহর বন্দেগী করো। তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না। বাপ-মার সাথে ভালো ব্যবহার করো। নিকট আত্মীয় ও ইয়াতিম-মিসকিনদের সাথে সদ্ব্যবহার করো। আত্মীয় প্রতিবেশী, অনাত্মীয় প্রতিবেশী, পার্শ্বসাথী, মুসাফির এবং তোমাদের মালিকানাধীন বাঁদী ও গোলামদের প্রতি সদয় ব্যবহার করো। নিশ্চিতভাবে জেনে রাখো, আল্লাহ এমন কোন ব্যক্তিকে পছন্দ করেন না যে আত্ম-অহংকারে ধরাকে সরা জ্ঞান করে এবং নিজের বড়াই করে। সূরা নিসা: ৩৬

মুখস্ত করণ: দশম আয়াত

২৮-৩০ রামাদান: ৩ দিন

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلاَّ تَخَافُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ (30)

যারা ঘোষণা করেছে, আল্লাহ আমাদের রব, অত:পর তার ওপরে দৃঢ় ও স্থির থেকেছে, নিশ্চিত তাদের কাছে ফেরেশতারা আসে এবং তাদের বলে, ভীত হয়ো না, দুঃখ করো না এবং সেই জান্নাতের সুসংবাদ শুনে খুশি হও তোমাদেরকে যার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। সূরা নিসা: ৩০

www.pathagar.com

দারসূল কুরআন

রামাদান ম্যানুয়েল- ২১৩

www.pathagar.com

দারসুল কুরআন

সূরা বাকারা-১৮৩-১৮৫

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ {183} أَيَّاماً مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ {184} شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ {185}

(১৮৩) হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর (রমজানের) রোজাকে ফরজ করা হয়েছে যেমনিভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর ফরজ করা হয়েছিল। যাতে করে তোমরা মুত্তাকী হতে পার।

(১৮৪) কয়েকটি নির্দিষ্ট দিনের রোজা। যদি তোমাদের মধ্যে কেউ অসুস্থ হয় অথবা সফরে থাকে, তাহলে সে অন্য সময় যেন এ দিনগুলোর রোজা আদায় করে নেয়। আর যারা রোজা রাখতে সক্ষম (হয়েও রোজা রাখে না) তারা যেন 'ফিদ্ইয়া' দেয়। (রোজার ফিদ্ইয়া হলো মিসকীনকে খাওয়ানো)। আর যে ইচ্ছা করে কিছু বেশি সৎ কাজ করে, তা তার জন্যই ভালো। কিন্তু যদি তোমার বুঝ তাহলে রোজা রাখাই তোমাদের জন্য বেশি ভালো।

(১৮৫) রমজান ঐ মাস, যে মাসে কুরআন নাযিল করা হয়েছে; যা মানুষের জন্য পুরোটাই হেদায়াত, যা এমন স্পষ্ট উপদেশে পূর্ণ যে, তা সঠিক পথ দেখায় এবং হক ও বাতিলের পার্থক্য পরিষ্কারভাবে তুলে ধরে। তাই এখন থেকে যে ব্যক্তি এ মাস পায় তার অবশ্য কর্তব্য, সে যেন পুরো মাস রোজা রাখে। আর যে অসুস্থ বা সফরে থাকে, সে যেন অন্য সময় ঐ দিনগুলোর রোজা আদায় করে নেয়। আল্লাহ তোমাদের জন্য যা সহজ তা-ই চান, যা কঠিন তা তিনি চান না। তোমাদেরকে এ জন্যই এ নিয়ম দেয়া হয়েছে, যাতে তোমরা রোজার সংখ্যা পুরা করতে পার, আর যে হেদায়াত আল্লাহ তোমাদেরকে দিয়েছেন এর জন্য তোমরা আল্লাহর বড়ত্ব প্রকাশ করতে পার এবং আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতে পার।

সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

- নামকরণ: সূরা আল বাক্বারা। বাক্বারা মানে গাভী। সুরার এক জায়গায় গাভীর উল্লেখ থাকার কারণে এর এই নামকরণ করা হয়েছে সূরা আল বাক্বারা।
- মোট আয়াত: ২৮৬ টি, রুকু: ৪০ টি।
- সংখ্যাগত অবস্থান: ০২ (দ্বিতীয়)।

www.pathagar.com

নাযিলের সময়কাল:

এ সূরার বেশীরভাগ মদীনায় হিজরতের পর মাদানী জীবনের একেবারে প্রথম যুগে নাযিল হয়। বিষয়বস্তুর সাথে সামঞ্জস্য ও সাদৃশ্যের কারণেএ গুলোকে প্রথমোক্ত অংশের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। যে আয়াত গুলো দিয়ে শেষ করা হয়েছে সে গুলো হিজরতের আগে মক্কায় নাযিল হয়। কিন্তু বিষয়বস্তুর সাথে সামঞ্জস্য ও সাদৃশ্যের কারণে সেগুলোকেও এ সূরার সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে।

নাযিলের প্রেক্ষাপট:

১) হিজরতের আগে ইসলামের দাওয়াতের কাজ চলছিল কেবল মক্কায়। এ সময় পর্যন্ত সম্বোধন করা হচ্ছিল কেবলমাত্র আরবের মুশরিকদেরকে। তাদের কাছে ইসলামের বাণী ছিল সম্পূর্ণ নতুন ও অপরিচিত। এখন হিজরতের পরে ইহুদিরা সামনে এসে গেল। তাদের জনবসতিগুলো ছিল মদীনার সাথে একেবারে লাগানো। তারা তাওহীদ, রেসালাত, আখেরাত ও ফেরেশতার স্বীকৃতি দিত। কিন্তু বহু শতাব্দী কালের ক্রমাগত পতন ও অবনতির কারণে তারা আসল দ্বীন থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছিল। তাদের আক্বীদা বিশ্বাসের মধ্যে বহু অনৈসলামী বিষয়ের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। তাওরাতে এর কোন ভিত্তি ছিলনা। নিজেদের এই বিকৃতির প্রতি তাদের আসক্তি এমন পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল যার ফলে কোন প্রকার সংস্থার সংশোধন গ্রহণের তারা বিরোধী হয়ে উঠেছিল। যখনই কোন আল্লাহর বান্দা তাদেরকে আল্লাহর দ্বীনের সরল সোজা পথের সন্ধান দিতে আসতেন তখই তারা তাদের নিজেদের বড় দুশমন মনে করে সম্ভাব্য সকল উপায়ে তার সংশোধন প্রচেষ্টা ব্যর্থ করার জন্য উঠে পরে লাগতো। আল্লাহর দ্বীনকে তারা কেবল ইসরাঈল বংশজাতদের পিতৃসূত্রে প্রাপ্ত উত্তরাধিকারে পরিণত করেছিল। কাজেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম মদীনায় পৌঁছার পর আসল দ্বীনের দিকে আহ্বান করার জন্য আল্লাহ তাঁকে নির্দেশ দিলেন। সূরা বাক্বারা ১৫ ও ১৬ রুকু এ দাওয়াত সম্বলিত।

২) মদীনায় পৌঁছার পর ইসলামী দাওয়াত একটি নতুন পর্যায়ে প্রবেশ করেছিল। কিন্তু হিজরতের পর যখন আরবের লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করে চতুর্দিক থেকে মদীনায় এসে জমায়েত হতে থাকলো এবং আনসারদের সহায়তায় একটি ছোট্ট ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্ গড়ে উঠলো তখন মহান আল্লাহ সমাজ, সংস্কৃতি, লোকাচার, অর্থনীতি ও আইন সম্পর্কিত মৌলিক বিধান দিতে থাকলেন এবং ইসলামী মূলনীতির ভিত্তিতে এ নতুন জীবন ব্যবস্থাটি কিভাবে গড়ে তুলতে হবে তারও নির্দেশ দিতে থাকলেন। এ সূরার শেষ ২৩ টি রুকু'তে বেশীর ভগ ক্ষেত্রে এ নির্দেশ ও বিধানগুলো বয়ান করা হয়েছে।

১৮৩ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

এ আয়াতে ৩টি বিষয় তুলে ধরা হয়েছে।

১. সিয়াম ফরজ হবার বিধান
২. এ বিধান পূর্ববর্তীদের উপরও ছিল।
৩. সিয়ামের উদ্দেশ্য

www.pathagar.com

সিয়ামের পরিচয়

সিয়াম ইসলামের ৫টি মৌলিক ভিত্তির ১টি অন্যতম ভিত্তি। কুরআনের ভাষা 'আস্‌সাওম', অর্থ হচ্ছে আত্মসংযম, কঠোর সাধনা, অবিরাম চেষ্টা ও বিরত থাকা ইত্যাদি। ইংরেজি পরিভাষা হচ্ছে Fasting, রোজা ফারসি শব্দ। যা সিয়াম অর্থে ব্যবহার হয়।

আর ব্যাপক অর্থে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে সাওমের নিয়্যতে সুবহে সাদেক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সব ধরনের পানাহার ও যৌন মিলন থেকে বিরত থাকার নাম সাওম বা রোজা।

সিয়াম ফরজ হয় রাসূল (সা.) নবুওয়াতের ১৫তম বর্ষ অর্থাৎ ২য় হিজরীতে। মাহে রমজান আরবি চন্দ্র বছরের নবম মাস। রমজান শব্দটি আরবি 'রমজ' শব্দ থেকে উৎপন্ন হয়েছে। এর অর্থ দহন করা, জ্বালিয়ে দেয়া ইত্যাদি। অর্থাৎ প্রবৃত্তির তাড়নায় মানুষের সঞ্চিত পাপ পঙ্কিলতা জ্বালিয়ে দেয়া, নিঃশেষ করে দেয়াই এর উদ্দেশ্য।

রামাদান মাস প্রশিক্ষণের (সার্ভিসিংয়ের) মাস:

রামাদান মাস আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার জন্যে বাৎসরিক প্রশিক্ষণের (সার্ভিসিংয়ের) মাস। এই প্রশিক্ষণ আল্লাহর ও তাঁর রাসূলের প্রতিটি নির্দেশের প্রতি আত্মসমর্পণের। প্রত্যেক প্রশিক্ষণেরই বিভিন্ন ইভেন্ট থাকে। মাসব্যাপী এ প্রশিক্ষণও অনেকগুলো ইভেন্টে সাজানো। যেমন (১) সুবহে সাদেক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত একটানা না খেয়ে থাকা। (২) সময়মত ইফতার করা ও অপরকে করানোর চেষ্টা করা। (৩) সালাতুত-তারাবীহ ও বেশী বেশী নফল সালাত আদায় করা। (৪) শেষ রাতে সাহরী খাওয়া। (৫) ই'তিকাফের মাধ্যমে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের চেষ্টা করা। (৬) লায়লাতুল কাদ্‌রে বেশী ইবাদত করা। (৭) ফিতরা আদায় করা ইত্যাদি। এ সবই হচ্ছে তাকওয়া অর্জন তথা আল্লাহর নির্দেশের প্রতি আত্মসমর্পণের প্রশিক্ষণ।

যিনি যত বেশী ইভেন্টে সেরা নৈপূর্ণ অর্জন করতে পারবেন তিনি তত বেশী আল্লাহর অধিকতর প্রিয় বান্দাহ হতে পারবেন। সেরা মুত্তাকী হবার মাধ্যমে আপনিও আল্লাহর নিকট থেকে সেরা পুরস্কার পেতে পারেন।

সিয়াম বা রোজা সম্পর্কে রাসূলের (সা.) নির্দেশনা

১। রোজার প্রতিদান:

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلُّ عَمَلِ اِبْنِ اٰدَمَ لَهُ اِلاَّ الصِّيَامَ فَاِنَّهُ لِىْ وَاَنَا اَجْزِىْ بِهِ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ فَاِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ اَحَدِكُمْ فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَصْخَبْ فَاِنْ سَابَّهُ اَحَدٌ اَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ اِنِّىْ صَائِمٌ وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ اَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا اِذَا اَفْطَرَ فَرِحَ بِفِطْرِهِ وَاِذَا لَقِىَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ – متفق عليه.

www.pathagar.com

অর্থাৎ হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ বলেন, আদম সন্তানের প্রতিটি আমল তার নিজের জন্য, কেবল রোজা ছাড়া। কারণ তা আমার জন্য এবং আমি তার প্রতিদান দেব। আর রোজা ঢাল-স্বরূপ। কাজেই তোমাদের কেউ যখন রোজা রাখে, সে যেন অশ্লীল কাজ না করে, শোরগোল না করে। যদি কেউ তাকে গালি দেয় বা তার সাথে ঝগড়া করে তাহলে তার বলা উচিত, আমি রোজাদার। যার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ তার কসম! রোজাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহর কাছে মিশকের চেয়েও সুগন্ধযুক্ত। রোজাদারের দুটি আনন্দ, যা সে লাভ করবে, একটি হচ্ছে সে ইফতারির সময় খুশি হয়। আর দ্বিতীয়টি লাভ করবে যখন সে তার রবের সাথে সাক্ষাৎ করবে, তখন সে তার রোজার কারণে আনন্দিত হবে। (ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।)

২। উত্তম আমলের সীমাহীন পুরস্কার:

وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةَ وَشَهْرُ الْمُوَاسَاةِ وَشَهْرٌ يَزَادُ فِيْهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ مَنْ فَطَّرَفِيْهِ صَائِمًا كَانَ لَه مَغْفِرَةً لِذُنُوْبِه وَعِتْقَ رَقَبَتِه مِنَ النَّارِ وَكَانَ له مِثْلُ اَجْرِه مِنْ غَيْرِ اَنْ يَّنْقُصَ مِنْ اَجْرِه شَيْئٌ – وَمَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوْكِه فِيْهِ غَفَرَ اللهُ له وَاَعْتَقَه مِنَ النَّارِ.

এটি সবর, ধৈর্য ও তিতীক্ষার মাস। আর সবরের প্রতিফল জান্নাত। এ মাস হচ্ছে পরস্পর সহৃদয়তা ও সৌজন্য প্রদর্শনের মাস। এ মাসে মুমিনের রিযিক প্রশস্ত করে দেয়া হয়। এ মাসে যে ব্যক্তি কোন রোজাদারকে ইফতার করাবে, তার ফলস্বরূপ তার গুনাহ মাফ করে দেয়া ও জাহান্নাম হতে তাকে নিস্কৃতি দান করা হবে। আর তাকে প্রকৃত রোজাদারের সমান সওয়াব দেয়া হবে; কিন্তু সেজন্য প্রকৃত রোজাদারের সওয়াব কিছুমাত্র কম করা হবে না। আর যে লোক এ মাসে নিজের অধীন লোকদের শ্রম-মেহনত হাল্কা বা হ্রাস করে দেবে, আল্লাহ তায়ালা তাকে ক্ষমা দান করবেন এবং তাকে দোযখ হতে নিষ্কৃতি ও মুক্তিদান করবেন। (বায়হাকী)

৩। গুনাহ মাফের ঘোষণা:

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ صَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَّاِحْتِسَابًا غُفِرَلَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .

অর্থাৎ হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, যে লোক রামাদান মাসের সাওম পালন করবে ঈমান ও সাওয়াবের ইচ্ছা পোষণ করে, তার আগের সব গুনাহ সমূহ মাফ করে দেয়া হবে। (বুখারী)

৪। রোজাদারের করণীয়:

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ الصِّيَامُ جُنَّةٌ فَلا يَرْفُثْ وَلا يَجْهَل فَاِن امْرَءٌ قَاتَلَهُ اَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ اِنِّي صَائِمٌ مَرَّتَيْن وَالَّذِيْ نَفْسِى بِيَدِه لَخَلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ اَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكُ يَتْرُكُ طَعَامَه وَ شَرَابَه وَشَهْوَتُه مِنْ اَجْلِى الصِّيَام لِيْ وَاَنَا اَجْزِي بِه وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا

www.pathagar.com

অর্থাৎ আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, (গোনাহ হতে আত্মরক্ষার জন্য) রোজা ঢাল-স্বরূপ। সুতরাং রোযাদার অশ্লীল কথা বলবে না বা জাহিলী আচরণ করবে না। কোন লোক তার সাথে ঝগড়া করতে উদ্যত হলে অথবা গালমন্দ করলে সে তাকে বলবে, আমি রোযা রেখেছি। কথাটি দু'বার বলবে। যার মুষ্ঠিতে আমার প্রাণ সেই সত্তার শপথ। রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহর নিকট কস্তুরীর সুগন্ধি থেকে ও উৎকৃষ্ট। কেননা (রোযাদার) আমার উদ্দেশ্যেই খাবার, পানীয় ও কামস্পৃহা পরিত্যাগ করে থাকে। তাই রোজা আমার উদ্দেশ্যেই। সুতরাং আমি বিশেষভাবে রোযার পুরষ্কার দান করব। আর নেক কাজের পুরষ্কার দশগুণ পর্যন্ত দেয়া হয়ে থাকে।

৫। নিষ্ফল রোজা:

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَمْ مِنْ صَائِمٍ لَيْسَ لَه مِنْ صِيَامِه اِلاَّ الظَّمَا وَكَمْ مِنْ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ اِلاَّ السَّهْرُ.

অর্থাৎ "হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, 'কতক এমন রোজাদার আছে, যাদের রোজা দ্বারা শুধু পিপাসাই লাভ হয়। আর কতক এমন নামাজি আছে, যাদের রাত জেগে নামাজ পড়া দ্বারা শুধু রাত জাগরণই হয়"। (ইবনে মাজা)

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِه فَلَيْسَ لِلّٰهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ" (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدُ وَابْنُ مَاجَه وَأَحْمَدُ.)

রাসূল (সা:) বলেছেন: "যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা এবং কাজ পরিহার করলনা, তার খাদ্য ও পানীয় পরিত্যাগ করায় আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই"। (বুখারী, তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ ও আহমাদ)

৬। রামাদান মাসে জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه -أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ

"আবু হুরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন: রামাদান মাস আসলে জান্নাতের দরজাসমূহ উন্মুক্ত করে দেয়া হয়। দোযখের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয় এবং শয়তানগুলোকে শিকলে বন্দী করা হয়"। (মুসলিম শরীফ ৪র্থ খন্ড-২৩৬৩)

পূর্ববর্তীদের উপর সিয়াম বা রোজা ফরজের ইতিহাস

১. হযরত আদম (আ.) থেকে হযরত নূহ (আ.) পর্যন্ত প্রতি চন্দ্রমাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখ রোজা রাখার বিধান ছিল। একে বলা হতো আইয়্যামে 'বিজ'।

২. ইহুদীরা প্রতি সপ্তাহে শনিবার এবং বছরে মহররমের ১০ম তারিখে রোজা রাখতো।

www.pathagar.com

৩. মুসা (আ.) তুর পাহাড়ে অবস্থানের ৪০ দিন রোজা পালনের নির্দেশ ছিল।
৪. খ্রিষ্টানদের ৫০ দিন রোজা রাখার রেওয়াজ ছিল।
৫. উচ্চবর্ণের হিন্দুরাও একাদশী উপবাস পালন করে থাকে।

সিয়াম ফরজ করা হয়েছে তাকওয়া অর্জনের জন্যে এর ব্যাখ্যা

তাকওয়ার পরিচয়:

অর্থাৎ আল্লাহকে যথাযথ ভাবে ভয় করা। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা:) বলেন- এর অর্থ হলো:

১. আল্লাহর এমন আনুগত্য করা যাতে কোন নাফরমানী না হয়।
২. আর তাঁর এমন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা যেন কখনো অকৃতজ্ঞ না হয়।
৩. তাঁকে এমন ভাবে স্মরণ করা যেন কখনও ভুল না হয়।

তাকওয়া সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা:

আমাদের সমাজে অধিকাংশ মানুষের মধ্যে ইসলামের সঠিক জ্ঞান না থাকায় যার মুখে লম্বা দাঁড়ি, মাথায় পাগড়ী, হাতে তাসবিহ্ এবং গায়ে লম্বা জামা থাকে তাকে মুত্তাকী বা পরহেজগার বলে মনে করে। অথচ শরীয়ত তাকওয়ার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বাহ্যিক দিকের প্রতি যত গুরুত্ব দিয়েছে। মনের মধ্যে আল্লাহর ভয়কে জাগরুক রাখাকে আরো বেশী গুরুত্ব দিয়েছে।

তাকওয়ার ক্ষেত্র বা পরিধি:

১। আল্লাহ আমাদের সব কাজের খবর রাখেন:

وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

অর্থাৎ: আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ খবর রাখেন, তোমরা যা কর। সূরা হাশর- ১৮

২। আল্লাহ আমাদের মনের গোপন খবরও রাখেন:

وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

অর্থাৎ: আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের মনের সব বিষয় সম্পর্কে খবর রাখেন। সূরা মায়েদা-৭

৩। আল্লাহ আমাদের সব বিষয়েই জানেন:

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

অর্থাৎ: আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ নিশ্চয়ই আল্লাহ সব বিষয়েই জানেন। সূরা বাক্বারা- ২৩১

৪। আল্লাহ আমাদের যাবতীয় কার্যকলাপ দেখেন:

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

www.pathagar.com

অর্থাৎ: তোমরা আল্লাহকে ভয় কর আর মনে রেখ নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় কার্যকলাপ দেখেন। সুরা বাকারা ২৩৩

তাকওয়ার (ফলাফল) নিরাপত্তা বেষ্টনী:

প্রত্যেক মানুষ দুনিয়ার জীবনে প্রত্যাশা করে স্বাচ্ছন্দ, পর্যাপ্ত রিজিক, কাজকর্মে সহজসাধ্যতা, ষড়যন্ত্রের মোকাবিলায় নিরাপত্তা ইত্যাদি। আর পরকালের জীবনে সফলতা তথা আল্লাহর পক্ষ থেকে পুরস্কার। আর তাকওয়ার মাধ্যমে মানুষের এসব চাওয়া-পাওয়াঙ্ক পূরণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন।

১। রিযিকের ব্যবস্থা করা হয়:

وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِب

অর্থাৎ: যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য চলার পথ করে দেন এবং রিযিকের ব্যবস্থা এমনভাবে করেন যা সে কল্পনাও করতে পারে না। সূরা তালাক-৩

২। কাজকর্ম সহজ করা হয়:

وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

অর্থাৎ: যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার কাজ সহজ করে দেন। সূরা তালাক -৪

৩। ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা করা হয়:

وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا

অর্থাৎ: যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর তবে তাদের কোন ষড়যন্ত্র তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। সূরা আলে ইমরান-১২০

৪। আসমান ও জমিনের নিয়ামতসমূহ উন্মুক্ত করে দেয়া হয়:

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ وَلَـكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

অর্থাৎ: যদি জনপদের অধিবাসীরা ঈমান আনতো এবং তাকওয়া অবলম্বন করতো, তবে আমি তাদের প্রতি আসমান ও জমিনের নিয়ামতসমূহ উন্মুক্ত করে দিতাম। সূরা আরাফ- ৯৬

৫। গুনাহ সমূহ ক্ষমা করে দেয়া হয়:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

অর্থাৎ: হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তবে তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেবেন এবং তোমাদের গুনাহসমূহ মাফ করে দেবেন এবং তোমাদের ক্ষমা করবেন। বস্তুত আল্লাহর অনুগ্রহ অত্যন্ত অসীম। সূরা আনফাল-২৯

৬। সুসংবাদ প্রদান করা হয়:

وَقَدِّمُوا لأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُم مُّلاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

www.pathagar.com

অর্থাৎ: আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ তোমাদেরকে অবশ্যই তার সাক্ষাতে মিলিত হতে হবে এবং আর মুমিনদেরকে সুসংবাদ দাও। সূরা বাকারা- ২২৩

তাকওয়ার ৩ টি স্তর:

সর্বনিম্ন স্তর হল- কুফর ও শিরক থেকে বেঁচে থাকা। এ অর্থে প্রত্যেক মুসলমানকেই মুত্তাকী বলা যায়। যদি ও সে গুনাহে লিপ্ত থাকে।

দ্বিতীয় স্তর হল- এমন সব কাজ থেকে বেঁচে থাকা, যা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রাসূলের (সা:) পছন্দনীয় নয়। কুরআন ও হাদীসে যেসব ফযীলত ও কল্যাণ প্রতিশ্রুত হয়েছে, তা এ স্তরের তাকওয়ার ওপর ভিত্তি করেই হয়েছে।

তৃতীয় স্তরটি তাকওয়ার সর্বোচ্চ স্তর। আম্বিয়া (আঃ) ও তাদের বিশেষ উত্তরাধিকারী ওলীগণ এ স্তরের তাকওয়া অর্জন করে থাকেন। অর্থাৎ অন্তরকে আল্লাহ ব্যতীত সব কিছু থেকে বাঁচিয়ে রাখা এবং আল্লাহর স্মরণ ও তাঁর সন্তুষ্টি কামনার দ্বারা পরিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ রাখা।

কিভাবে তাকওয়া অবলম্বন করবো?

১.সব কাজে আল্লাহর নির্দেশ মেনে চলব।
২.কাজ করব রাসূলের স. এর নিয়ম অনুসারে।
৩.কথা বলব সুন্দরভাবে।
৪.পথ চলব বিনম্রভাবে।
৫.খাওয়া দাওয়া করব অপচয় না করে।
৬. অর্থ উপার্জন করবো হালাল উপায়ে।
৭. বেঁচে থাকবো সময় অপচয় থেকে।

১৮৪ নং আয়াতের ব্যাখ্যা:

এ আয়াতে সিয়াম পালনকারীর জন্যে ২টি বিধান আলোচনা করা হয়েছে।

১. কেউ অসুস্থ হয়ে গেলে তার উপর সিয়ামের বিধান কি?
২. কেউ সফরে থাকলে তার বিধান কি?

ইসলামের অন্যান্য বিধানের মতো রোযাও পর্যায়ক্রমে ফরয হয়। শুরুতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলামনদেরকে মাত্র প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এ রোযা ফরয ছিল না।

অসুস্থ অবস্থায় সিয়ামের বিধান:

তারপর দ্বিতীয় হিজরীতে রমযান মাসের রোযার এই বিধান কুরআনে নাযিল হয়। তবে এতে এতটুকুন সুযোগ দেয়া হয়, রোযার কষ্ট বরদাশত করার শক্তি থাকা সত্ত্বেও যারা রোযা রাখবেন না তারা প্রত্যেক রোযার বদলে একজন মিসকিনকে আহার করাবে।

www.pathagar.com

পরে দ্বিতীয় বিধানটি নাযিল হয়। এতে পূর্ব প্রদত্ত সাধারণ সুযোগ বাতিল করে দেয়া হয়।

কিন্তু রোগী মুসাফির, গর্ভবর্তী মহিলা বা দুগ্ধপোষ্য শিশুর মাতা এবং রোযা রাখার ক্ষমতা নেই এমন সব বৃদ্ধদের জন্য এ সুযোগটি আগের মতোই বহাল রাখা হয়। পরে ওদের অক্ষমতা দূর হয়ে গেলে রমযানের যে ক'টি রোযা তাদের বাদ গেছে সে ক'টি পূরণ করে দেয়ার জন্য তাদের নির্দেশ দেয়া হয়।

দ্বিতীয় হিজরীতে বদর যুদ্ধের আগে রমযানের রোযা সম্পর্কে যে বিধান নাযিল হয়েছিল এ পর্যন্ত সেই প্রাথমিক বিধানই বর্ণিত হয়েছে। এর পরবর্তী আয়াত এক বছর পরে নাযিল হয় এবং বিষয়বস্তুর সাদৃশ্যের কারণে এর সাথে সংযুক্ত করে দেয়া হয়।

সফররত অবস্থায় সিয়ামের বিধান:

সফররত অবস্থায় রোযা না রাখা ব্যক্তির ইচ্ছা ও পছন্দের ওপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। সাহাবীগণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সফরে যেতেন। তাঁদের কেউ রোযা রাখতেন আবার কেউ রাখতেন না। উভয় দলের কেউ পরস্পরের বিরুদ্ধে আপত্তি উঠাতেন না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও সফরে কখনো রোযা রেখেছেন, কখনো রাখেননি। এক সফরে এক ব্যক্তি বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেলো। তার চারদিকে লোক জড়ো হয়ে গেলো। এ অবস্থা দেখে নবী সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যাপার কি জিজ্ঞেস করলেন। বলা হলো, এই ব্যক্তি রোযা রেখেছে। জবাব দিলেনঃ এটি সৎকাজ নয়। যুদ্ধের সময় তিনি রোযা না রাখার নির্দেশজারী করতেন, যাতে দুশমনের সাথে পাঞ্জা লড়বার ব্যাপারে কোন প্রকার দুর্বলতা দেখা না দেয়। হযতর উমর (রা) রেওয়ায়াত করেছেন, "দু'বার আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে রমযান মাসে যুদ্ধে যাই। প্রথমবার বদরে এবং শেষবার মক্কা বিজয়ের সময়। এই দু'বারই আমরা রোযা রাখিনি"।

সাধারণ সফরের ব্যাপারে কতটুকুন দূরত্ব অতিক্রম করলে রোযা ভাঙ্গা যায়,রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোন বক্তব্য থেকে তা সুস্পষ্ট হয় না। সাহাবায়ে কেরামের কাজও এ ব্যাপারে বিভিন্ন। এ ব্যাপারে সঠিক বক্তব্য হচ্ছে এই যে, যে পরিমাণ দূরত্ব সাধারণ্যের সফর হিসেব পরিগণিত এবং যে পরিমাণ দূরত্ব অতিক্রম করলে মুসাফিরী অবস্থা অনুভূত হয়, তাই রোযা ভাঙার জন্য যথেষ্ট।

যেদিন সফর শুরু করা হয় সেদিনের রোযা না রাখা ব্যক্তির নিজের ইচ্ছাধীন, এটি একটি সর্বসম্মত বিষয়। মুসাফির চাইলে ঘর থেকে খেয়ে বের হতে পারে আর চাইলে ঘরে থেকে বের হয়েই খেতে নিতে পারে। সাহাবীদের থেকে উভয় প্রকারের কাজের প্রমাণ পাওয়া যায়।

অর্থাৎ আল্লাহ রোযা রাখার জন্য কেবল রমযান মাসের দিনগুলোকে নির্দিষ্ট করে দেননি। বরং কোন শরীয়াত সমর্থিত ওজরের কারণে যারা রমযানে রোযা রাখতে অপারগ হয় তারা অন্য দিনগুলোয় এই রোযা রাখতে পারে, এর পথও উন্মুক্ত রাখা

www.pathagar.com

হয়েছে। মানুষকে কুরআনের যে নিয়ামত দান করা হয়েছে তার শুকরিয়া আদায় করার মূল্যবান সুযোগ থেকে যাতে কেউ বঞ্চিত না হয় তার জন্য এই ব্যবস্থা।

১৮৫ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

এ আয়াতের ২টি অংশ:

১. ১ম অংশে কুরআনের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে
২. ২য় অংশে অসুস্থ ও সফরকারীর সিয়াম পালনের বিধান আলোচনা হয়েছে।

মাহে রামাদানের শ্রেষ্ঠ উপহার আল-কুরআন:

সময় ও কালের বিবেচনায় সব দিন-ক্ষণ সমান। কিন্তু গুরুত্ব ও বিশেষত্ব বিবেচনায় কোন কোন দিনক্ষণ স্মরণীয় ও বর্ণাঢ্য হয়ে থাকে। যেমন ভাষা দিবস, স্বাধীনতা দিবস, কুরআন দিবস ও শহীদ দিবস ইত্যাদি। কোন বিশেষ সময়ে এ দিবসগুলোর কর্মকাণ্ড দেশ-জাতির হৃদয়ে গভীরভাবে স্থান করে নিয়েছে। ফলে বছর ঘুরে দিবসগুলো নতুন করে আনন্দ-বেদনা কর্মপ্রেরণা ও সাহস যোগায়। ধনী-গরিব, বড়-ছোট, অট্টালিকা-বস্তি ও শহর-গ্রাম সকলের মাঝে নতুন করে উৎসাহ, উদ্দীপনা ও অণুপ্রেরণা নিয়ে আসে মাহে রামাদান। প্রকৃতপক্ষে এ রামাদানের মর্যাদা বা শক্তির উৎস কি? সূরা বাকারার ১৮৫ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন,

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْ أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ

অর্থাৎ-রামাদান মাস। এ মাসে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে মানবজাতির জন্য পথ নির্দেশিকা। সুস্পষ্ট নির্দেশনা ও সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী। উক্ত আয়াতে ২টি বিষয় নির্দেশিত হয়েছে।

আল-কুরআন নাজিল হয়েছে- রামাদান মাসে। যা মানব-জাতির জন্য সুস্পষ্ট পথ নির্দেশিকা ও সত্য মিথ্যার পার্থক্যকারী।

আসমানী কিতাবসমূহ কখন নাজিল হয়েছে:

ইবনে আব্বাস (রা:) রাসূল (সা:) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল (সা.) বলেছেন:

ক) ইব্রাহীম (আ.) এর ওপর সহীফাসমূহ নাজিল হয়েছে- রামাদানের প্রথম রাতে।
খ) হযরত মূসা (আ.)-এর উপর তাওরাত নাজিল হয়েছে- ৬ রামাদান।
গ) হযরত দাউদ (আ.)- এর উপর যবুর নাজিল হয়েছে- ১২ রামাদান।
ঘ) হযরত ঈসা (আ.)- এর উপর ইঞ্জিল নাজিল হয়েছে- ১৩ রামাদান।
ঙ) আল-কুরআন: প্রথম নাজিল হয়- ২৭ রামাদান (১ম আকাশে)। উল্লেখ্য যে, সেদিন থেকে পরিপূর্ণ কুরআন নাজিল হতে সময় লাগে দীর্ঘ ২৩ বছর।

আল-কুরআন কি?:

কুরআন শব্দটি কারনুন শব্দ থেকে। অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ থেকে নবুওয়াতের ২৩ বছরে হযরত মুহাম্মদ (স.) এর উপর অবতীর্ণ ওহী হচ্ছে কুরআন।

www.pathagar.com

আল-কুরআনের ভাষায় আল-কুরআনের পরিচয়:

১. কুরআন এসেছে আমাদেরকে শ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিণত করার জন্য:

مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى

অর্থাৎ আপনার প্রতি কুরআন এজন্য নাজিল করা হয়নি যে, আপিন হতভাগ্য হয়ে থাকবেন। সূরা ত্বহা: ২

২. আল্লাহর দেয়া কিতাব অর্থাৎ পথ-নির্দেশিকাকে অণুসরণ করা হলে আল্লাহ আকাশ থেকে রিযিক বর্ষণের এবং জমিন থেকে খাদ্য দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُواْ التَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيهِم مِّن رَّبِّهِمْ لأَكَلُواْ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم مِّنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاء مَا يَعْمَلُونَ

অর্থাৎ তাওরাত, ইঞ্জিল এবং অন্যান্য যেসব কিতাব যাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছিল তারা যদি তা অণুসরণ করে চলত তবে তাদের প্রতি আকাশ হতে রিযিক বর্ষণ করা হতো এবং জমিন হতে খাদ্যদ্রব্য ফুটে বের হতো। সূরা মায়েদাহ: ৬৬

৩. কিন্তু আল্লাহর নির্দেশিকা অমান্য করার কারণে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন আমাদের উপর দুঃখ, কষ্ট, দরিদ্রতা ও লাঞ্ছনা ইত্যাদি চাপিয়ে দিয়েছেন।

وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَآؤُواْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ

অর্থাৎ লাঞ্ছনা এবং পরমুখাপেক্ষিতা তাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল এবং আল্লাহর গজবে তারা পরিবেষ্টিত হয়ে পড়েছিল, এর কারণ হচ্ছে তারা আল্লাহর বাণীকে অমান্য করেছিল, অকারণে নবীদেরকে হত্যা করেছিল এবং আল্লাহর দেয়া নির্দিষ্ট সীমানা অতিক্রম করে গিয়েছিল। সূরা বাকারা: ৬১

৪. আল কুরআন রহমত, প্রভাব বিস্তারকারী ও সতর্ককারী:

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلاَّ خَسَارًا

অর্থাৎ আমরা কুরআনে এমন সব বিষয় অবতীর্ণ করেছি, যাতে মুমিনদের জন্য রয়েছে নিরাময় ও রহমত। আর এ কুরআন যালিমদের জন্য ধ্বংস ও ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করে না। সূরা বনি-ইসরাঈল: ৮২

www.pathagar.com

৫. আল কুরআন আল্লাহ প্রদত্ত হিদায়াত:

تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ

অর্থাৎ যারা তাদের রবকে ভয় করে, এই কিতাব (পাঠ ও শ্রবণ করলে) লোম শিউরে উঠে। তারপর তাদের দেহমন বিগলিত হয়ে আল্লাহর স্মরণে নিবিষ্ট হয়। এটি হচ্ছে আল্লাহ প্রদত্ত হিদায়াত, যাকে ইচ্ছা এ হেদায়াত দিয়ে থাকেন। সূরা যুমার: ২৩

৬. আল কুরআন ঈমান বাড়িয়ে দেয়:

وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

অর্থাৎ যখন তাদের সামনে আল্লাহর আয়াত (কুরআন) তিলাওয়াত করা হয়,তাদের ঈমান বেড়ে যায় এবং তারা কেবলমাত্র তাদের প্রভুর ওপরই ভরসা করে। সূরা আনফাল: ২

৭. আল কুরআন বিনয়ী করে দেয়:

لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

অর্থাৎ যদি আমি এই কুরআন পাহাড়ের ওপর অবতীর্ণ করতাম তবে দেখতে পেতে পাহাড় আল্লাহর ভয়ে নুয়ে পড়েছে এবং ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছে। আমরা মানুষের সামনে উপমা এজন্য পেশ করেছি যাতে করে তারা চিন্তাভাবনা করে দেখে। সূরা হাশর: ২১

মহানবী (সা.) বলেছেন, যেই ব্যক্তি কুরআন তিলাওয়াত করে এবং মুখস্থ করে আর এতে বর্ণিত হালালকে হালাল এবং হারামকে হারাম হিসেবে মেনে চলে আল্লাহ তায়ালা তাকে বেহেস্তে প্রবেশ করাবেন এবং তার আত্মীয় স্বজনদের মধ্য থেকে এমন ১০ জনের জন্য তার সুপারিশ কবুল করবেন, যাদের প্রত্যেকের জন্যই দোজখ নির্ধারিত ছিল।

আল কুরআনের কিছু তথ্য

১. মোট সূরা ১১৪টি, মাক্কী সূরা ৮৬ ও মাদানী সূরা ২৮ টি। মোট রুকু ৫৪০টি।

২. মোট আয়াত ৬২৩৬ টি (মতান্তরে ৬৬৬৬টি)। এটা গণনার ধরণের পার্থক্যের ফল।

৩. মোট শব্দ ৭৭২৭৭ বা ৭৭৯৩৪টি গণনার ধরনের কারণেই পার্থক্য হয়েছে। মোট অক্ষর ৩৩৮৬০৬টি।

৪. মোট পারা ৩০টি, ৮৬ হিজরীতে এভাবে পারা ভাগ করা হয়।

www.pathagar.com

৫. প্রথম সংকলন হয় হযরত আবু বকর (রা.) এর খেলাফতের সময়ে হযরত ওমর (রা.) এর পরামর্শক্রমে হযরত যায়েদ বিল সাবিত (রা.)-এর ব্যবস্থাপনায়।

কুরআন তেলাওয়াত প্রসঙ্গঃ

১. কুরআন তেলাওয়াত করা সর্বোত্তম নফল ইবাদত।
২. কুরআন সহীহ করে তেলাওয়াত করা ওয়াজিব।
৩. নামাজের মধ্যে নির্ধারিত পরিমাণ কুরআন তেলাওয়াত করা ফরজ।
৪. অর্থ উপার্জন ও বাহবা অর্জনের উদ্দেশ্যে কুরআন তেলাওয়াত করা হারাম।

কিভাবে কুরআন মানবজাতির 'পথ নির্দেশিকা'

যুগে যুগে মানুষ পথ চলার জন্য বিভিন্ন দর্শন ও মতবাদ আবিষ্কার করে। মানবজাতিকে পথ দেখানোর জন্য দার্শনিক সক্রেটিস, এরিস্টটল ও প্লেটো আদর্শ রাজা ও দার্শনিক রাজার জয়গান গেয়েছেন। দার্শনিক রাজার মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য তাদের কাল্পনিক রাজার সাক্ষাৎ তারা পাননি।

এছাড়াও বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দার্শনিক মানবজাতিকে পথ দেখানোর জন্য বিভিন্ন মতবাদ আবিষ্কার করেন। সতেরো শতকের দিকে ইতালিবাসীকে পথ দেখানোর উদ্দেশ্যে দার্শনিক মুসোলিনী খণ্ড-বিখণ্ড ইতালিবাসীকে জাতীয়তাবাদের দিকে আহবান করেন যা কেবল জাতিপূঁজার সঙ্কীর্ণ মতবাদে পরিণত হয়। জাতীয়তাবাদের মূল বক্তব্যই হচ্ছে- জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করা। কিন্তু এতে জাতি পরিচালনার কোনো দিকনির্দেশনার অস্তিত্ব নেই। যদি জাতীয়তাবাদকে প্রশ্ন করা হয়- কিভাবে আমি আমার জীবন পরিচালনা করব? প্রতিবেশীর সাথে কি ব্যবহার করব? কিংবা কিভাবে পারস্পরিক লেনদেন করব? এ সব প্রশ্নের কোন উত্তর জাতীয়তাবাদের কাছে নেই।

আবার উনিশ শতকে অর্থনৈতিক মুক্তির শ্লোগান তুলে কার্ল মার্কস (১৮১৮-১৮৮৩) ও ফ্রেডরিক এঙ্গেল (১৮২০-১৮৯৫) সমাজতন্ত্রের গোড়াপত্তন করেন। এ মতবাদের মূল কথা হচ্ছে মানবজাতির অর্থনৈতিক মুক্তি। কিন্তু মানুষ কেবল অর্থনৈতিক জীব নয়। এ মতবাদও মানবজাতিকে তার জীবন পরিচালনার কোন দিকনির্দেশনা দিতে পারেনি। যদি জানতে চাওয়া হয়, কিভাবে আমি আমার জীবন পরিচালনা করব? পিতামাতার সাথে কি রকম আচরণ করব? কিভাবে আমাকে পথ চলতে হবে? ইত্যাদি প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে পারে না সমাজতন্ত্র।

অতিসম্প্রতি বিশ্বব্যাপী শ্লোগান উঠেছে গণতন্ত্রই মানুষের মুক্তির পথ। কিন্তু গণতন্ত্র কেবলমাত্র একটি নির্বাচন পদ্ধতি বৈ কিছু নয়। এতেও মানবজাতির জন্য কোন দিকনির্দেশনা নেই। আমি কি খাব? কিভাবে খাব? কিভাবে অর্থনৈতিক লেনদেন করব?

www.pathagar.com

কিভাবে সামাজিক কাজকর্ম করব? যদি গণতন্ত্রকে এ জাতীয় প্রশ্ন করা হয় তাহলে এর উত্তর নীরবতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

অপরদিকে ইসলামের মূল গাইডবুক 'আল-কুরআন'কে যদি জীবন পরিচালনা সংক্রান্ত অথবা জীবনের যেকোন দিক ও বিভাগের সমস্যা সমাধান সংক্রান্ত কোন প্রশ্ন করা হয় তাহলে তার সুন্দরতম উত্তর পাওয়া যায়। *কুরআন মনের প্রশ্নের উত্তর দেয়।*

মানুষ প্রথমত তার মনের ভাব প্রকাশ করে কথার মাধ্যমে। যদি আল-কুরআনকে প্রশ্ন করা হয়, আমি কিভাবে কথা বলব? তাহলে আল-কুরআন উত্তর দেয়

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوْا اللّٰهَ وَقُوْلُوا قَوْلًا سَدِيْدًا

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ, তাকওয়া অবলম্বন কর এবং কথা বল সহজ-সরল ভাবে (অর্থাৎ- কোমলভাবে)।

যদি প্রশ্ন করা হয় আমি কিভাবে পথ চলব? কুরআন উত্তর দেয়-

الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا

অর্থাৎ জমিনের উপর বিনম্রভাবে পথ চলে। (সূরা ফোরকান: ৬৩)

পথ চলতে গিয়ে কেউ যদি গতিরোধ করে অথবা দুর্ব্যবহার করে তখন আমি কি করব? কুরআন উত্তর দিচ্ছে-

وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُوْنَ قَالُوْا سَلَامًا

অর্থাৎ যখন কোন অজ্ঞ (মুর্খ) ব্যক্তি তোমার সাথে বিতর্ক করে তখন তোমরা বল সালাম (তোমরা তার সাথে শান্তিপূর্ণ ব্যবহার করবে)। (সূরা ফোরকান: ৬৩)

কেউ আমার সাথে এমন আচরণ করেছে যে কারণে আমার ক্রোধের সৃষ্টি হয়েছে, এখন আমার করণীয় কি? কুরআন বলছে:

وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ

অর্থাৎ তুমি তোমার রাগকে সংযত কর। (সূরা আলে ইমরান: ১৩৪)

দুর্ব্যবহারের মাত্রা এমন, যাতে আমার প্রতিশোধ নেয়ার অধিকার রয়েছে, এমতাবস্থায় আমি কি করব? কুরআন বলছে:

وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ

অর্থাৎ তুমি মানুষকে মাফ করে দাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ ইহসানকারীকে (মুহসীন) ভালবাসেন। (সূরা আলে ইমরান: ১৩৪)

আমি যদি কুরআনকে প্রশ্ন করি, আমি কি খাব, কিভাবে খাব? কুরআন সাথে সাথে উত্তর দিচ্ছে,

وكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا

অর্থাৎ তোমরা খাও এবং পান কর, কিন্তু অপচয় করো না। আ'রাফ-৩১

আমি যদি প্রশ্ন করি, পিতামাতার সাথে কি রকম ব্যবহার করব? কুরআন বলে দেয়-

وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

www.pathagar.com

অর্থাৎ পিতামাতার সাথে সর্বোত্তম ব্যবহার কর। আল-ইসরা -২৩

কাজেই আল-কুরআন সকল কালে সব মানুষের জন্যে পথ নির্দেশিকা ও আলোকবর্তিকা।

আয়াতগুলোর শিক্ষা:

১. মাহে রামাদানে সিয়াম পালন করা।
২. সিয়াম পালনের মাধ্যমে তাকওয়া অর্জন করার চেষ্টা করা।
৩. অসুস্থ হলে অথবা সফরে থাকলে সক্ষম হবার পর সিয়াম আদায় করা।
৪. সিয়াম পালনে অসমর্থ হলে কাফফারা দেয়া।
৫. আল-কুরআনকে আল্লাহর পক্ষ থেকে পথ নির্দেশিকা হিসাবে অনুসরণ করা।

www.pathagar.com

বিষয়ভিত্তিক
আল হাদীস অধ্যয়ন

রামাদান ম্যানুয়েল- ২২৯

www.pathagar.com

আল হাদীস অধ্যয়ন

বিষয়ভিত্তিক হাদীস: ০১

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ "بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ ."رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ ،

আবু আব্দির রহমান আব্দুল্লাহ ইবনে উমার ইবনে আল-খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন- আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, "পাঁচটি জিনিসের উপর ইসলামের বুনিয়াদ রাখা হয়েছে সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্যকোন সত্য মা'বুদ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল, সালাত কায়েম করা, যাকাত আদায় করা, আল্লাহর ঘরের হজ্জ করা এবং রমাদানের সওম পালন করা।" [বুখারী ও মুসলিম]

বিষয়ভিত্তিক হাদীস: ০২

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ؛ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى .رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: আমাকে হুকুম দেয়া হয়েছে ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষের সঙ্গে লড়াই করতে যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা এ কথার সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন সত্য ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূল। আর তারা সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয়। যদি তারা এরূপ করে তবে তারা আমার হাত থেকে নিজেদের জীবন ও সম্পদ রক্ষা করে নেবে, অবশ্য ইসলামের হক যদি তা দাবী করে তবে আলাদা কথা; আর তাদের হিসাব নেয়ার দায়িত্ব আল্লাহর উপর ন্যস্ত। [বুখারী ও মুসলিম]

www.pathagar.com

বিষয়ভিত্তিক হাদীস-০৩

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صَخْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ، وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ . [رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ .]

আবু হুরায়রা আব্দুর রহমান ইবন সাখর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন- আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: আমি তোমাদেরকে যেসব বিষয় নিষেধ করেছি, তা থেকে বিরত থাক। আর যেসব বিষয়ে আদেশ করেছি, যথাসম্ভব তা পালন কর। বেশী বেশী প্রশ্ন করা আর নবীদের সথে মতবিরোধ করা তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের ধ্বংস করে দিয়েছে। [বুখারী ও মুসলিম]

বিষয়ভিত্তিক হাদীস-০৪

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَيْضًا قَالَ "بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ، إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ، شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْرِ، لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ، وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ. حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. قَالَ: صَدَقْتَ . فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ! قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ. قَالَ: أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ. قَالَ: صَدَقْتَ. قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ. قَالَ: أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ. قَالَ: مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ. قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا؟ قَالَ: أَنْ تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا، وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ. ثُمَّ انْطَلَقَ، فَلَبِثْنَا مَلِيًّا، ثُمَّ قَالَ: يَا عُمَرُ أَتَدْرِي مَنِ السَّائِلُ؟. قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ

এটাও উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন,একদিন আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বসেছিলাম, এমন সময় হঠাৎ এক

www.pathagar.com

ব্যক্তি আমাদের সামনে উপস্থিত হয়, যার কাপড় ছিল ধবধবে সাদা, চুল ছিল ভীষণ কালো; তার মাঝে ভ্রমণের কোন লক্ষণ পরিলক্ষিত হচ্ছিল না। আমাদের মধ্যে কেউ তাকে চিনতে পারেনি। সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে গিয়ে বসে, নিজের হাঁটু তার হাঁটুর সঙ্গে মিলিয়ে নিজের হাত তার উরুতে রেখে বললেনঃ "হে মুহাম্মাদ, আমাকে ইসলাম সম্পর্কে বলুন"।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ "ইসলাম হচ্ছে এই- তুমি সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন সত্য ইলাহ্ নেই এবং মুহাম্মাদ (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূল, সালাত প্রতিষ্ঠা কর, যাকাত আদায় কর, রামাদানে সাওম সাধনা কর এবং যদি সামর্থ থাকে তবে (আল্লাহর) ঘরের হজ্জ কর।"

তিনি (লোকটি) বললেনঃ "আপনি ঠিক বলেছেন"। আমরা বিস্মিত হলাম, সে নিজে তার নিকট জিজ্ঞাসা করেছে আবার নিজেই তার জবাবকে ঠিক বলে ঘোষণা করছে। এরপর বলল: "আচ্ছা, আমাকে ঈমান সম্পর্কে বলুন"।

তিনি (রাসূল) বললেনঃ "তা হচ্ছে এই- আল্লাহর ফিরিশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ ও আখেরাতর উপর ঈমান আনা এবং তাকদীরের ভাল-মন্দের উপর ঈমান আনা"।

সে (আগন্তুক) বলল: "আপনি ঠিক বলেছেন"। তারপর বলল: "আমাকে ইহসান সম্পর্কে বলুন"।

তিনি বলেনঃ "তা হচ্ছে এই- তুমি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদাত কর যেন তুমি আল্লাহকে দেখতে পাচ্ছ, আর তুমি যদি তাঁকে দেখতে নাও পাও তবে তিনি তোমাকে দেখছেন"।

সে (আগন্তুক) বলল: "আমাকে কেয়ামত সম্পর্কে বলুন"।

তিনি (রাসূল) বললেনঃ "যাকে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে সে জিজ্ঞাসাকারী অপেক্ষাবেশী কিছু জানে না"।

সে (আগন্তুক) বলল: "আচ্ছা, তার লক্ষণ সম্পর্কে বলুন"।

তিনি (রাসূল) বললেনঃ "তা হচ্ছে এই- দাসী নিজের মালিককে জন্ম দেবে, সম্পদ ও বস্ত্রহীন রাখালগণ উঁচু উঁচু প্রাসাদ তৈরি করে দম্ভ করবে"।

তারপর ঐ ব্যক্তি চলে যায়, আর আমি আরো কিছুক্ষণ বসে থাকি। তখন তিনি (রাসূল) আমাকে বললেনঃ "হে উমার, প্রশ্নকারী কে ছিলেন, তুমি কি জান? আমি বললামঃ "আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অধিক ভাল জানেন"। তিনি (রাসূল সাঃ) বললেনঃ "তিনি হলেন জিবরীল। তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন শিক্ষা দিতে তোমাদের কাছে এসেছিলেন।" [সহীহ মুসলিম]

www.pathagar.com

বিষয়ভিত্তিক হাদীস-০৫

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم": مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ."[حَدِيثٌ حَسَنٌ، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ, رقم: 2318، ابن ماجه, رقم: 3976]

আবু হুরায়রা (রা:) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "অনর্থক অপ্রয়োজনীয় বিষয় ত্যাগ করাই একজন ব্যক্তির উত্তম ইসলাম"। [হাদীসটি হাসান। তিরমিযী: ইবনে মাজাহ.]

বিষয়ভিত্তিক হাদীস-০৬

عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ" :كُنْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَوْمًا، فَقَالَ: يَا غُلَامُ! إِنِّي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ: احْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظْكَ، احْفَظِ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ، إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ؛ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ، وَجَفَّتِ الصُّحُفُ."[رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ: 2516] وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَفِي رِوَايَةٍ غَيْرِ التِّرْمِذِيِّ: "احْفَظِ اللَّهَ تَجِدْهُ أَمَامَكَ، تَعَرَّفْ إِلَى اللَّهِ فِي الرَّخَاءِ يَعْرِفْكَ فِي الشِّدَّةِ، وَاعْلَمْ أَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا."

"আবূ আব্বাস আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা:) বর্ণনা করেছেন- একদিন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পিছনে ছিলাম, তিনি আমাকে বললেন: "হে যুবক! আমি তোমাকে কয়েকটি কথা শেখাবো- আল্লাহকে সংরক্ষণ করবে তো তিনি তোমাকে সংরক্ষণ করবেন, আল্লাহকে স্মরণ করলে তাঁকে তোমার সামনেই পাবে। যখন কিছু চাইবে তো আল্লাহর কাছেই চাইবে; যখন সাহায্য চাইবে তো আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাইবে। জেনে রাখ, সমস্ত মানুষ যদি তোমার কোন উপকার করতে চায় তবে আল্লাহ তোমার জন্য যা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, তা ব্যতীত আর কোন উপকার করতে পারবে না। আর যদি সমস্ত মানুষ তোমার কোন অনিষ্ট করতে চায় তবে আল্লাহ তোমার জন্য যা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন তা ব্যতীত আর কোন অনিষ্ট করতে পারবে না। কলম তুলে নেয়া হয়েছে এবং পৃষ্ঠা শুকিয়েগেছে"। [তিরমিযী হাদীসটি সহীহ হাসান বলেছেন।]

তিরমিযী ছাড়া অন্য বর্ণনায় বলা হয়েছে:

www.pathagar.com

"আল্লাহকে স্মরণ করবে তো তাঁকে তোমার সম্মুখে পাবে, তুমি স্বচ্ছল অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করবে তো তিনি তোমাকে কঠিন অবস্থায় স্মরণ করবেন। মনে রেখো- যা তুমি পেলে না, তা তোমার পাবার ছিল না, আর যা তুমি পেলে তা তুমি না পেয়ে থাকতে না। আরও জেনে রাখো- ধৈর্য্য ধারণের ফলে (আল্লাহর) সাহায্য লাভ করা যায়। কষ্টের পর স্বাচ্ছন্দ আসে। কঠিন অবস্থার পর স্বচ্ছলতা আসে।

বিষয়ভিত্তিক হাদীস-০৭

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيِّ الْبَدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: "إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ الْأُولَى: إِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ." رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ:

আবূ মাসউদ উকবাহ ইবন আমর আল-আনসারী আল-বদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত হয়েছে- তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "অতীতের নবীগণের কাছ থেকে মানুষ একথা জানতে পেরেছে- যদি তোমার লজ্জা না থাকে তাহলে যা ইচ্ছা তাই কর"। বুখারী

বিষয়ভিত্তিক হাদীস-০৮

عَنْ أَبِي عَمْرٍو وَقِيلَ: أَبِي عَمْرَةَ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ":قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! قُلْ لِي فِي الْإِسْلَامِ قَوْلًا لَا أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا غَيْرَكَ؛ قَالَ: قُلْ: آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ." رَوَاهُ مُسْلِم

আবূ আমরকে আবূ আমরাহ বলা হয়- সুফিয়ান ইবন আব্দুল্লাহ হতে বর্ণনা করেছেন- আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে ইসলাম সম্পর্কে এমন কিছু বলে দিন যেন আপনাকে ব্যতীত আর কারো কাছে কিছু জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন না হয়। তিনি বললেন: বল, "আমি আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি; তারপর এর উপর দৃঢ় থাক"। [মুসলিম]

বিষয়ভিত্তিক হাদীস-০৯

عَنْ أَبِي يَعْلَى شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ : "إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ." رَوَاهُ مُسْلِمٌ

আবূ ইয়া'লা শাদ্দাদ ইবন আওস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: নিঃসন্দেহে আল্লাহ সমস্ত জিনিস উত্তম পদ্ধতিতে করার বিধান করে দিয়েছেন। সুতরাং যখন তুমি হত্যা করবে, তখন উত্তম পদ্ধতিতে হত্যা করবে আর যখন তুমি যবেহ করবে, তখন উত্তম পদ্ধতিতে যবেহ

www.pathagar.com

করবে। তোমাদের প্রত্যেকের আপন ছুরি ধারালো করে নেয়া উচিত, ও যে জন্তুকে যবেহ করা হবে তার কষ্ট লাঘব করা উচিত। [মুসলিম]

বিষয়ভিত্তিক হাদীস-১০

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ":مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ." [رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ, رقم: 6018، وَمُسْلِمٌ, رقم: 47]

আবু হুরায়রা (রা:) হতে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

"যে ব্যক্তি আল্লাহতে ও আখেরাতে ঈমান রাখে, তার উচিত হয় উত্তম কথা বলা অথবা চুপ থাকা। আর যে ব্যক্তি আল্লাহতে ও আখেরাতে ঈমান রাখে, তার উচিত আপন প্রতিবেশীর প্রতি সদয় হওয়া। আর যে ব্যক্তি আল্লাহতে ও আখেরাতের উপর ঈমান রাখে, তার উচিত আপন অতিথির সম্মান করা"। [বুখারী ও মুসলিম]

বিষয়ভিত্তিক হাদীস: ১১

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ تَعَالَى: "يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا"، وَقَالَ تَعَالَى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ. ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ: يَا رَبِّ! يَا رَبِّ! وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لَهُ؟. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

আবু হুরায়রা ((রা:) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: আল্লাহ তা'আলা পাক-পবিত্র, তাই তিনি কেবল পবিত্র জিনিসই কবুল করে থাকেন। আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের ঐ কাজই করার হুকুম দিয়েছেন যা করার হুকুম তিনি রাসূলদেরকে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: ((হে রাসূলগণ! পবিত্র বস্তু আহার করুন এবং নেক আমল করুন।)) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন: ((হে মুমিনগণ! আমরা তোমাদের যে পবিত্র জীবিকা দান করেছি তা থেকে আহার কর।))

তারপর তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.) এমন এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করলেন যে ব্যক্তি দীর্ঘ সফরে বের হয় এবং তার চুলগুলো এলোমেলো হয়ে আছে ও কাপড় ধুলোবালিতে ময়লা হয়ে আছে। অত:পর সে নিজের দুই হাত আকাশের দিকে তুলে ধরে ও বলে: হে রব! হে রব! অথচ তার খাদ্য হারাম, তার পানীয় হারাম, তার পোষাক হারাম, সে হারামভাবে লালিত-পালিত হয়েছে; এ অবস্থায় কেমন করে তার দো'আ কবুল হতে পারে।

www.pathagar.com

বিষয়ভিত্তিক হাদীসঃ ১২

عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ سِبْطِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَيْحَانَتِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "دَعْ مَا يُرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يُرِيبُكَ." [رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্নেহাস্পদ দৌহিত্র আবু মুহাম্মাদ হাসান ইবন আলী ইবন আবী তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেনঃ "আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হতে এ কথা শুনে স্মরণ রেখেছিঃ সন্দেহযুক্ত বিষয় বর্জন করে সন্দেহমুক্ত বিষয় গ্রহণ কর"। (তিরমিযী ও নাসায়ী। আর ইমাম তিরমিযী বলেছেনঃ হাদীসটি হাসান সহীহ।)

বিষয়ভিত্তিক হাদীসঃ ১৩

عَنْ أَبِي رُقَيَّةَ تَمِيمِ بْنِ أَوْسٍ الدَّارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "الدِّينُ النَّصِيحَةُ. قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ لِلَّهِ، وَلِكِتَابِهِ، وَلِرَسُولِهِ، وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ. " رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

আবু রুকাইয়াহ তামীম ইবন আওস আদ্দারী (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ দ্বীন হচ্ছে শুভকামনা। আমরা জিজ্ঞেস করলামঃ কার জন্য? তিনি বললেনঃ আল্লাহর কিতাবের, তাঁর রাসূলের, মুসলিম নেতাদের এবং সকল মুসলিমের জন্য। [মুসলিম]

বিষয়ভিত্তিক হাদীসঃ ১৪

عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ أَبِي حَفْصٍ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ " رَوَاهُ البخاري ومسلم.

আমীরুল মুমিনীন আবু হাফস ওমর ইবনে আল-খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ "সমস্ত কাজের ফলাফল নির্ভর করে নিয়্যতের উপর, আর প্রত্যেক ব্যক্তি যা নিয়্যত করেছে, তাই পাবে। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহও তাঁর রাসূলের জন্য হিজরত করেছে, তার

www.pathagar.com

হিজরত আল্লাহও তাঁর রাসূলের দিকে হয়েছে, আর যার হিজরত দুনিয়া (পার্থিব বস্তু) আহরণ করার জন্য অথবা মহিলাকে বিয়ে করার জন্য তার হিজরত সে জন্য বিবেচিত হবে যে জন্য সে হিজরত করেছে"।

বিষয়ভিত্তিক হাদীস: ১৫

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا" :أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَ: أَرَأَيْتَ إِذَا صَلَّيْتُ الْمَكْتُوبَاتِ، وَصُمْتُ رَمَضَانَ، وَأَحْلَلْتُ الْحَلَالَ، وَحَرَّمْتُ الْحَرَامَ، وَلَمْ أَزِدْ عَلَى ذَلِكَ شَيْئًا؛ أَأَدْخُلُ الْجَنَّةَ؟ قَالَ: نَعَمْ." [رَوَاهُ مُسْلِمٌ:]

আবূ আব্দুল্লাহ জাবের ইবন আব্দুল্লাহ আল-আনসারী (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত হয়েছে- এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন: আপনি কি মনে করেন যদি আমি ফরয নামায আদায় করি, রমযানের রোযা রাখি, হালালকে হালাল বলে ও হারামকে হারাম বলে ঘোষণা করি, আর এরবেশী কিছু না করি, তাহলে কি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবো? তিনি বললেন: হ্যাঁ। মুসলিম

বিষয়ভিত্তিক হাদীস: ১৬

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم":لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ ." [رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ]

ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "কোন মুসলিমের রক্তপাত করা তিনটি কারণ ব্যতীত বৈধ নয়- বিবাহিত ব্যক্তি যদি ব্যভিচার করে, আর যদি প্রাণের বদলে প্রাণ নিতে হয়। আর যদি কেউ স্বীয় দ্বীনকে পরিত্যাগ করে মুসলিম জামা'আত হতে আলাদা হয়ে যায়"। বুখারী ও মুসলিম

বিষয়ভিত্তিক হাদীস: ১৭

عَنْ أَبِي ذَرٍّ جُنْدَبِ بْنِ جُنَادَةَ، وَأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ":اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ."رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ: وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ: حَسَنٌ صَحِيحٌ.

আবু যার জুনদুব ইবন জুনাদাহ এবং আবু আব্দুর রহমান মু'আয ইবন জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত আছে, তারা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: তুমি যেখানে যে অবস্থায় থাক না কেন আল্লাহকে ভয় কর এবং

www.pathagar.com

প্রত্যেক মন্দ কাজের পর ভাল কাজ কর, যা তাকে মুছে দেবে; আর মানুষের সঙ্গে ভাল ব্যবহার কর।
[তিরমিযী: এবং (তিরমিযী) বলেছেন যে,এটা হচ্ছে হাসান হাদীস। কোন কোন সংকলনে এটাকে হাসান সহীহ বলা হয়েছে]

বিষয়ভিত্তিক হাদীস: ১৮

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَوْصِنِي. قَالَ: لَا تَغْضَبْ، فَرَدَّدَ مِرَارًا، قَالَ: لَا تَغْضَبْ. "[رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ:]

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত হয়েছে- এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলল: আমাকে কিছু উপদেশ দিন। তিনি বললেন: রাগ করো না। লোকটি বার বার রাসূলের নিকট উপেদশ চায় আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: রাগ করো না। [বুখারী]

বিষয়ভিত্তিক হাদীস: ১৯

عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْحَارِثِ بْنِ عَاصِمٍ الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: "الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ، وَسُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَآنِ -أَوْ: تَمْلَأُ- مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وَالصَّلَاةُ نُورٌ، وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ، وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَك أَوْ عَلَيْك، كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو، فَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا." رَوَاهُ مُسْلِم

আবু মালেক আল-হারেস ইবন আসেম আল-আশ'আরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত হয়েছে- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক; আল-হামদুলিল্লাহ সমস্ত প্রশংসা কেবলমাত্র আল্লাহর জন্য) বললে পাল্লা পরিপূর্ণ করে দেয় এবং "সুবহানাল্লাহ ওয়াল-হামদুলিল্লাহ আল্লাহ কতই না পবিত্র! এবং সমস্ত প্রশংসাকেবলমাত্র আল্লাহর জন্য) উভয়ে অথবা এর একটি আসমান ও যমীনের মাঝখান পূর্ণ করে দেয়। নামায হচ্ছে আলো, সাদকা হচ্ছে প্রমাণ, সবর উজ্জ্বল আলো, আর কুরআন তোমার পক্ষে অথবা বিপক্ষে প্রমাণ। প্রত্যেক ব্যক্তি আপন আত্মার ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে সকাল শুরু করে- আর তা হয় তাকে মুক্ত করে দেয় অথবা তাকে ধ্বংস করে দেয়"। [মুসলিম]

www.pathagar.com

عَنْ أَبِي ذَرٍّ الغِفَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فِيمَا يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالى، أَنَّهُ قَالَ: "يَا عِبَادِي: إِنِّي حَرَّمْت الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي، وَجَعَلْته بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا؛ فَلَا تَظَالَمُوا. يَا عِبَادِي! كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلَّا مَنْ هَدَيْته، فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ. يَا عِبَادِي! كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلَّا مَنْ أَطْعَمْته، فَاسْتَطْعِمُونِي أُطْعِمْكُمْ. يَا عِبَادِي! كُلُّكُمْ عَارٍ إِلَّا مَنْ كَسَوْته، فَاسْتَكْسُونِي أَكْسُكُمْ. يَا عِبَادِي! إِنَّكُمْ تُخْطِئُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا؛ فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ. يَا عِبَادِي! إِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا ضُرِّي فَتَضُرُّونِي، وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِي. يَا عِبَادِي! لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَتْقَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ، مَا زَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي شَيْئًا. يَا عِبَادِي! لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ، مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئًا. يَا عِبَادِي! لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، فَسَأَلُونِي، فَأَعْطَيْت كُلَّ وَاحِدٍ مَسْأَلَته، مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ المِخْيَطُ إِذَا أُدْخِلَ البَحْرَ. يَا عِبَادِي! إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيهَا لَكُمْ، ثُمَّ أُوَفِّيكُمْ إِيَّاهَا؛ فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدْ اللَّهَ، وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَن إِلَّا نَفْسَهُ." [رَوَاهُ مُسْلِمٌ]

আবূ যর আল-গিফারী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বর্ণনা করেছেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বরকতময় ও সুমহান রবের নিকট হতে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ বলেছেন: "হে আমার বান্দাগণ! আমি যুলুমকে আমার জন্য হারাম করে দিয়েছি, আর তা তোমাদের মধ্যেও হারাম করে দিয়েছি; অতএব তোমরা একে অপরের উপর যুলুম করো না।

হে আমার বান্দাগণ! আমি যাকে হেদায়াত দিয়েছি সে ছাড়া তোমরা সকলেই পথভ্রষ্ট। সুতরাং আমার কাছে হেদায়াত চাও, আমি তোমাদের হেদায়াত দান করব। হে আমার বান্দাগণ! আমি যাকে অন্ন দান করেছি, সে ছাড়া তোমরা সকলেই ক্ষুধার্ত। সুতরাং তোমরা আমার নিকট খাদ্য চাও, আমি তোমাদের খাদ্য দান করব।

হে আমার বান্দাগণ! তোমরা সবাই বিবস্ত্র, সে ব্যতীত যাকে আমি কাপড় পরিয়েছি। সুতরাং আমার কাছে বস্ত্র চাও, আমি তোমাদেরকে বস্ত্র দান করব।

হে আমার বান্দাগণ! তোমরা রাত-দিন গোনাহ করছ, আর আমি তোমাদের গোনাহ ক্ষমা করে দেই। সুতরাং আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর, আমি তোমাদের ক্ষমা করে দেব। হে আমার বান্দাগণ! তোমরা কখনোই আমার ক্ষতি করার সামর্থ রাখ না যে আমার ক্ষতি করবে আর তোমরা কখনোই আমার ভালো করার ক্ষমতা রাখ না যে আমার ভালো করবে। হে আমার বান্দাগণ! তোমরা পূর্বাপর সকল মানুষ ও জ্বিন যদি তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় মোত্তাকী ও পরহেযগার ব্যক্তির হৃদয়ের মত হয়ে যায়, তবে তা আমার রাজত্বে কিছুই বৃদ্ধি করবে না।

www.pathagar.com

আমার বান্দাগণ! তোমাদের পূর্বাপর সকল মানুষ ও জ্বিন যদি তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে পাপী ব্যক্তির হৃদয়ের মত হয়ে যায়, তবে তা আমার রাজত্বে কিছুই কমাতে পারবে না। হে আমার বান্দাগণ! তোমাদের পূর্বের ও তোমাদের পরের সকলে, তোমাদের সমস্ত মানুষ ও তোমাদের সমস্ত জ্বিন যদি সবাই একই ময়দানে দাঁড়িয়ে আমার কাছে চায় এবং আমি সকলের চাওয়া পূরণ করে দেই তবে আমার নিকট যা আছে তাতে সমুদ্রে এক সুঁই রাখলে যতটা কম হয়ে যায় তা ব্যতীত আর কিছু কম হতে পারে না।
হে আমার বান্দাগণ! আমি তোমাদের আমলকে (কাজকে) তোমাদের জন্য গণনা করে রাখি, আর আমি তার পুরোপুরি প্রতিফল দিয়ে দেব। সুতরাং যে ব্যক্তি উত্তম প্রতিফল পাবে তার আল্লাহর প্রশংসা করা উচিত, আর যে তার বিপরীত পাবে তার শুধু নিজেকেই ধিক্কার দেয়া উচিত।"

বিষয়ভিত্তিক হাদীস: ২১

عَنْ أَبِي حَمْزَةَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ خَادِمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ: "لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ." [رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ، وَمُسْلِمٌ]

আবু হামযাহ আনাস ইবন মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু-রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের খাদেম-হতে বর্ণিত হয়েছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "তোমাদের মধ্যে কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তার ভাইয়ের জন্য তা-ই পছন্দ করবে যাসে নিজের জন্য পছন্দ করে"। [বুখারী, মুসলিম]

বিষয়ভিত্তিক হাদীস: ২২

عَنْ أَبِي نَجِيحٍ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: "وَعَظَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَوْعِظَةً وَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، وَذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَأَنَّهَا مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ فَأَوْصِنَا، قَالَ: أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ؛ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ ."رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

www.pathagar.com

আবু নাজীহ আল-ইরবাদ ইবনে সারিয়াহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক বক্তৃতায় আমাদের উপদেশ দান করেন যাতে আমাদের অন্তর ভীত হয়ে পড়ে ও আমাদের চোখে পানি এসে যায়। আমরা নিবেদন করি: হে আল্লাহর রাসূল! মনে হচ্ছে বিদায়কালীন উপদেশ; আপনি আমাদেরকে অসীয়াত করুন। তিনি বললেন: "আমি তোমাদের মহান আল্লাহকে ভয় করতে অসীয়াত করছি, আর আনুগত্য দেখাতে অসীয়াত করছি; যদি কোন গোলামও তোমাদের শাসক হয় তবুও। তোমাদের মধ্যে যারা বেঁচে থাকবে তারা অনেক মতবিরোধ দেখবে; সুতরাং তোমরা আমার সুন্নাত ও হেদায়াত প্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের পদ্ধতি মেনে চল, তা দাঁত দিয়ে (অর্থাৎ খুব শক্তভাবে) ধরে রাখ; আর অভিনব বিষয় সম্পর্কে সাবধান থাক, কারণ প্রত্যেক অভিনব বিষয় হচ্ছে বিদ'আত, প্রত্যেক বিদ'আত হচ্ছে গোমরাহী এবং প্রত্যেক গোমরাহীর পরিণাম হচ্ছে জাহান্নামের আগুন"। আবূ দাউদ ও তিরমিযী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন যে, এটা সহীহ হাসান হাদীস।

বিষয়ভিত্তিক হাদীস- ২৩

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَيْضًا،" أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالْأُجُورِ؛ يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ. قَالَ: أَوَلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَا تَصَّدَّقُونَ؟ إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةً، وَأَمْرٌ بِمَعْرُوفٍ صَدَقَةً، وَنَهْيٌ عَنْ مُنْكَرٍ صَدَقَةً، وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةً. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ؟ قَالَ: أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ وِزْرٌ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الحَلَالِ، كَانَ لَهُ أَجْرٌ." [رَوَاهُ مُسْلِمٌ]

আবূ যর (রা:) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহর কিছু সাহাবী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেন: "হে আল্লাহর রাসূল! বিত্তবান লোকেরা প্রতিফল ও সওয়াবের কাজে এগিয়ে গেছে। আমরা নামায পড়ি তারাও সেরকম নামায পড়ে, আমরা রোযা রাখি তারাও সেরকম রোযা রাখে, তারা প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ সদকা করে।

তিনি বলেন: আল্লাহ তোমাদের জন্য এমন জিনিস রাখেননি যে তোমরা সদকা দিতে পার। প্রত্যেক তাসবীহ (সুবহান আল্লাহ) সদকাহ প্রত্যেক তাকবীর (আল্লাহু আকবার) হচ্ছে সদকাহ, প্রত্যেক তাহমীদ (আলহামদুলিল্লাহ) সদকাহ, প্রত্যেক তাহলীল (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ) সদকাহ, প্রত্যেক ভালো কাজের হুকুমদেয়া হচ্ছে সদকাহ এবং মন্দ কাজথেকে বিরত করা হচ্ছে সদকাহ আরতোমাদের প্রত্যেকে আপন স্ত্রীর সাথে সহবাস করাও হচ্ছে সদকাহ

তারা জিজ্ঞাসা করেন: হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মধ্যে কেউ যখন যেনার আকাঙ্খা সহকারে স্ত্রীর সাথে সম্ভোগ করে, তাতেও কি সওয়াব হবে?

www.pathagar.com

তিনি বলেনঃ তোমরা কি দেখ না, যখন সে হারাম পদ্ধতিতে তা করে, তখন সে গোনাহগার হয় কি না! সুতরাং অনুরূপভাবে যখন সে ঐ কাজ বৈধভাবে করে তখন সে তার জন্য প্রতিফল ও সওয়াব পাবে"। মুসলিম

বিষয়ভিত্তিক হাদীসঃ ২৪

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ: "إِنَّ الحَلَالَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ القَلْبُ." رَوَاهُ البُخَارِيُّ , وَمُسْلِمٌ .

আবু আব্দিল্লাহ আন নু'মান ইবনে বশীর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন- আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ

নিঃসন্দেহে হালাল সুস্পষ্ট এবং হারামও সুস্পষ্ট, আর এ দু'য়ের মধ্যে কিছু সন্দেহজনক বিষয় আছে যা অনেকে জানে না। অতএব, যে ব্যক্তি সন্দিহান বিষয় হতে নিজেকে রক্ষা করেছে; সে নিজের দ্বীনকে পবিত্র করেছে এবং নিজের সম্মানকেও রক্ষা করেছে। আর যে ব্যক্তি সন্দেহযুক্ত বিষয়ে পতিত হয়েছে; সে হারামে পতিত হয়েছে। তার অবস্থা সেই রাখালের মত যে নিষিদ্ধ চারণভূমির চারপাশে (গবাদিপশু) চরায়, আর সর্বদা এ আশংকায় থাকে যে, যেকোন সময় কোন পশু তার মধ্যে প্রবেশ করে চরতে আরম্ভ করবে।

সাবধান! প্রত্যেক রাজা-বাদশাহর একটি সংরক্ষিত এলাকা আছে। আর আল্লাহর সংরক্ষিত এলাকা হচ্ছে তাঁর হারামকৃত বিষয়াদি। সাবধান! নিশ্চয়ই শরীরের মধ্যে একটি মাংসপিন্ড আছে; যখন তা ঠিক থাকে তখন সমস্ত শরীর ঠিক থাকে, আর যখন তা নষ্ট হয়ে যায় তখন গোটা দেহ নষ্ট হয়ে যায় -এটা হচ্ছে ক্বাল্‌ব (হৃদপিন্ড)।

বিষয়ভিত্তিক হাদীসঃ ২৫

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ: "مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ القِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ العَبْدِ مَا كَانَ العَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الجَنَّةِ، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ، وَيَتَدَارَسُونَهُ فِيمَا بَيْنَهُمْ؛ إِلَّا نَزَلَتْ

www.pathagar.com

عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ، وَمَنْ أَبْطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ." رَوَاهُ مُسْلِمٌ بهذا اللفظ .

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি দুনিয়াতে কোন মুমিনের দুঃখ দূর করে দেয়, আল্লাহ কেয়ামতের দিন তার দুঃখ দূর করে দিবেন। যে ব্যক্তি কোন বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির বিপদ দূর করে দেয়, আল্লাহ দুনিয়াতে ও আখেরাতে তার বিপদ দূর করে দিবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবে, আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে তার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবেন। যে বান্দা তার কোন ভাইকে সাহায্য করবে, আল্লাহ সে বান্দাকে সাহায্য করবেন। যে ব্যক্তি জ্ঞান লাভের জন্য কোন রাস্তা গ্রহণ করে, তার অসীলায় আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের রাস্তা সহজ করে দিবেন। যেসব লোক আল্লাহর ঘরসমূহের মধ্যে কোন ঘরে (অর্থাৎ মসজিদে) সমবেত হবে, কুরআন পড়বে, সকলে মিলিত হয়ে তার শিক্ষা নেবে ও দেবে, তাদের উপর অবশ্যই প্রশান্তি অবতীর্ণ হবে, রহমত তাদের ঢেকে নেবে, ফিরিশতাগণ তাদের ঘিরে থাকবে আর আল্লাহ তাদের কথা এমন সকলের মধ্যে উল্লেখ করবেন যারা তাঁর কাছে উপস্থিত। যে ব্যক্তি তার আমলের কারণে পিছিয়ে পড়বে, তার বংশ পরিচয় তাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না। মুসলিম

বিষয়ভিত্তিক হাদীসঃ ২৬

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ، وَلَا يَخْذُلُهُ، وَلَا يَكْذِبُهُ، وَلَا يَحْقِرُهُ، التَّقْوَى هَاهُنَا، وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ: دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ. " رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ পরস্পর হিংসা করো না, একে অপরের জন্য নিলাম ডেকে দাম বাড়াবে না, পরস্পর বিদ্বেষ পোষণ করবে না, একে অপর থেকে আলাদা হয়ে যেওনা, একজনের ক্রয়ের উপর অন্যজন ক্রয় করো না। হে আল্লাহর বান্দাগণ! পরস্পর ভাই ভাই হয়ে যাও। মুসলিম মুসলিমের ভাই, সে তার উপর যুলুম করে না এবং তাকে সঙ্গীহীন ও সহায়হীনভাবে ছেড়ে দেয়না। সে তার কাছে মিথ্যা বলে না ও তাকে অপমান করে না। তাকওয়া হচ্ছে- এখানে, তিনি নিজের বুকের দিকে তিনবার ইশারা করেন। কোন মানুষের জন্য এতটুকু মন্দ যথেষ্ট যে, সে আপন মুসলিম ভাইকে নীচ ও হীন মনে করে। এক মুসলিমের রক্ত, সম্পদ ও মান-সম্মান অন্য মুসলিমের জন্য হারাম। মুসলিম

www.pathagar.com

বিষয়ভিত্তিক হাদীস: ২৭

عَنْ أَنَس بْن مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: "يَا ابْنَ آدَمَ! إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ مِنْكَ وَلَا أُبَالِي، يَا ابْنَ آدَمَ! لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ، يَا ابْنَ آدَمَ! إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيتَنِي لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً . "رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

আনাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: হে আদম সন্তান! যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি আমাকে ডাকবে এবং আমার কাছে (ক্ষমা) প্রত্যাশা করবে, তুমি যা-ই প্রকাশ হোক না কেন আমি তা ক্ষমা করে দেব- আর আমি কোন কিছুর পরোয়া করি না। হে আদম সন্তান! তোমার গোনাহ যদি আকাশ সমান হয়ে যায় আর তুমি আমার কাছে ক্ষমা চাও, তাহলে আমি তোমাকে ক্ষমা করে দেব। হে আদম সন্তান! যদি তুমি পৃথিবী পরিমাণ গোনাহ নিয়ে আমার কাছে আস এবং আমার সঙ্গে কোন কিছুকে শরীক না করে (আখেরাতে) সাক্ষাত কর, তাহলে আমি সমপরিমাণ ক্ষমা নিয়ে তোমার সঙ্গে সাক্ষাত করবো। তিরমিযী এ হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

বিষয়ভিত্তিক হাদীস: ২৮

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: "مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ، وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْت سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ." رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত , তিনি বলেন- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: যে ব্যক্তি আমার কোন বন্ধুর সঙ্গে শত্রুতা করে, আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করছি। আমি তার উপর যা ফরয করেছি আমার বান্দাহ তা ব্যতীত অন্য কোন পছন্দসই জিনিসের দ্বারা আমার অধিক নিকটবর্তী হতে পারে না। আর আমার বান্দাহ নফলের সাহায্যে আমার নিকটবর্তী হতে থাকে, এমনকি আমি তাকে ভালবাসতে থাকি। সুতরাং আমি যখন তাকে ভালবাসতে থাকি, তখন আমি তার কান হয়ে যাই; যা দ্বারা সে শোনে, তার চোখ হয়ে যাই; যার দ্বারা সে দেখে, তার হাত হয়ে যাই; যার দ্বারা সে ধরে এবং তার পা হয়ে যাই; যার দ্বারা সে চলে। সে যদি আমার কাছে কিছু চায় আমি অবশ্যই তাকে তা দেই। সে যদি আমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে, আমি তাকে অবশ্যই আশ্রয় দান করি। বুখারী

www.pathagar.com

বিষয়ভিত্তিক হাদীস: ২৯

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. " رَوَاهُ مُسْلِمٌ

আবূ সাঈদ খুদরী (রা:) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:"তোমাদের মধ্যে কেউ কোন অন্যায় দেখলে তা সে তার হাত দ্বারা প্রতিহত করবে, যদি তা সম্ভব না হয় তবে মুখ দ্বারা প্রতিহত করবে, তাও যদি না করতে পারে তাহলে অন্তর দিয়ে তা ঘৃণা করবে। আর এ হচ্ছে (অন্তর দিয়ে প্রতিহত করা) দুর্বলতম ঈমান"। মুসলিম

বিষয়ভিত্তিক হাদীস: ৩০

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ، قَالَ: "لَقَدْ سَأَلْتَ عَنْ عَظِيمٍ، وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ: تَعْبُدُ اللَّهَ لَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ، وَتَحُجُّ الْبَيْتَ، ثُمَّ قَالَ: أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى أَبْوَابِ الْخَيْرِ؟ الصَّوْمُ جُنَّةٌ، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ، وَصَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، ثُمَّ تَلَا: " تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ " حَتَّى بَلَغَ "يَعْمَلُونَ"، ثُمَّ قَالَ: أَلَا أُخْبِرُكَ بِرَأْسِ الْأَمْرِ وَعَمُودِهِ وَذِرْوَةِ سَنَامِهِ؟ قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ، وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ، وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ، ثُمَّ قَالَ: أَلَا أُخْبِرُكَ بِمَلَاكِ ذَلِكَ كُلِّهِ؟ فَقُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ وَقَالَ: كُفَّ عَلَيْكَ هَذَا. قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ؟ فَقَالَ: ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ عَلَى وُجُوهِهِمْ -أَوْ قَالَ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ- إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ؟ . "!رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

মু'আয ইবন জাবাল (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন,আমি নিবেদন করি: হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন কাজ বলুন যা আমাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে সরিয়ে দেবে। তিনি বললেন: তুমি এক বৃহৎ বিষয়ে প্রশ্ন করেছ। এটা তার জন্য খুবই সহজ আল্লাহ যার জন্য সহজ করে দেন। তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, তাঁর সঙ্গে কাউকে শরীক করো না, নামায প্রতিষ্ঠা কর, যাকাত দাও, রমযানের রোযা রাখ এবং (কা'বা) ঘরে হজ্জ কর।

www.pathagar.com

তারপর তিনি বলেন: আমি কি তোমাদের কল্যাণের দরজা দেখাব না? রোযা হচ্ছে ঢাল-স্বরূপ, সাদকাহ্ গোনাহকে নিঃশেষ করে দেয়, যেমন পানি আগুনকে নিভিয়ে দেয়; আর কোন ব্যক্তির গভীর রাতের নামায।

তারপর তিনি পড়েন: تتجافي جنوبهم عن المضاجع হতে يعلمون পর্যন্ত। যার অর্থ হলো: তারা শয্যা পরিত্যাগ করে তাদের রবকে ভয়ে ও আশায় ডাকে এবং আমরা তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে। তাদের কর্মের জন্য যে চক্ষু শীতলকারী প্রতিফল রক্ষিত আছে তা তাদের কেউই জানে না। [সূরা আসাজদাহ৬-১৭]

তিনি আবার বলেন: আমি তোমাদের কর্মের মূল এবং তার স্তম্ভ ও তার সর্বোচ্চ চূড়া বলবো কি? আমি নিবেদন করি: হে আল্লাহর রাসূল! অবশ্যই বলুন। তিনি বললেন: কর্মের মূল হচ্ছে ইসলাম, তার স্তম্ভ হচ্ছে নামায এবং তার সর্বোচ্চ চূড়া হচ্ছে জিহাদ। তারপর তিনি বলেন: আমি কি তোমাকে এসব কিছু আয়ত্তে রাখার জিনিস বলবো না? আমি নিবেদন করি: হে আল্লাহর রাসূল! অবশ্যই বলুন। তিনি নিজের জিভ ধরে বললেন: এটাকে সংযত কর।

আমি জিজ্ঞেস করি: হে আল্লাহর নবী! আমরা যা বলি তার হিসাব হবে কি? তিনি বললেন: তোমার মা তোমাকে হারিয়ে ফেলুক, হে মু'আয! জিভের উৎপন্ন ফসল ব্যতীত আর কিছু এমন আছে কি যা মানুষকে মুখ থুবড়ে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করে? তিরমিযী, এবং তিনি বলেছেন: এটা হাসান ও সহীহ হাদীস।

www.pathagar.com

নির্বাচিত
আল-হাদীস মুখস্থকরণ

www.pathagar.com

আল-হাদীস মুখস্থকরণ

মুখস্থকরণ: প্রথম হাদীস

১-৯ রামাদান

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَيْضًا قَالَ " بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ذَاتَ يَوْمٍ، إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ، شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْرِ، لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ، وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ. حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم . فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخْذَيْهِ، وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي عَنْ الإِسْلَامِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم الإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنْ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. قَالَ: صَدَقْتَ . فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ! قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنْ الإِيمَانِ. قَالَ: أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ. قَالَ: صَدَقْتَ. قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنْ الإِحْسَانِ. قَالَ: أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنْ السَّاعَةِ. قَالَ: مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنْ السَّائِلِ. قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا؟ قَالَ: أَنْ تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا، وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ. ثُمَّ انْطَلَقَ، فَلَبِثْنَا مَلِيًّا، ثُمَّ قَالَ: يَا عُمَرُ أَتَدْرِي مَنْ السَّائِلُ؟. قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ

উমার (রা:) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বসেছিলাম, এমন সময় হঠাৎ এক ব্যক্তি আমাদের সামনে উপস্থিত হয়, যার কাপড় ছিল ধবধবে সাদা, চুল ছিল ভীষণ কালো; তার মাঝে ভ্রমণের কোন লক্ষণ পরিলক্ষিত হচ্ছিল না। আমাদের মধ্যে কেউ তাকে চিনতে পারেনি। সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে গিয়ে বসে, নিজের হাঁটু তার হাঁটুর সঙ্গে মিলিয়ে নিজের হাত তার উরুতে রেখে বললেন: "হে মুহাম্মাদ, আমাকে ইসলাম সম্পর্কে বলুন"।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: "ইসলাম হচ্ছে এই- তুমি সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন সত্য ইলাহ্ নেই এবং মুহাম্মাদ (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূল, সালাত প্রতিষ্ঠা কর, যাকাত আদায় কর, রামাদানে সওম সাধনা কর এবং যদি সামর্থ থাকে তবে (আল্লাহর) ঘরের হজ্জ কর।"

www.pathagar.com

তিনি (লোকটি) বললেন: "আপনি ঠিক বলেছেন"। আমরা বিস্মিত হলাম, সে নিজে তার নিকট জিজ্ঞাসা করেছে আবার নিজেই তার জবাবকে ঠিক বলে ঘোষণা করছে। এরপর বলল: "আচ্ছা, আমাকে ঈমান সম্পর্কে বলুন"।

তিনি (রাসূল) বললেন: "তা হচ্ছে এই- আল্লাহর ফিরিশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ ও আখেরাতর উপর ঈমান আনা এবং তাকদীরের ভাল-মন্দের উপর ঈমান আনা"।

সে (আগন্তুক) বলল: "আপনি ঠিক বলেছেন"। তারপর বলল: "আমাকে ইহসান সম্পর্কে বলুন"।

তিনি বলেন: "তা হচ্ছে এই- তুমি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদাত কর যেন তুমি আল্লাহকে দেখতে পাচ্ছ, আর তুমি যদি তাঁকে দেখতে না ও পাও তবে তিনি তোমাকে দেখছেন"।

সে (আগন্তুক) বলল: "আমাকে কেয়ামত সম্পর্কে বলুন"। তিনি (রাসূল) বললেন: "যাকে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে সে জিজ্ঞাসাকারী অপেক্ষা বেশী কিছু জানে না"। সে (আগন্তুক) বলল: "আচ্ছা, তার লক্ষণ সম্পর্কে বলুন"।

তিনি (রাসূল) বললেন: "তা হচ্ছে এই- দাসী নিজের মালিককে জন্ম দেবে, সম্পদ ও বস্ত্রহীন রাখালগণ উঁচু উঁচু প্রাসাদ তৈরি করে দম্ভ করবে"।

তারপর ঐ ব্যক্তি চলে যায়, আর আমি আরো কিছুক্ষণ বসে থাকি। তখন তিনি (রাসূল) আমাকে বললেন: "হে উমর, প্রশ্নকারী কে ছিলেন, তুমি কি জান? আমি বললাম: "আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অধিক ভাল জানেন"। তিনি বললেন: "তিনি হলেন জিবরীল। তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন শিক্ষা দিতে তোমাদের কাছে এসেছিলেন"। [সহীহ মুসলিম]

www.pathagar.com

মুখস্থকরণ: দ্বিতীয় হাদীস

১০-১৪ রামাদান

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ، وَيَتَدَارَسُونَهُ فِيمَا بَيْنَهُمْ؛ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ، وَمَنْ أَبْطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ." رَوَاهُ مُسْلِمٌ بهذا اللفظ.

আবু হুরায়রা (রা:) হতে বর্ণিত হয়েছে- নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি দুনিয়াতে কোন মুমিনের দুঃখ দূর করে দেয়, আল্লাহ কেয়ামতের দিন তার দুঃখ দূর করে দিবেন। যে ব্যক্তি কোন বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির বিপদ দূর করে দেয়, আল্লাহ দুনিয়াতে ও আখেরাতে তার বিপদ দূর করে দিবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবে, আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে তার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবেন। যে বান্দা তার কোন ভাইকে সাহায্য করবে, আল্লাহ সে বান্দাকে সাহায্য করবেন। যে ব্যক্তি জ্ঞান লাভের জন্য কোন রাস্তা গ্রহণ করে, তার অসীলায় আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের রাস্তা সহজ করে দিবেন। যেসব লোক আল্লাহর ঘরসমূহের মধ্যে কোন ঘরে (অর্থাৎ মসজিদে) সমবেত হবে, কুরআন পড়বে, সকলে মিলিত হয়ে তার শিক্ষা নেবে ও দেবে, তাদের উপর অবশ্যই প্রশান্তি অবতীর্ণ হবে, রহমত তাদের ঢেকে নেবে, ফিরিশতাগণ তাদের ঘিরে থাকবে আর আল্লাহ তাদের কথা এমন সকলের মধ্যে উল্লেখ করবেন যারা তাঁর কাছে উপস্থিত। যে ব্যক্তি তার আমলের কারণে পিছিয়ে পড়বে, তার বংশ পরিচয় তাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না। মুসলিম

www.pathagar.com

মুখস্থকরণ: তৃতীয় হাদীস

১৫-১৯ রামাদান

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ: "مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. " رَوَاهُ مُسْلِمٌ

আবূ সাঈদ খুদরী (রা:) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "তোমাদের মধ্যে কেউ কোন অন্যায় দেখলে তা সে তার হাত দ্বারা প্রতিহত করবে, যদি তা সম্ভব না হয় তবে মুখ দ্বারা প্রতিহত করবে, তাও যদি না করতে পারে তাহলে অন্তর দিয়ে তা ঘৃণা করবে। আর এ হচ্ছে (অন্তর দিয়ে প্রতিহত করা) দুর্বলতম ঈমান"। মুসলিম

মুখস্থকরণ: চতুর্থ হাদীস

২০-২৪ রামাদান

عَنْ أَبِي الْعَبَّاس سَهْلِ بْن سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ! دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ أَحَبَّنِي اللَّهُ وَأَحَبَّنِي النَّاسُ؛ فَقَالَ: "ازْهَدْ فِي الدُّنْيَا يُحِبُّكَ اللَّهُ، وَازْهَدْ فِيمَا عِنْدَ النَّاسِ يُحِبُّكَ النَّاسُ. "

[حديث حسن، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَغَيْرُهُ بِأَسَانِيدَ حَسَنَةٍ]

আবুল আব্বাস সাহল ইবন সা'দ আস-সা'ঈদী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: "এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে বলল: হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন কাজ বলুন যা করলে আল্লাহ আমাকে ভালবাসেন, লোকেরাও আমাকে ভালবাসে। তখন তিনি বললেন: দুনিয়ার প্রতি অনুরাগী হবে না, তাহলে আল্লাহ তোমাকে ভালবাসবেন; আর মানুষের কাছে যা আছে তার ব্যাপারে আগ্রহী হবে না, তাহলে মানুষও তোমাকে ভালবাসবে"। [ইবনে মাজাহ]

www.pathagar.com

মুখস্থকরণ: পঞ্চম হাদীস

২৫-২৯ রামাদান

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ. أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ , وَمُسْلِمٌ .

আবু আব্দিল্লাহ আন নু'মান ইবনে বাশীর (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন- আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: নিঃসন্দেহে হালাল সুস্পষ্ট এবং হারামও সুস্পষ্ট, আর এ দু'য়ের মধ্যে কিছু সন্দেহজনক বিষয় আছে যা অনেকে জানে না। অতএব, যে ব্যক্তি সন্দিহান বিষয় হতে নিজেকে রক্ষা করেছে; সে নিজের দ্বীনকে পবিত্র করেছে এবং নিজের সম্মানকেও রক্ষা করেছে। আর যে ব্যক্তি সন্দেহযুক্ত বিষয়ে পতিত হয়েছে; সে হারামে পতিত হয়েছে। তার অবস্থা সেই রাখালের মত, যে নিষিদ্ধ চারণভূমির চারপাশে (গবাদি পশু) চরায়, আর সর্বদা এ আশংকায় থাকে যে, যেকোন সময় কোন পশু তার মধ্যে প্রবেশ করে চরতে আরম্ভ করবে।

সাবধান! প্রত্যেক রাজা-বাদশাহর একটি সংরক্ষিত এলাকা আছে। আর আল্লাহর সংরক্ষিত এলাকা হচ্ছে তাঁর হারামকৃত বিষয়াদি। সাবধান! নিশ্চয়ই শরীরের মধ্যে একটি মাংসপিন্ড আছে; যখন তা ঠিক থাকে তখন সমস্ত শরীর ঠিক থাকে, আর যখন তা নষ্ট হয়ে যায় তখন গোটাদেহ নষ্ট হয়ে যায় -এটা হচ্ছে ক্বালব (হৃদপিন্ড)। [বুখারী ও মুসলিম]

www.pathagar.com

দারসুল হাদীস
আরশের নীচে ছায়া সংক্রান্ত

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِى ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ الإِمَامُ الْعَادِلُ وَشَابٌّ نَشَأَ بِعِبَادَةِ اللَّهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِى الْمَسَاجِدِ وَرَجُلاَنِ تَحَابَّا فِى اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّى أَخَافُ اللَّهَ. وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لاَ تَعْلَمَ يَمِينُهُ مَا تُنْفِقُ شِمَالُهُ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ رواه مسلم ، باب: فضل إخفاء الصدقة ، الجزء الثالث.

হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সা) বলেছেন সাত প্রকার লোককে আল্লাহ তা'আলা (কিয়ামতের দিন) তার আরশের ছায়ায় স্থান দান করবেন। সেদিন আরশের ছায়া ছাড়া আর অন্য কোন ছায়া থাকবে না।

১.ন্যায় পরায়ণ নেতা ২. ঐ যুবক যে তার যৌবনকাল আল্লাহর ইবাদতে কাটিয়েছে ৩. এমন (মুসলিম) ব্যক্তি যার অন্ত:করণ মসজিদের সাথে ঝুলানো থাকে, একবার মসজিদ থেকে বের হলে পূনরায় ফিরে না আসা পর্যন্ত ব্যাকুল থাকে ৪.এমন দু'ব্যক্তি যারা কেবল মাত্র আল্লাহর ভালভাসায় পরস্পর মিলিত হয় এবং পৃথক হয় ৫. যে ব্যক্তি নির্জনে আল্লাহর ভয়ে চোখের পানি ফেলে ৬. যে ব্যক্তিকে কোন সম্ভ্রান্ত বংশের সুন্দরী রমণী ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার আহবান জানায় আর ঐ ব্যক্তি শুধু আল্লাহর ভয়েই তা থেকে বিরত থাকে এবং ৭. যে ব্যক্তি এত গোপনে দান করে যে তার ডান হাত কি দান করলো বাম হাতও তা জানেনা। মুসলিম

রা'বীর পরিচয়

'হযরত আবু হুরায়রা (রা:)' এ বিখ্যাত সাহাবীর নাম নিয়ে মতভেদ রয়েছে। এমনকি তাঁর নাম ৬০টি পর্যন্ত উল্লিখিত হয়েছে। তবে ইসলামের পূর্বনাম ছিল আবদু শামস্, আবদু ওমর। আর ইসলাম পরবর্তী আব্দুর রহমান ইবনে শাখর ইবনে উমায়ের ইবনে আমির। তবে আবু হুরায়রা নামে খ্যাতি অর্জন করেন।

৬২৯ খৃষ্টাব্দ মোতাবেক ৭ম হিজরী হুদাবিয়ার সন্ধি এবং খায়বার যুদ্ধের অর্ন্তবর্তী সময় মদীনায় ইসলাম গ্রহন করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল ৩০ এর মত। তিনি প্রখ্যাত সাহাবী তোফায়েল ইবনে আমর আদ-দাউসীর হাতে ইসলাম গ্রহন করেন। তিনি আসহাবুস সুফ্ফার অর্ন্তভুক্ত ছিলেন।

তাঁর বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা - ৫৩৭৫ টি, মুত্তাফাকুন আলাইহে - ৩২৫টি, বুখারীতে ৭৯ টি, মুসলিম -৭৩ টি।

www.pathagar.com

তাঁর থেকে আটশত রাবী হাদিস বর্ণনা করেছেন। হযরত ওমর রা. তাঁকে বাহরাইন প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন।
৭৮ বছর বয়সে তিনি মদিনায় ইন্তেকাল করেন। মতান্তরে ৫৯ হিজরীতে। ওয়ালিদ ইবনে ওকবা তার জানাযায় ইমামতি করেন। তিনি জান্নাতুল বাকীতে সমাহিত হন।

হাদিসের গুরুত্ব:

হাদিসটি বিখ্যাত রাবী হযরত আবু হুরায়রা রা. এর থেকে বর্ণিত। অপর দিকে সীহাহ সিত্তার অন্তর্ভুক্ত বুখারী ও মুসলিম শরীফ থেকে সংকলিত।
পরকালে কঠিন জবাবদিহির দিনে যখন আল্লাহর আরশের ছায়া ব্যতিত আর কোন ছায়া থাকবেনা, তখন যারা আরশের ছায়া পাবেন তাঁদের পরিচয় আলোচ্য হাদীসে জানিয়ে দিয়েছেন।

১ম: ন্যায় পরায়ণ নেতা এর ব্যাখ্যাঃ

এখানে সর্বস্তরের দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে। চাই পরিবারের, সমাজ, রাষ্ট্র অথবা কোন দলের নেতাই হোক না কেন। তাকে ন্যায়-ইনসাফের সাথেই নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব করতে হবে। কেননা এ কর্তৃত্ব সম্পর্কেও আল্লাহ রাব্বুল আলামীন জিজ্ঞাসা করবেন। এ প্রসঙ্গে রাসূলের বাণী:সাবধান! তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব সম্পর্কেই জিজ্ঞাসা করা হবে"।

উত্তম নেতার (দায়িত্বশীলের) গুনাবলী :

يقول خياركم أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونهم و يصلون عليهم و يصلون عليكم و شرار أئمتكم الذين تبغضونهم و يبغضونهم

অর্থাৎ তোমাদের ঐ নেতারাই উত্তম, যাদেরকে তোমরা ভালবাস এবং তারাও তোমাদেরকে ভালবাসেন, তোমরা তাদের জন্য দোয়া কর আর তারাও তোমাদের জন্য দোয়া করে। আর তোমাদের ঐসব নেতারাই নিকৃষ্ট, যাদের প্রতি তোমরা বিক্ষুব্ধ এবং তারাও তোমাদের উপর বিক্ষুব্ধ।

দায়িত্বশীলদের সর্বাধিক কল্যণকামিতা:

عن معقل بن يسار قال سمعت رسول الله صلي الله عليه و سلم يقول أيما وال من أمر المسلمين شيأ فلم ينصح لهم و لم يجحد لهم لنصحه و جهده لنفسه كبه الله على جهده فى النار-

অর্থাৎ হজরত মা'কাল বিন ইয়াসির রা. বলেন, আমি শুনেছি, রাসূল স. বলেছেন: যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের কোন বিষয়ের দায়িত্বশীল হল- কিন্তু পরে সে তাদের কল্যাণ

www.pathagar.com

কামনায় এতটুকুও কাজ করলনা, যা সে নিজেন জন্যে করে থাকে। আল্লাহ তাকে উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।

উত্তম নেতা নেয়ামাত:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ " : إِذَا كَانَ أُمَرَاؤُكُمْ خِيَارَكُمْ وَأَغْنِيَاؤُكُمْ سُمَحَاءَكُمْ , وَكَانَتْ أُمُورُكُمْ شُورَى بَيْنَكُمْ فَظَهْرُ الأَرْضِ خَيْرٌ مِنْ بَطْنِهَا , وَإِذَا كَانَتْ أُمَرَاؤُكُمْ شِرَارَكُمْ , وَأَغْنِيَاؤُكُمْ بُخَلاءَكُمْ , وَأُمُورُكُمْ إِلَى نِسَائِكُمْ فَبَطْنُ الأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ ظَهْرِهَا. "

হযরত আবু হুরায়রা রা: থেকে বর্নিত, তিনি বলেন- রাসূল স: বলেছেন- যখন তোমাদের শাসকগন (চরিত্রের দিক থেকে) উত্তম হবে, তোমাদের সম্পদশালীগণ দানশীল হবে এবং তোমাদের সামগ্রীক বিষয়াদি পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সম্পন্ন হবে- তখন তোমাদের জন্য পৃথিবীর উপরিভাগ (জীবন) আভ্যন্তরীন ভাগ (মৃত্যু) অপেক্ষা কল্যাণকর হবে। আর যখন তোমাদের শাসকগণ নিকৃষ্ট, তোমাদের ধনাঢ্য শ্রেণী হবে বখিল এবং তোমাদের বিষয়াদির দায়িত্ব অর্পিত হবে নারীর উপর তখন পৃথিবীর আভ্যন্তরীন (মৃত্যু) উপরিভাগ (জীবন) অপেক্ষা কল্যাণকর হবে। (তিরমিজি থেকে মিশকাত)

তাই সকল পর্যায়ে নেতৃত্বের জন্য চাই ইনসাফ কায়েম করা। ইনসাফভিত্তিক নেতৃত্ব কায়েম না করলে অধীনস্থদের মাঝে সৃষ্টি হবে ভূল বুঝাবুঝি। নেতৃত্বের প্রতি অনীহা ও আনুগত্যহীনতার কারণে সমাজ বিশৃঙ্খলা ও ধ্বংসের দিকে চলে যায়। নেতৃত্ব বিপর্যয় সৃষ্টিকারীকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন না।

এ প্রসঙ্গে রাসূল (সা) বলেন: যে ব্যক্তি মুসলমানের যাবতীয় ব্যাপারে দায়িত্বশীল হওয়ার পর তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে আল্লাহ তার জন্য বেহেশত হারাম করে দিবেন।

বুখারী ও মুসলিম।

২য়: যে যুবক তার যৌবনকাল আল্লাহর ইবাদতে কাটিয়েছে এর ব্যাখ্যা:

যৌবনকাল মানুষের কর্মস্পৃহা ও কর্ম চাঞ্চল্যের সময়। হাদীসে বার্ধক্যের পূর্বে যৌবনকে গুরুত্ব দেয়ার কথা বলা হয়েছে। কেননা যৌবনকালই হচ্ছে মানুষের কর্মশক্তির একমাত্র উৎকৃষ্ট সময়। যৌবনে যা করা যায় বার্ধক্যে তা করা যায় না। যৌবনকালে মানুষের শক্তি-সাহস বেশী থাকে। তখন সে আল্লাহর পথে জীবন উৎসর্গ করতেও দ্বিধা করে না। আল্লাহর সকল হুকুম পালন ও ইবাদতে ক্লান্ত হয় না। পক্ষান্তরে বার্ধক্যে ভগ্ন স্বাস্থ্য নিয়ে ইবাদতের হক আদায় করে তা পালন করা যায় না। যৌবনকালেই মানুষ ভাঙ্গতে পারে গড়তে পারে। ইসলামের প্রথম যুগে আল্লাহর নবীর সাথে যারা দ্বীন কায়েমের আন্দোলনে শামিল হয়েছেন তারা অধিকাংশ ছিলেন যুবক। তারাই দ্বীনের পতাকা নিয়ে

www.pathagar.com

সামনে অগ্রসর হয়েছেন বেশী। তারা পৃথিবীর দিকে দিকে ইসলামের পতাকা উড্ডীন করে ইতিহাস সৃষ্টি করে গিয়েছেন। এসবই তাদের যৌবনের ফসল। কাজেই আমাদেরকে বার্ধক্য আসার আগে যৌবনের গুরুত্ব দিতে হবে। যৌবনের সমস্ত শক্তি সামর্থ্য আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে নিয়োজিত করতে হবে। যে কোন বিপ্লবএকমাত্র যুবক শ্রেণীর দ্বারাই সংগঠিত হতে পারে। আর বার্ধক্য আসার পূর্বেই আলাহর ইবাদতে বেশী মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন। কেননা ঐ যুবক যে তার যৌবনকাল আল্লাহর ইবাদতে কাটিয়েছে, সে আল্লাহর আরশের ছায়ায় স্থান লাভ করবে।

৩য়: এমন মুসলিম যার অন্তকরণ মসজিদের সাথে থাকে এর ব্যাখ্যা:

এমন (মুসলিম) ব্যক্তি যার অন্ত:করণ মসজিদের সাথে ঝুলানো থাকে, একবার মসজিদ থেকে বের হলে পূনরায় প্রত্যার্বতন না করা পর্যন্ত ব্যাকুল থাকে। দৈনিক পাঁচবার নামাযের ওয়াক্ত মুসল্লীদের সামনে ঘুরে আসে। যারা নিয়মিতভাবে নামায আদায় করেন তারা দুনিয়ার সকল কাজকর্ম করার মধ্যেও নামাযের জন মন ব্যাকুল থাকে; কখন আর এক ওয়াক্ত নামাযের সময় হবে এবং সে নামায আদায় করতে মসজিদে হাজির হবেন। যা মূলত ঃ তার অন্তর মসজিদের সাথে ঝুলন্ত থাকার মতোই।

৪র্থ: এমন দু'ব্যক্তি যারা কেবল মাত্র আল্লাহর ভালভাসায় পরস্পর মিলিত হয় এবং পৃথক হয় এর ব্যাখ্যা

পরস্পর মিলিত হওয়া ও পৃথক হওয়াঃ মুসলমানদের প্রত্যেকটি কাজ আল্লাহর উদ্দেশ্যে এবং ঈমানের প্রতি পরিপূর্ণতার জন্যই হওয়া উচিত। তাই যে ব্যক্তি কোন কিছুকে ভালবাসবে আল্লাহর জন্য, কেবল তখনই সে ব্যক্তি তার ঈমানকে পরিপূর্ণ করতে পারবে। তাই এমন দু'ব্যক্তি যারা কেবল মাত্র আল্লাহর মহব্বতে পরস্পর মিলিত হয় এবং পৃথক হয় তাও আল্লাহকে সন্তুষ্টির জন্য, কেবল তারাই ঈমানকে পরিপূর্ণ করে নিতে পারে। আবু দাউদ

আল্লাহর দ্বীনের কারণেই ভাইদেরকে মহব্বত করা ও যারা কুফরিতে লিপ্ত যাদেরকে শত চেষ্টা করেও দ্বীনের পথে আনা যায় না তাদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করা প্রয়োজন।

৫ম: যে ব্যক্তি নির্জনে আল্লাহর ভয়ে চোখের পানি ফেলে এর ব্যাখ্যা

আল্লাহর ভয়ে চোখের পানি ফেলা: যে ব্যক্তি নির্জনে আল্লাহর ভয়ে চোখের পানি ফেলে আরশের নীচে ছায়া দেয়ার কথা এ হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। দু'কারণে চোখের অশ্রু ফেলে।

www.pathagar.com

প্রথমত: আল্লাহর আজমত-জালালাত বা শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্বের জন্য।
দ্বিতীয়ত: নিজের অপরাধ তথা মুক্তির জন্য।
একথা চিন্তা করা যে আল্লাহ তা'আলা আমাকে আশ্রাফুল মাখলুকাত (সৃষ্টির সেরা জীব) হিসেবে সৃষ্টি করেছেন, যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ। তার হুকুম আহকাম মেনে চলা আমার একান্ত কর্তব্য। তা না হলে পরকালে আমাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে। পরাক্রমশালী আল্লাহর ভয়ে ভীত হয়ে যে ব্যক্তি নির্জনে চোখের অশ্রু ফেলে তাকে আল্লাহ আরশের ছায়ায় স্থান দান করবেন।
জাহান্নাম থেকে রক্ষা করবেন। রাসূল (সা) বলেন ঃ
যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে অশ্রুপাত করেছে তার জাহান্নামে প্রবেশ করা তেমনি অসম্ভব যেমন অসম্ভব দোহন করা দুধকে ওলানে প্রবেশ করানো। যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে তার পথে জিহাদ করেছে সে ব্যক্তি আর জাহান্নামের ধোঁয়া একত্র হবে না। (তিরমিযী)
অপর এক হাদীসে জানা যায়, দু'ধরনের চক্ষুকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করতে পারবে না।
১। যে চক্ষু আল্লাহর ভয়ে অশ্রু ঝরায়,
২। ঐ চক্ষু যা আল্লাহর পথে রাত জেগে পাহারা দেয়। (বুখারী)

৬ষ্ঠ : চরিত্রের হিফাযত এর ব্যাখ্যা

যৌবনকালে নারী-পুরুষ পরস্পর সান্নিধ্য চায়। আল্লাহ এর বৈধ পন্থা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন বড় অপরাধ। এমতাবস্থায় কোন সম্ভ্রান্ত বংশের সুন্দরী রমণী যদি কোন পুরুষকে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার আহ্বান জানায় আর এ মুহূর্তে ঐ ব্যক্তি শুধু আল্লাহর ভয়েই বিরত থাকে এবং নিজের চরিত্রের হিফাযত করে তবেই সে আল্লাহর আরশের ছায়ায় স্থান লাভ করতে পারবে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

অর্থাৎ আর তোমরা ব্যভিচারের কাছেও যেয়ো না। নিশ্চয়ই এটা অশালীন কাজ এবং অসৎ পন্থা। সূরা বনী ইসরাঈল-৩২

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

অর্থাৎ লজ্জাহীনতার যত পন্থা আছে তার নিকটেও যেয়োনা, তা প্রকাশ্যে হোক অথবা গোপনে হোক। সূরা আল-আনআম: ১৫২
আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বিবাহের বৈধ পন্থা রেখেছেন। শুধুমাত্র আল্লাহর ভয় ও পরকালের জবাবদিহিতাই মানুষের চরিত্রকে হিফাযত করতে পারে। আল্লাহ বলেন:

www.pathagar.com

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ

অর্থাৎ এবং যারা নিজেদের যৌনাঙ্গকে সংযত রাখে। তবে তাদের স্ত্রী ও মালিকানাভুক্ত দাসীদের ক্ষেত্রে সংযম না হলে তারা তিরস্কৃত হবে না। সূরা আল-মুমিনুন : ৫-৬

৭ম : গোপনে দান করা এর ব্যাখ্যা

দান করতে আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন:

وَأَنفِقُوا مِن مَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ

অর্থাৎ আমি তোমাদেরকে যে রিযিক দান করেছি তা থেকে খরচ করো মৃত্যু আসার আগেই। সূরা আল- মুনাফিকূন: ১০

لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

অর্থাৎ তোমরা কিছুতেই প্রকৃত কল্যাণ লাভ করতে পারবে না যে পর্যন্ত তোমাদের প্রিয় বস্তুগুলোকে আল্লাহর পথে ব্যয় না করবে। সূরা আলে- ইমরান: ৯২

আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই দান করতে হবে। আর তা হতে হবে গোপনে যাতে দানকারীর মধ্যে লোক দেখানো কোন মনোভাব সৃষ্টি না হয়। অপর এক হাদীসে জানা যায় রাসূল (সা) বলেছেন: "আল্লাহ তোমাদের সৌন্দর্য ও সম্পদের দিকে লক্ষ্য করেন না, বরং তোমাদের অন্ত:করণ ও কাজের দিকে লক্ষ্য করেন"। মুসলিম

অতএব দান করতে হবে এত গোপনে যে, দানকারীর ডান হাত কি দান করলো তা বাম হাতও যেন তা না জানে। তাহলেই কেবল পূর্ণ সওয়াব পাওয়া যাবে। আল্লাহর আরশের ছায়াতে স্থান লাভ করা যাবে।

হাদীসের শিক্ষা:

১. নেতৃত্ব দান করতে হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও তাঁর রাসূলের পদাংক অনুসারে।

২. যৌবনের শক্তি সামর্থ দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে নিয়োজিত রাখতে হবে।

৩. সামাজিকভাবে নামাযকে কায়েম করতে হবে ও নামাযের পূর্ণ পাবন্দ হতে হবে।

৪. মানুষের সাথে ভালবাসা ও শত্রুতার ভিত্তি হবে কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি।

৫. অপরাধের জন্যে আল্লাহর নিকট অশ্রু ফেলে ক্ষমা চাইতে হবে।

৬. পরিপূর্ণভাবে পর্দা প্রথা চালু ও অনুসরণ করতে হবে।

৭. নিজের সম্পদ থেকে গোপন ও নিঃস্বার্থভাবে আল্লাহর পথে দান করতে হবে।

www.pathagar.com

রামাদান পরিকল্পনা-২০১১

ক্রম	বিবরণ	পরিমান/ সংখ্যা / নাম
১.	আল-কুরআন তেলাওয়াত	প্রতিদিন ১পারা
২.	ব্যাখ্যাসহ অধ্যয়ন	৩০ টি নির্ধারিত বিষয়
৩.	অর্থসহ মুখস্থকরণ	১০টি বিষয় ভিত্তিক নির্ধারিত অংশ
৪.	দারসুল কুরআন তৈরী	বিষয়:সূরা বাকারা ১৮৩-১৮৫
৫.	আল-হাদীস অধ্যয়ন	৩০টি নির্ধারিত হাদীস
৬.	আল-হাদীস মুখস্থকরণ	১০টি নির্ধারিত হাদীস
৭.	দারসুল হাদীস তৈরী	আরশের নীচে ছায়া সংক্রান্ত
৮.	সাহিত্য অধ্যয়ন (গড় পৃষ্ঠা)	ইসলামের বুনিয়াদী শিক্ষা
৯.	সাহিত্যের নোট তৈরী	ইসলামের বুনিয়াদী শিক্ষা
১০.	অন্যান্য সাহিত্যের নাম	
১১.	সালাত- জামা'য়াত	সকল ওয়াক্ত জামায়াতের সাথে
১২.	তারাবীহ আদায়	প্রতি দিন জামায়াতের সাথে
১৩.	তাহাজ্জুদ আদায়	নিয়মিত
১৪.	ব্যক্তিগত উদ্যোগে সাহরী খাওয়ানো হবে	সাধ্যমত কত জন-
১৫.	ইফতার খাওয়ানো হবে	সাধ্যমত কত জন-
১৬.	যাকাত দানে উৎসাহিত করা হবে	৫ জনকে উৎসাহিত করণ
১৭.	ফিতরা দেয়া হবে	পরিবারের সবার ফিতরা প্রদান
১৮.	ঈদের পোষাক দেয়া হবে ২. ৩.	কমপক্ষে ৫ জন। ১. ৪. ৫.
১৯.	নিয়মিত মুসল্লি তৈরী করা হবে ২. ৩.	কমপক্ষে ৫ জন। ১. ৪. ৫.
২০.	ইসলামের প্রতি দাওয়াত দেয়া হবে ২. ৩.	কমপক্ষে ৫ জন। ১. ৪. ৫.
২১.	ইসলামী প্রোগ্রামে অংশ নেয়া হবে ২. ৩.	কমপক্ষে ৫ টি । ১. ৪. ৫.
২২.	ওয়ামী প্রকাশিত বই বিক্রি করা হবে	কমপক্ষে ৫ টি
২৩.	ওয়ামী প্রকাশিত ক্যাসেট বিক্রি করা হবে	কমপক্ষে ২ টি

www.pathagar.com

রামাদান রির্পোট-২০১১

প্রথম অংশ:

তারিখ	আল-কুরআন			আল-হাদীস		সাহিত্য	সালাত		
	তেলাওয়াত	অধ্যয়ন	মুখস্থ	অধ্যয়ন	মুখস্থ	অধ্যয়ন	ফরজ	তারাবীহ	তাহাজ্জুদ
মোট									

www.pathagar.com

রামাদান রির্পোট-২০১১

দ্বিতীয় অংশ:

তারিখ	সাহরীতে অংশগ্রহণ করানো	ইফতারে অংশগ্রহণ করানো	ঈদে পোষাক দিয়েছেন	নিয়মিত মুসল্লি বানিয়েছেন	ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন	প্রোগ্রামে অংশ নিয়েছেন	বিক্রি বই/ ক্যাসেট
১.							
২.							
৩.							
৪.							
৫.							
৬.							
৭.							
৮.							
৯.							
১০.							
১১.							
১২.							
১৩.							
১৪.							
১৫.							
১৬.							
১৭.							
১৮.							
১৯.							
২০.							
২১.							
২২.							
২৩.							
২৪.							
২৫.							
২৬.							
২৭.							
২৮.							
২৯.							
৩০.							
মোট							

www.pathagar.com

ক্রম	বিবরণ	কতটি	ক্রম	বিবরণ	কতজন
১.	দারসুল কুরআন তৈরী হয়েছে		৪	যাকাত দানে উৎসাহিত করেছেন	
২.	দারসুল হাদিস তৈরী হয়েছে		৫	ফিতরা দিয়েছেন	
৩.	বই নোট তৈরী হয়েছে		৬		

স্কোর ও প্রাপ্ত স্কোর শীটঃ

ক্রম	বিবরণ	স্কোর	প্রাপ্ত স্কোর
১.	আল-কুরআন তেলাওয়াত	৩০	
২.	ব্যাখ্যাসহ অধ্যয়ন	৩০	
৩.	অর্থসহ মুখস্থকরণ	৩০	
৪.	দারসুল কুরআন তৈরী	১০	
৫.	আল-হাদীস অধ্যয়ন	৩০	
৬.	আল-হাদীস মুখস্থকরণ	১০	
৭.	দারসুল হাদীস তৈরী	১০	
৮.	সাহিত্য অধ্যয়ন (গড় পৃষ্ঠা)	৩০	
৯.	সালাত- জামা'য়াত	৩০	
১০.	তাবাবীহ আদায়	৩০	
১১.	ইফতার খাওয়ানো হবে	৩০	
১২.	ঈদের পোষাক দেয়া হবে	১০	
১৩.	নিয়োমিত মুসল্লি তৈরী করা হবে	০৫	
১৪.	ইসলামী প্রোগ্রামে অংশ নেয়া হবে	০৫	
১৫.	ওয়ামী প্রকাশিত বই বিক্রি করা হবে	০৫	
১৬.	ওয়ামী প্রকাশিত ক্যাসেট বিক্রি করা হবে	০৫	
১৭.	**মোট স্কোর**	৩০০	

রির্পোট সংরক্ষণকারীর নাম		জিলা	
ওয়ামীর সাথে সম্পর্ক		মোবাইল	
পেশা		বয়স	

মূল্যায়নকারীর স্বাক্ষর
তারিখঃ

www.pathagar.com

ওয়ার্ল্ড এসেম্বলী অব মুসলিম ইয়ুথ (ওয়ামী)
বাংলাদেশ অফিস